নারায়ণ সান্যাল

মনামী

মনামী

উৎসর্গ

শ্রীসবিতা সান্যাল

সুচরিতাসু—

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর 1989

কৈফিয়ত

'মনামী' বইটি ষাটের দশকে লেখা। বস্তুত একই আঙ্গিকে সে-সময় পরপর দুটি বই লিখি, 'মনামী ও 'অলকনন্দা'। আত্মকথার ঢঙে। অর্থাৎ লেখক শ্রুতিধর মাত্র—চরিত্ররা নিজ-নিজ বক্তব্য বলে গেছে; লেখক 'ডিকটেশন' নিয়ে গেছেন শুধু। এই স্টাইলে বই লেখার বাসনা, দু'খানি গ্রন্থ রচনার পরেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। স্বভাবগত পল্লবগ্রাহিতায় অন্য বিষয়, অন্য আঙ্গিকের দিকে ঝুঁকি।

'ঘরে-বাইরে' পড়তে বসে আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। নিখিলেশ, সন্দীপ আর বিমলা—তিনজনেই কোন অলৌকিক ক্ষমতাবলে আয়ত্ত করল তাদের সৃষ্টিকর্তার অননুকরণীয় রচনাশৈলী? মনে হয়েছিল, সৃষ্ট চরিত্রগুলি যদি রবীন্দ্রনাথের ভাষার হুবহু নকল করতে অশক্ত হত তাহলে প্রতিটি পরিচ্ছেদের মাথায় কোনটা কার 'আত্মকথা' সেটা জানানোর প্রয়োজন হত না। চোখে দেখার নাটক যেদিন থেকে কানে শোনার বেতারনাট্যের রূপ নিল, সেদিন থেকে আমরা শুধু বাচনভঙ্গি আর কণ্ঠস্বর শুনেই বক্তাকে চিনে নিতে শিখেছি। ছাপা-উপন্যাসে কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত, হস্তাক্ষরও, কিন্তু বাচনভঙ্গি? ভাষার শৈলী? ম্যানারিজম? প্রত্যেকটি চরিত্র যদি নিজের নিজের ঢঙে কথা বলে তাহলেও আমরা চিনে নিতে পারব কোনটা কার 'আত্মকথা'! সেই পরীক্ষাটাই করতে চেয়েছিলাম এই দুটি বইতে—প্রথমে 'মনামী', পরে 'অলকনন্দা'য়।

এই যে বিশেষ রচনাশৈলী—অর্থাৎ লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ভাষায় কথা বলছেন—তার প্রথম প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'তে (প্রথম প্রকাশ : 1877)। বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম রজনী-শচীন্দ্র-লবঙ্গলতা-অমরনাথের দলের কলকণ্ঠে বঙ্কিম নির্বাক হয়ে পড়েন। কাহিনি শুরু হবার আগে এবং 'টাইটেল-পেজ'-এর পরে সামান্য পরিসরে লেখকের 'মুখবন্ধ'। উভয় অর্থেই!

সেই ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "উপাখ্যানের অংশবিশেষ নায়ক বা নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্স কৃত 'Woman in White' নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে-কথা যাহার মুখে শুনিতে ভালো লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই এই উপন্যাসে যে-সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই।"

'যে-কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে'—একশ দশ-পনের বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের সেটা খেয়াল ছিল। 'ঘরে-বাইরে'র লেখকের কিন্তু সে-কথা খেয়াল ছিল না! বিমলা, সন্দীপ আর নিখিলেশের চিন্তাধারা, জীবনবোধ, আদর্শের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তারা আত্মকথা রচনা করেছে এক অনবদ্য, অননুকরণীয় ভাষায়—সে-ভাষার মালিক একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলি সে-ভুল করেনি। অশিক্ষিতা রজনীর ভাষা সমাসবদ্ধ পদসমৃদ্ধ নয়, যেমন শচীন্দ্রনাথ রজনীর ভাষায় 'চোখের মাথা খেতে' পারে না। লবঙ্গলতা যে অলঙ্কারে অভ্যস্ত ('আগুনে-সেঁকা কলাপাতার মতো শুকাইয়া উঠিবে') অমরনাথ সে-ভাষার কথা বলতে পারে না। তুলনায় সন্দীপ, বিমলা, নিখিলেশ একে অপরের ভাষা হুবহু নকল করেছে।

একটা কথা। 'রজনী'র চেয়ে 'ইন্দিরা' বয়সে চার বছরের বড়। ইন্দিরাই প্রথম বিদ্রোহিণী, যে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বকল্‌মা' দিতে অস্বীকার করে! ইন্দিরা পঞ্চম আত্মজা। ইন্দিরার যে চারজন বড় বোন ছিল, তারা অনেক গুণের অধিকারিণী; কিন্তু এ দিক থেকে ইন্দিরা অনন্যা। 'ফুলমতী' ব্যতিরেকে বাংলা সাহিত্যে ইন্দিরাই বোধকরি প্রথমা। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' আর 'বিষবৃক্ষ'র নায়িকা

নিজেদের কথা নিজেরা বলবার সাহস পায়নি—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের এজলাসে এসে সাদা কাগজে টিপছাপ দিয়ে বলেছিল—"বকল্‌মা লিখিয়া দিলাম। ধর্মাধিকার! আপনিই আমাদের পিতৃস্থানীয়! আমাদের যাহা বক্তব্য আপনিই তাহার রচনা করুন!"

ইন্দিরা তা বলেনি। বলেছিল তার নিজের ভাষায়—'আপনি ব্যস্ত হইবেন না! না হয় আপনার মতো পণ্ডিতের ভাষা নাই হইল—আমার কথা আমি নিজেই বলিতে পারিব।'

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ 1872) 'ইন্দিরা' প্রথম প্রকাশিত। বঙ্কিম-কথিত উইল্‌কি কলিন্স-এর 'The Woman in White' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 1860 খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ ইংরাজতনয়া ঐ 'শ্বেতাম্বরা' বঙ্কিমাত্মজা 'ইন্দিরা' অপেক্ষা দ্বাদশবর্ষের বয়োজ্যেষ্ঠা! 'ফুলমণি' আরও ত্রিশ বছরের প্রাচীনা।

তারপর শতবর্ষ অতীত। নারীমুক্তি, উইমেন্স-লিব ইত্যাদি কতো নতুন-নতুন কথা শুনতে পাই। কিন্তু ফুলমণি-ইন্দিরা বা রজনীর মতো বাংলা সাহিত্যের কোনো নায়িকাকে তো আজ আর দেখতে পাই না ওভাবে সাহস করে এগিয়ে আসতে, কথাসাহিত্যিককে ধমক দিয়ে বলতে : "আপনি থামুন! আমার কথা আমিই বলতে পারব!"

নারায়ণ সান্যাল

১০/৬/৮৯

তোমরা তো অনেক লেখাপড়া শিখেছ, অনেক বই পড়েছ। আমাকে একটা জিনিস বুঝিয়ে দেবে? একটা মানুষের মধ্যে কি দুটো মন থাকতে পারে? একই মানুষ দু-রকম হতে পারে? কেমন জান? কখনও মনে হবে সে যেন তোমার কত আপনার, আদরে সোহাগে সে তখন পাগল করে দেবে তোমাকে। মনে হবে তোমা-বই সে আর কিছু জানেই না। এই বিশ্বাস নিয়ে যেই তুমি খুশিয়াল হতে শুরু করেছ—অমনি লক্ষ্য করলে তার হাবভাব সব বদলে গেল। সে অন্য দিকে চেয়ে আছে—সে যেন আমাকে চেনেই না। তোমার ডাকে আর সে সাড়া দেবে না তখন। এমন কি তোমার মনে হবে হয়তো সে তোমাকে ঘৃণা করে; তোমাকে পাছে ছুঁতে হয় তাই সে তোমাকে এড়িয়ে চলে!

এরকম ঘটনা তোমাদের জীবনেও হয়? হলে, তোমরা কী কর? কী করে ফিরিয়ে আনো সেই হঠাৎ-বদলে-যাওয়া মানুষটির ভালোবাসা? আমার ভারি জানতে ইচ্ছে করে। শুধু কৌতূহল নয়, তোমরা আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়েরা এ অবস্থায় পড়লে কী কর জানতে পারলেও একবার চেষ্টা করে দেখতাম।

আমি ভাই লেখাপড়া শিখিনি। ইংরাজি অক্ষরই চেনা হয়ে ওঠেনি। বাংলা অবশ্য পড়তে পারি—যদি ওঁর মত পণ্ডিতি-ভাষার কটমট বাংলা না হয়। জানি, তোমরা বলবে—এখানেই গোল বেধেছে। সুবিমলও তাই বলে। কারও সে কথা বলার দরকার নেই গো। আমি নিজেই তা জানি। উনি অধ্যাপক, কলেজে পড়ান। কী পড়ান? তা জানি না ভাই, জিনিসটা আমি আজও বুঝিনি। ঘোড়ার ডাক্তারে পশুপাখির চিকিৎসা করে;—ওঁকে তা কখনও করতে দেখিনি। আমার মেনি বেড়ালটা একদিন সারা বাড়ি বমি করে বেড়াচ্ছিল; ওঁকে বল্লাম একটু ওষুধ দিতে। তাতে বল্লেন—"আমি কি ঘোড়ার ডাক্তার?"

তাতেই জানলাম, পশুপাখিকে বাঁচাবার বিদ্যেটা উনি শেখেননি। শুধু মারতে শিখেছেন। ব্যাঙ, খরগোশ, গিনিপিগ কেটেকুটে বাহাদুরি দেখাতে জানেন। এ বিদ্যায় কার যে কী লাভ হয় তা জানি না। কোনওদিন জানবার চেষ্টাও করিনি।

জানি, তোমরা বলবে এজন্যেই ওঁর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। উনি অধ্যাপক, পণ্ডিত মানুষ। আমি লেখাপড়া না-জানা গাঁয়ের মেয়ে। আমাদের যে মিল হবে না এটাই তো স্বাভাবিক। শুধু তাও নয়। আমার আরও অনেকগুলি গুণ আছে! নিজেই স্বীকার করছি। আমি কালো। সুন্দরী মোটেই নই। অতি সাধারণ গাঁয়ের মেয়ে। এখন আমার উনত্রিশ চলছে। কাজেই বুঝতে পারো, ওঁকে বেঁধে রাখার কোনো সম্বলই নেই আমার হাতে। কিন্তু একটা কথা তোমরা আমায় বুঝিয়ে দেবে? উনি তো সবই জানতেন। বিয়ের আগেই তিনি আমাকে দেখেছিলেন, আমার সব কথাই শুনেছিলেন, তাহলে সব জেনেশুনেও পাড়াগাঁর এই লেখাপড়া না-জানা সাধারণ মেয়েটিকে কেন বিয়ে করলেন তিনি? উনি সুপুরুষ, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান। অনায়াসে লেখাপড়া-জানা সুন্দরী একটি মেয়েকে ঘরে আনতে পারতেন। কে বলেছিল তাঁকে বাহাদুরি দেখাতে? আমি তো এ সৌভাগ্যের কথা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনওদিন!

আচ্ছা খুলেই বলি সব কথা গোড়া থেকে।

আমার বাবা ছিলেন গ্রামের পুরোহিত। এমন শান্ত সরল মানুষ হয় না। ছেলেবেলাতেই মা মারা যান। ছোট ভাইবোনগুলিকে মানুষ করতে করতে, আর বাবার সংসারে হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে কখন যে বড় হয়ে উঠলাম তা নিজেও জানতে পারিনি। সংসারের কোনকিছুই বাবার নজরে পড়তো না। কোথা দিয়ে কী করে আমি সংসারটা চালিয়ে নিতাম তার খবরও তিনি রাখতেন না। হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল হল যে, আমার বয়স হয়ে গেছে। বিয়ে দেওয়া দরকার। বাবার অবশ্য নিজে থেকে খেয়াল হয়নি। সেরকম মানুষই নন তিনি। পূজা-আর্চা আর বাসুদেবের সেবা নিয়েই তাঁর জীবন কেটে

যেত। বোধহয় ভবেশকাকাই এদিকে তাঁর নজর টেনে এনেছিলেন। ভবেশকাকা অবশ্য আমার নিজের কাকা নন; ওঁর স্ত্রী ছিলেন বাবার শিষ্যা। মায়া খুড়িমা মারা যাবার পর ভবেশকাকার মেয়ে মনু বাবার কাছে মানুষ হচ্ছিল। তার জন্যে মাঝে মাঝে কাকা আসতেন। তিনিই বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আমার দিকে! তারপরেই শুরু হয়ে গেল বাবার আপ্রাণ চেষ্টা—আমাকে পাত্রস্থ করতে হবে। জীবনের সতেরোটা বছর যে কথাটা জানতে পারিনি হঠাৎ সেটা আবিষ্কার করলাম। অর্থাৎ আমি সুন্দরী নই। বাবা মাঝে মাঝে ভদ্রলোকদের নিয়ে আসতেন; সারাদিন আমি নিজের হাতে মিষ্টি গড়তাম। তারপর সন্ধেবেলা নিজে হাতেই সাজগোজ করে তাঁদের সমুখে গিয়ে বসতাম দুরুদুরু বুকে। যে কথাটা জেনেছিলাম অনেক চোখের জলে—সেটাই আর একবার শুনতে হত—আমি নাকি কালো, আমি সুন্দরী নই। যেন কথাটা এমনই দামী যে, ওটা আর একবার শুনবার জন্যে সারাদিন উনুনধারে বসে গোকুলপিঠে বানাবার দরকার ছিল আমার!

তিন-চার বছর কেটে গেল এই ভাবেই। বাবার বয়স বেড়ে গেল এই কয় বছরে। হঠাৎ যেন বুড়ো হয়ে গেলেন। চুলগুলো সব হুহু করে পেকে গেল। পূজা-আর্চাতেও যেন মন দিতে পারেন না ঠিকমত। পাগলের মতো ছোটাছুটি করেন। সম্ভব-অসম্ভব বাছবিচার নেই। পাত্রের সন্ধান পেলেই তাঁদের ধরে আনতেন। আমাকে দাঁড়াতে হত তাঁদের সামনে সেই কঠিন পরীক্ষায়।

আমার বয়স যখন একুশ তখন বাবা কোথা থেকে সন্ধান পেলেন শহরের উকিলবাবু তাঁর ছেলের বিয়ে দেবেন। দুটো পাশ দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছে। দুশো টাকা মাইনে পায়! মনু বুঝি উকিলবাবুর ছেলেকে দেখেছিল শহরে থাকতে। সে এমন বর্ণনা দিল যে, বাবা মনে করলেন এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে বলেই এতদিন সব সম্বন্ধ ভেঙে গেছে। আমার কোষ্ঠি দেখে যে তিনি নিজেই বিচার করে বসে আছেন, আমার শিবের মতো স্বামী হবে! মনু আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট। তবু এমনি পাকা মেয়ে—আমার কানে কানে এসে বলে—তবে এ বিয়ে হবে না রাধাদি। পীতাম্বর উকিলের ছেলেকে আমি দেখেছি। ও কখনও শিব নয়—শিবের ব্যাটা কার্তিক!

আমি বলি—হতভাগী, এতই বকে গেছিস তুই!

বাবা আমার মানা শুনলেন না। ওখানেই কথা তুললেন। জানি, তোমরা হাসছ, বাবার পাগলামির কথা শুনে। এ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত! কিন্তু আমার বাবাকে সে সময়ে দেখলে আর হাসতে পারতে না, করুণা হত।

উকিলবাবু নেহাতই শহুরে মানুষ। গাঁয়ে এসে মেয়ে দেখতে রাজি হলেন না। বাবাও একেবারে নাছোড়বান্দা। ওঁর এক যজমানের ভাইপো বুঝি শহরের কলেজে নতুন চাকরিতে ঢুকেছেন। তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে আমাকে এনে হাজির করলেন তাঁর বাসায়।

সেদিনকার কথাটা স্পষ্ট মনে আছে আমার। না থাকার কারণ নেই। ঐ দিনটাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল যে। অধ্যাপকমশাই শুনে ভেবেছিলাম—ইয়া রাশভারী লোক হবেন বুঝি। ওমা, এ যে নেহাত অল্পবয়সি। বিয়ে-থা করেননি—একা থাকেন। আমাদের আদর করে আশ্রয় দিলেন। তাঁর জ্যেঠামশাইয়ের চিঠিখানা পড়ে বল্লেন—"বেশ তো। আপনারা আমার এখানেই উঠুন। আমার বাড়িতে অবশ্য স্ত্রীলোক কেউ নেই। আপনার মেয়েকেই বলুন এ ক'দিনের জন্যে সব দেখেশুনে নিতে।"

বলে, আমার দিকে ফিরে বলেন,—"কোনো লজ্জা কর না। সংসারে কী আছে না আছে নিজে দেখেশুনে নাও। যা দরকার হয় আনিয়ে নেবে।"

তখনই চাকরকে ডেকে তার হাতে একটা নোট দিয়ে বলেন, "দিদিমণি যা যা চাইবে এনে দিবি।"

আমি কিছু বলিনি। মাটির দিকে চেয়েই বুঝতে পারি উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়। বাবার দুঃসাহস দেখে মনে মনে তিনি হাসলেন নিশ্চয়।

সেদিনটা ছিল রবিবার। ওঁর কলেজ ছিল না।

চাকরটা এসে জিজ্ঞাসা করে কী কী বাজার আনতে হবে। আমি তখন স্নানে যাবার উদ্‌যোগ করছিলাম। রান্নাঘরে এসে দেখি মশলাপাতি সবই বাড়ন্ত। আলু-পটল আছে—আর আছে একফালি কুমড়ো একটা বেতের টুকরিতে। বললাম, যা হোক নিয়ে এস।

হঠাৎ দেখি অধ্যাপকমশাই বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাকরকে বললেন,—"আচ্ছা, চলরে নটবর, আমিও যাই তোর সঙ্গে।" আমার দিকে ফিরে বললেন—"এ কদিন তোমার হাতে কিছু ভালোমন্দ খেয়ে নেওয়া যাক্। আমার নটবরটি একেবারে কলির দ্রৌপদী। তবু মুখটা বদলানো যাবে আজকে, আর তাছাড়া....."

বলেই ইংরেজিতে কী যেন ফোড়ন কাটলেন। লজ্জায় বাঁচি না। বলেই হেসে উঠলেন। আমি হাসব না চুপ করে থাকব বুঝতে পারি না। এক লাইন মাত্র কথা? কী হতে পারে? মুখটা নিচু করেই থাকি। আমি যে বুঝতে পারিনি সেটা গোপন করি। ওঁরা দুজনে বেরিয়ে যান বাজারে। বাবা তো সেই সাত-সকালে এসেই বেরিয়ে গেছেন উকিলবাবুর বাসায়। ও-বেলায় ওঁরা আমাকে দেখতে আসবেন।

তেল মেখে স্নান করতে এসে দেখি—ও হরি, স্নানঘর বলে কিছু নেই। আমাদের গাঁয়ের বাড়িতেও অবশ্য স্নানের ঘর নেই, কিন্তু সেখানে ওটা দরকার হয় না। খিড়কি পুকুরের ঘাটে নিরিবিলিতে গা খুলে স্নান করতে কোনো সঙ্কোচ হয় না। বেনেবউ পাখি দুটো আর কাঠবেড়ালি ছাড়া কোনো দিন কোনও জনমনিষ্যির সাড়া পাইনি কখনও। এখানে উঠোনের মাঝখানে একটা টিউকল; দুপাশে দোতলা- তিনতলা বাড়ি। সব জানলাই খোলা। কে কখন জানলায় এসে দাঁড়াবে কে বলতে পারে? মাগো! এখানে কি স্নান করা যায়! আগে খেয়াল হলে স্নানের নামও করতাম না। কিন্তু তেল মেখে ফেলেছি। কী করি?

লক্ষ্য করলাম রান্নাঘরে নালি আছে। সেই ভালো। দু-বালতি জল টেনে এনে রান্নাঘরেই স্নান সেরে নিলাম। ভালোই হল। রাজ্যের এল্লোৎ জমা হয়েছিল, ধোয়া হয়ে গেল ঐ জলে।

স্নান সেরে উঠে আবার নতুন বিপদ; বড় চিরুনি আনিনি। অধ্যাপকমশায়ের ছোট নতুন চিরুনিতে কি আমার চুল আঁচড়ানো যায়! এই সময় চুপিচুপি একটা কথা বলে রাখি ভাই—ঐ একটা জিনিসই আমার ছিল গর্ব করার মতো। পোড়া মুখেই বলতে হচ্ছে। কী করব? এ কথাটা যিনি আগে প্রায়ই বলতেন, আজকাল তাঁর সেটা নজরেই পড়ে না।

যাক্ যা বলছিলাম। চুল ভালো করে আঁচড়ানো গেলো না। উনি ফিরে এলেন বাজার করে। বড় বড় গল্‌দা চিংড়ি এনেছেন আর মাংস।

অনেকদিন ভালোমন্দ পদ রাঁধিনি। ভালো করেই রাঁধবার চেষ্টা করলাম। ভারী দুঃখিত হচ্ছিল বাবার জন্যে। তাঁর খাওয়া হল না। তিনি ফলার করলেন। তরকারির থলি থেকে যখন পেঁয়াজ বের হল তখনই জানি, বাবা একটা ছুতানাতা করে উপোস করবেন। নির্ঘাত পাঁজিতে একটা কিছু উপোসের তিথি বের হবে। অধ্যাপকমশাই কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এমন রান্না নাকি উনি কখনও খাননি! বাবাকে বললেন—"আপনি তো খেয়ে দেখতে পেলেন না।"

বাবা হেসে বললেন—"আমি ওর রান্না রোজই খাই। ভালো হয়েছে?"

উনি বলেন, "গ্র্যান্ড !"

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম। ভারি ভালো লাগলো।

দুপুরবেলায় একটু শুয়েছি কি না শুয়েছি বাবা তাগাদা শুরু করলেন, "রাধা ওঠ, গা ধুয়ে নে।"

বেলা তখন তিনটে। হাসিও পায়, কান্না পায়।

বাবা আর উনি বসেছিলেন পাশের ঘরে। ওঁদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল এ ঘর থেকে। অধ্যাপক-মশাই ইতস্তত করে বাবাকে বললেন, 'আপনার মেয়ের জন্যে শাড়ি, ব্লাউজ, আর ইয়ে, প্রসাধনের জিনিস সব এনেছেন তো?'

বাবা বলেন—"এনেছ বোধহয়।"

"—বোধহয়—না না আপনি ওঁর কাছে গিয়ে জেনে আসুন।"

এ যে মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি দেখি! যার বিয়ে তার খোঁজ নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই। বাবা ও-ঘর থেকেই ডাকাডাকি শুরু করেন। কী করি, মাথা নিচু করে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"—ইনি বলছেন, তোর শাড়ি-জামা, পাউডার-মাউডার সব এনেছিস তো।"

লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাই। চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল ওঁর সঙ্গে। তাড়াতাড়ি মুখ নিচু করে বলি—"হ্যাঁ"।

অধ্যাপকমশাইও বোধহয় বিব্রত বোধ করেন। কৈফয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলেন—"মানে আমার বাড়িতে তো দ্বিতীয় লোক নেই—তাই ভাবলাম....অর্থাৎ এঁরা শহরের মানুষ তো। ওঁদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। ওঁরা আবার একটু বেশি রঙচঙ মাখাই পছন্দ করেন।"

শহুরে মানুষদের কাণ্ডকারখানা যে আলাদা—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। নইলে অমন করে কেউ বলে ওকথা? আচ্ছা ভাই, তোমাদেরও তো বিয়ের আগে দেখতে এসেছিল; যতই কেন না লেখাপড়া শেখ—একদিন সেজেগুজে ঘাড় গুঁজরে বসতে হয়েছিল তো তাঁদের সামনে? কিন্তু কীভাবে সাজলে একটি বাইরের লোকের চোখে নিজেকে উৎরে যাওয়ার মতো ভালো ঠেক্‌বে—সে নিয়ে কখনও মতামত নিতে হয়েছে অন্য একজন বাইরের লোকের কাছে? চোখ ফেটে জল আসে আমার। উনি বোধহয় আমার অবস্থাটা বুঝতে পারেন। লজ্জা পান। বাবার কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। পাগল মানুষ তো। পীড়াপীড়ি করেন আমার সাজার সরঞ্জাম ওঁকে দেখিয়ে নিতে। উনিও তো শহুরে মানুষ। উনি দেখে দিলে যেন ভরসা পান বাবা। আমি কোনও কথা বল্লাম না। যা কিছু এনেছিলাম সঙ্গে করে এনে ঢেলে দিলাম ওঁদের দুজনের সামনে। শান্তিপুরে সবুজ ডুরে শাড়ি,—নীল জ্যাকেট আর সস্তা দামের স্নো-পাউডার—যা ছিল আমার সম্বল।

বেশ বুঝতে পারি, সেগুলো অধ্যাপকমশায়ের পছন্দ হয়নি। হবে কোত্থেকে? এসব সস্তা জিনিস শহুরে বাবুদের পছন্দ হবার নয় যে। আসবার সময় মনু তার মুখে মাখার কতকগুলো হাবিজাবি পুঁটুলি বেঁধে এনে দিয়েছিল। আমি নিইনি সেসব। ওসবে কী হবে? কখনও মেখেছি নাকি ওসব ছাইভস্ম? শেষকালে আরও ভূত সাজব। আর তাছাড়া কী দরকার অতসব হাঙ্গামায়? জানি তো, এ শুধু বাবার একটা খেয়াল মেটানো বই তো নয়।

উনি বাবাকে বলেন—"এতে হবে না! আমি ভালো জিনিস জোগাড় করে আনছি। কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি। তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনি। একি আমার-আপনার কাজ?"

পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে উনি বের হবার উপক্রম করেন। অসৈরণ সইতে পারি! ভীষণ রাগ হয় আমার, এ কী অত্যাচার! একদিনের জন্যে থাকতে দিয়েছেন, খেতে দিয়েছেন—যথেষ্ট। অত পীরিত দেখাতে কেউ তো ডাকেনি ওঁকে।

সদর খুলে বেরুবার মুখে ডাকি—"শুনুন"।

সেই প্রথম কথা বল্লাম ওঁর সঙ্গে!

উনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"কিছু বলবে আমাকে?"

"—হ্যাঁ। আপনি আর লজ্জা বাড়াবেন না আমার। এঁরা লেখাপড়া-জানা শহুরে-সুন্দরী মেয়ে চান। তবু বাবা আমাকে টেনে এনেছেন। বাবা বুড়ো হয়েছেন। ওঁর এ পাগলামির তবু মানে হয়। আপনিও ওঁর সঙ্গে এ মাতামাতিতে যোগ দেবেন না। আরও একটি ভদ্রমহিলাকে ধরে এনে সঙ সাজাবেন না আমাকে।"

বলেন, "কেন, ভদ্রমহিলা এলে তোমার আপত্তি কিসের?"

বলি, 'অপমানটা যত কম লোকের সামনে হয় ততই ভালো।"

শশব্যস্তে বেরিয়ে আসেন বাবা। বলেন—"কী, কি হয়েছে?"

কিছু না বলেই উনি বেরিয়ে যান।

ওঁদের সব চেষ্টাই কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে গেল আমার রূপের আগুনে। আমার কপালে ঘি না থাকলে ওঁরা ঠক্‌ঠকিয়ে কী করবেন? উকিলবাবুরা এসে চোখ দিয়ে আমাকে চেখে চেখে দেখলেন। নিজেদের মধ্যে চোখ ঠারাঠারি হল।

আমি পাশের ঘরে উঠে গেলে একজন বাবাকে বল্লেন—"আপনি বলেছিলেন মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা?"

বাবা বলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণাই তো বলব। ফর্সা বলা চলে না ওকে।"

ভদ্রলোক হেসে বলেন—"কেন চলবে না? মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কী নাম রেখেছেন মেয়ের?"

বাবা বলেন—"রাধারানি।"

উকিলবাবু হেসে বলেন, "তবেই দেখুন, নামটা পর্যন্ত সাহস করে রাখতে পেরেছেন, আর লোককে বলছেন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা! এ মেয়ে তো গোরোচনা গোরী!"

বাবা এত সরল যে, এর পরেও প্রশ্ন করেন, "আপনাদের তা হলে পছন্দ হয়েছে?"

উকিলবাবু বলেন, "সেটা পরামর্শ করে পরে জানাব। আপনি কিন্তু ভট্টাচার্যমশাই, মেয়েকে এভাবে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বলবেন না। মেয়েটির মধ্যে শ্রী আছে। যে সংসারে যাবে, মা রক্ষাকালীর মতো আলো করে রাখবে সে-ঘর!"

ওঁরা চলে যেতে বাবা অধ্যাপকমশাইকে বলেন—"ওদের পছন্দ হয়েছে, কী বল?"

উনি তখন জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ওদের যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। বলেন, "না, ওঁদের পছন্দ হয়নি।"

বাবা বলেন, "হয়নি? কিন্তু উনি যে বল্লেন মেয়েটিকে ফর্সাই মনে হল! ওর মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী আছে। যে সংসারে যাবে লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো...."

আমি বাধা দিয়ে বলি—"সন্ধ্যার লোকালটা এখনও পাওয়া যাবে। তুমি একটা গাড়ি ডাকো বাবা।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাবা বেরিয়ে যান, যাবার ব্যবস্থা করতে।

বারান্দায় দুখানি চেয়ারে আমরা দুজনে বসে আছি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সূর্য অস্ত গেছে এই খানিকটা আগে! বাড়িটা পশ্চিমমুখো। আমাদের সামনেই আকাশটা যেন সোনায় আর আবিরে মাখামাখি হয়ে গেল। বাইরে পুরুষমানুষের সঙ্গে এমনি একা গল্প করার অব্যেস নেই। আমি ইতস্তত করে উঠতে যাব, হঠাৎ বলে ওঠেন, "মাত্র একদিনের পরিচয় তোমাদের সঙ্গে, তবু তোমরা আসায় এই একটা দিন বেশ আনন্দে কাটল।"

আমি চুপ করে বসে থাকি।

ঠিক এই সময় একটুকরো মেঘের আড়াল থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বেরিয়ে এল সূর্য। ম্লান একটা আলো এসে পড়লো বারান্দায়। হঠাৎ বোঝা গেল সূর্য অস্ত যায়নি এতক্ষণ। সেদিকেই চেয়ে থাকি।

উনি বলেন—"এইটাকে বলে কনে-দেখা আলো। এ আলোয় নাকি...." হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে থেমে যান কী ভেবে।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না! বলি, "রক্ষাকালীকে অন্তত লক্ষ্মীঠাকরুনটি বলে ভুল হয় না।"

বলেই বুঝতে পারি ভুলটা। ছি, ছি, কেন নির্লজ্জের মতো বলতে গেলাম ও-কথা। সমস্ত রক্ত যেন মুখে উঠে আসে।

উনি ও-প্রসঙ্গ কিন্তু তুললেন না। বাঁচা গেল। বল্লেন, "আর হয়তো কোনদিন দেখাই হবে না তোমাদের সঙ্গে।"

অনেকটা সহজ বোধ করছি প্রসঙ্গটা বদলে যাওয়ায়। উত্তরে বলি, "কেন হবে না? হয়তো খুব শিগ্‌গিরই আবার দেখা হবে।"

—"সেকি, কেন?"

—"এবার শহরে মেয়ে দেখাবার দরকার হলে বাবা এখানেই এনে তুলবেন।"

উনি বলেন, "এরপরেও লোকের সামনে বের হবে তুমি?"

বলি, "কেন হব না? এঁরা তো তবু ভদ্রভাবে ঘুরিয়ে বলেছেন। এর চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন অনেকে। ও আমার সয়ে গেছে। এই নিয়ে এগারবার হল।"

অধ্যাপকমশাই যেন চমকে ওঠেন, "এগারো বার! তুমি বলছ কী!"

এ ছাড়া আর কোনো কথা হয়নি আমাদের। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? মনুও বিশ্বাস করেনি। বারবার খুঁচিয়েছে আমাকে। পারলে দুটো মিথ্যা কথা বানিয়েও বলতাম মনুকে—কিন্তু তাও যে পারি না। সত্যিই আর কোনো কথাবার্তা বলিনি আমরা। এরপরেই বাবা গাড়ি নিয়ে আসেন। আমরা চলে আসি ওঁর বাড়ি থেকে। বরং এর পর যে কথা বলব তা বিশ্বাস করা আরও কঠিন। আমারই কি ছাই বিশ্বাস

হয়েছিল প্রথমে? মনে হয়েছিল কেউ ওঁর নাম নিয়ে রসিকতা করছে বাবার সঙ্গে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাবা চিঠি পেলেন—অধ্যাপকমশাই আমাকে বিয়ে করতে চান। পণ নেবেন না, শুধু শাঁখা আর সিঁদুর!

বাবা তো পাগল হয়ে উঠলেন। আমি কী করব ভেবে পেলাম না। একবার মনে হল অধ্যাপক-মশাইকে চিঠি লিখে বারণ করি, কিন্তু অতবড় অধ্যাপককে কী করে লিখব? কী লিখব? লিখব কি যে, আমি ওঁর উপযুক্ত নই? তাঁর পায়ের তলায় বসার সৌভাগ্যও আমার হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এসব কথা গুছিয়ে লেখার মতো ক্ষমতাই ছিল না আমার। বাবা তো সেইদিনই চলে গেলেন শহরে। সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল! মনু এসে বারে বারে জিজ্ঞাসা করে—"বল্ না দিদি, আর কী কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে?"

সন্ধ্যাবেলা বাবা ফিরে এলেন। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে ফেলেন—"বলিনি তোকে? মন দিয়ে শিবপূজা করলে শিবের মতো স্বামী হয়?"

বাবার বুকের মধ্যেই থরথর করে কেঁপে উঠেছিলাম। তাহলে একথা সত্যি? এতদিনে ভগবান সত্যিই মুখ তুলে চেয়েছেন। বাবা পীতুঠাকুরকে প্রণাম করি।

* * *

আট বছর আগে এসেছিলাম এ-সংসারে। তৃতীয় প্রাণী ছিল না তখন। সুবিমল এ-সংসারে এসেছে তার অনেক পরে। আমরা দুটিতে এ-শহর থেকে ও-শহরে বদলি হই। ঘর ভাঙি আর গড়ি। প্রথম প্রথম কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতাম না এ-সংসারে। মনে হত চুরি করে হঠাৎ ঢুকে পড়েছি বুঝি এ-বাড়িতে। এ-সংসারে যিনি সত্যিকারের গিন্নি, তিনি যেন কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছেন। টক্‌টকে রঙ, ঘুরিয়ে কাপড় পরে, ঠোঁটে-গালে রঙ মাখে, কখনো অর্গানে বসে গান গায়, কখনও ওঁর হাত ধরে বেড়াতে যায়। এখন সে নেই কি না, তাই সুযোগ বুঝে টুক করে আমি ঢুকে পড়েছি তার সংসারে। যেই সেই সুয়োরানি ফিরে আসবে, অমনি ধরা পড়ে যাবে আমার চুরিবিদ্যে! তখন এ হতভাগী দুয়োরানির ব্যবস্থা হবে—'হেঁটোয় কাঁটা, মুড়োয় কাঁটা'।

সুয়োরানি কিন্তু ফিরে এল না বাপের বাড়ি থেকে। আমার সঙ্কোচ, আমার লজ্জা উনি ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলেন। আশ্চর্য মানুষ! অনেক ভারী ভারী কথা বলতেন আমাকে বুকে টেনে নিয়ে। সব কথার মানেই বুঝতে পারতাম না; তবে আন্দাজে বুঝে নিতাম অনেক কিছু। নিজেকে ছোট ভাবতে নেই.....নিজেকে ছোট করলে আমার অপমান করা হয়। এমনি কত সব ওজনদার কথা!

ক্রমশ বুঝতে শিখলাম—সত্যিই আমাকে উনি ভালোবাসেন। 'যার যাতে মজে মন'। কিন্তু কেন মজল? আমার কী দেখে উনি ভুললেন? বিয়ের পর একটা ছোটখাটো ঘরোয়া আয়োজন করেছিলেন উনি। ওঁর বন্ধুবান্ধবীরা সব দল বেঁধে এসেছিল। কয়েকজন ছাত্রীও। তারা কী চমৎকার সব দেখতে। আর কী অদ্ভুত সাজপোশাক করে। পরে অবশ্য ওঁর কাছে শুনেছিলাম—ওদের আসল গায়ের রঙ না কি ওরকম নয়। রঙচঙ মেখে পটের বিবি সেজেছে। তা সে যাই হোক, ওদের মাঝখানে আমাকে নিষ্প্রভ লাগছিল। ওদের সঙ্গে মিশতে পারিনি। তেলে-জলে কি মিশ্ খায়? উনি অবশ্য সব সময় আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে নিতেন। পরে উনিও বুঝলেন—আমি ওদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে চাই। তারপর থেকে আমরা দুজনেই শুধু মেতে থাকতাম দুজনকে নিয়ে।

উনি বলতেন—"জানো, ওরা বলে আমি নাকি বৌ-পাগলা। বিয়ের পর আর নাকি ঘর থেকে বারই হই না!"

আমি বলতাম—"তা বলুক। যে কদিন আমাকে ভালো লাগে সেই কদিন না হয় শুধু আমাকে নিয়েই থাকলে।"

উনি অবাক হয়ে বলতেন—"এ কথার মানে?"

—"মানে বোঝ না? আমাকে আজ তোমার ভালো লাগছে। কেন লাগছে, তা জানি না। আমার কী আছে বলো? কী দিয়ে চিরকাল ধরে রাখব তোমার এই ভালোবাসা? না রূপ, না গুণ! তবু আজ তুমি আমাকে ভালোবাসো। হয়তো দুদিনেই তোমার মন বদলে যাবে। তখন আর ফিরেও চাইবে না আমার দিকে। তাই, যে কদিন তোমার এ-ভুল না ভাঙে সে কদিন তুমি থাকবে আমার, শুধু আমারই!"

উনি ব্যথা পান। একটু গম্ভীর হয়ে বলেন—"তুমি জান, এজাতীয় কথায় কত ব্যথা পাই! কেন এ-সব কথা ভাব তুমি? আমি তো রূপ-গুণের বিচার করে তোমায় বিয়ে করিনি।"

আমি হেসে বলি—"তবে কিসের বিচার করে বিয়ে করেছ?"

উনি গম্ভীর হয়ে যান। অমনি শুরু হয়ে যায় মাস্টারমশাইয়ের ভারী ভারী কথা। যার মানে নেই, অথচ বেশ গালভারি—ভালো লাগে শুনতে। কী যেন সব বলেন? হ্যাঁ, একবার বলেছিলেন, "রূপ ছড়িয়ে আছে সারা দুনিয়ায়। দেখবার চোখ চাই। রূপকে মুঠোয় বন্দি করা যায় না। গেলেও তা শুকিয়ে যায় হাতের উত্তাপে—নয়তো পারার মতো মুঠি ফসকে পালায়। আমি তোমার মধ্যেই পেয়েছি অমৃত-রূপের সন্ধান, সাদা চোখে তা দেখা যায় না—সন্ধানীতেই শুধু দেখতে পায়।"

আমি বলি—"কিন্তু আমি কী দেব তোমায়? কী আছে আমার?"

উনি বলতেন—"তোমার সবই আছে—নেই শুধু একটি জিনিস—নিজের হৃদয়ের অনন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা।"

আচ্ছা, এসব গালভারি কথার কোনো মানে হয়? না হোক, কিন্তু বেশ লাগে! অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, উনি সাধারণ মানুষের মতো নন। ওঁর বিচার অন্যরকম। আমার মধ্যে তিনি এমন একটা কিছু দেখতে পেয়েছিলেন, যেটার কথা আমি নিজেই জানতাম না। বুক ভরে উঠত তৃপ্তিতে, আমার মতো স্বামীর ভালোবাসা কজন পায়? বুঝি, এ সংসারে আমার মৌরসীপাট্টা হয়েছে। কোনো রূপসী এসে ইংরেজি বুকনি ঝেড়ে আমাকে এ সিংহাসন থেকে নড়াতে পারবে না। দুনিয়া থেকে অনেক উঁচুতে আমরা দুজনে যেন একটা ছোট্ট পাখির বাসা বাঁধছিলাম—যার সন্ধান কেউ জানত না, যার নাগাল কেউ পেত না।

কিন্তু কোথা দিয়ে কী-যেন হয়ে গেল। কী যে হল তা বুঝিনি সেদিন—আজও বুঝি না। হয়তো বৃহস্পতির দশা পার হয়ে শনির দশায় পড়লাম। উনি একেবারে বদলে গেলেন। বছরতিনেক বিয়ে হয়েছে তখন আমাদের। ওঁর পরিবর্তনটা লক্ষ্য করলাম হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে। সেই উনি প্রথম আমার দেহ নিয়ে খোঁটা দিলেন। এর আগে আমার শরীর নিয়ে কখনও অনুযোগ করেননি। বরং আমিই যখন আমার রূপ নিয়ে, রঙ নিয়ে রসিকতা করেছি উনি বিরক্ত হয়েছেন। হাসপাতাল থেকে একা ফিরে এলাম কাঁদতে কাঁদতে। স্বপ্নেও ভাবিনি—একা ফিরে আসতে হবে। সে এল, অথচ আমার বুক জুড়ে এল না। চোখেই দেখতে দিল না তাকে হাসপাতালের ওরা। কাঁথা তৈরি করে রেখেছিলাম,—রুপোর ঝুমঝুমি কিনে রেখেছিলাম আলমারিতে। উনিও ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। ওঁর দিকে চেয়ে নিজের মনকে শক্ত করলাম। জানি তো, খোকনের জন্যে কতটা প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন উনি। কিন্তু আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে ওঁর। উনি আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলেন। আমাকে যেন সহ্য করতে পারেন না আর। মনে মনে ভাবি, কেন এমন হল? ভগবানকে ডাকি—"হে ঠাকুর, খোকনকে কেড়ে নিলে, এখন কি ওঁর ভালোবাসাও হারাতে হবে? কী অপরাধ করেছি আমি?"

শেষে একদিন উনি বললেন সে-কথা। আমাকেই উনি দায়ী করেছেন এই দুর্ভাগ্যের জন্যে। আমার পাপেই নাকি খোকন এল না আমার বুক জুড়ে! কী ভীষণ কথা! আমার পাপে খোকন মারা গেল! আমি প্রতিদিন কায়মনে বাসুদেবের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন সুস্থ সবল সন্তান আসে আমার কোল জুড়ে। কতদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, খোকন শুয়ে আছে আমার পাশটিতে! প্রতি ষষ্ঠিতে পুজো দিয়েছি। বার-ব্রত-উপোস সবই করেছি—যেমন যেমন লিখে পাঠিয়েছিলেন বাবা। তবু আমারই হল দোষ? বাবা বলতেন—'বাপ-মায়ের পাপেই শিশুমৃত্যু।'

আমি তো জ্ঞানত কোনও অন্যায় করিনি। তবে? উনিও তো কখনও কোন পাপ কাজ করতেন না। তাহলে?

তখনও আসল কথাটা জানতাম না!

আমার তখন ধারণা ছিল, বুঝি ডাক্তারবাবুরা অসাবধান হওয়াতেই খোকন চলে গেছে। ডাক্তারবাবু নিজের দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন। বললাম সে-কথা ওঁকে। শুনে উনি আরও বিরক্ত হন। উনি যে আমার কথা না শুনেই রায় দিয়ে বসে আছেন! আমিই দোষী!

বাধ্য হয়ে মেনে নেই। কী করব তাছাড়া? উনি পণ্ডিত মানুষ। চোখের জলে ভেসে বলি—"ওগো, না-হয় আমারই দোষ, কখনও অন্যায় করব না, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

শুনে আরও বিরক্ত হন উনি।

কেমন যেন আর সহ্য করতে পারেন না আমাকে। দূরে দূরে সরে থাকেন। সর্বদাই এড়িয়ে চলেন, কাছে গেলে সরে যান। আগেকার মতো আদর করা, সোহাগ করা তো দূরের কথা—আমার খাটে এক সঙ্গে শুতেও আসতেন না। ওই যে কথায় বলে না 'যখন আদর জোটে, ফুঁট-কলাই দিয়ে ফোটে; যখন আদর ছোটে, ঢেঁকি দিয়ে কোটে', ওঁরও তখন সেই বৃত্তান্ত।

ডবল-বেডের বড় বিছানা ছিল আমাদের। আজ তিন বছর আমরা এখানেই দুজনে শুই। উনি কিছুদিন আগে একটা ছোট খাট বানিয়েছিলেন। বলতেন, "খোকন হলে তুমি ওকে নিয়ে বড় খাটে শোবে, আর আমি শোব ছোট খাটে।"

আমি বলতাম, "কেন, তিনজনেই বড় খাটে শোব।"

উনি আপত্তি করতেন, "না, তাহলে খোকনের অসুবিধা হবে। আমি আলাদাই শোব। ভয় নেই, ঘুম আসার আগে পর্যন্ত বড় খাটেই শোব তিনজনে। ঐ যে তুমি কী ছড়া কাট না, 'হলে সুজন তেঁতুল পাতায় দুজন'!"

খোকন অবশ্য এলো না। উনি কিন্তু ছোট খাটেই গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ঘুম আসার আগে তো দূরের কথা—ভুলেও আমার বিছানার দিকে আসতেন না। সুজন যে আর সুজন নেই!

বুঝলাম, আমার কপাল ভেঙেছে। এটা আশঙ্কা করেই ছিলাম এতদিন।

উনিই বারে বারে বুঝিয়েছিলেন যে, রূপ-যৌবনের বিচারে আমাকে উনি ভালোবাসেননি। বোকার মতো সেটা বিশ্বাস করেছি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বুঝতে পারি নিজের ভুল। বাচ্চা হবার পর আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল চেহারা। আয়নায় দেখে নিজেরই করুণা হত। উনি বলতেন, "তোমার শরীরে ত্রুটি আছে।" ওগো, এ আর কী নতুন কথা শোনাচ্ছ তুমি? কী করতে পারি। আমার এ রূপে যদি তিনি আকৃষ্ট না হন—যদি শরীরের ত্রুটিগুলোই শুধু নজরে পড়ে তবে দোষ দেব কাকে? উনি তখনও সুন্দর, সুপুরুষ। ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে নিজেরই লজ্জা হত। উনি আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইতেন। কী লজ্জা, এই চেহারা নিয়ে ওঁর পাশাপাশি কখনও পথে বার হওয়া যায়?

বুঝতে পারি, আমার মধ্যে ঐ যে কী একটা জিনিস ছিল—যা আমি জানতাম না—অথচ উনি দেখতে পেতেন—সেইটা আমাকে ছেড়ে গেছে। তাই আর উনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না। ভুলেও চোখ তুলে তাকান না আমার দিকে। বাইরের ঘরে রাত জেগে পড়াশুনা করেন। আমি একা বিছানায় পড়ে কাঁদি। তারপরে কখন নিঃসাড়ে একা শুয়ে পড়েন নিজের খাটে। আমি টের পাই, সাড়া দিই না,—কী হবে লজ্জা বাড়িয়ে।

মাঝে মাঝে মন মানত না। বিদ্রোহ করেছি তখন। মাঝরাতে ডেকে তুলেছি ওঁকে, জোর করে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। যেন একটা কলের পুতুলের ঘুম ভাঙলো। ভেতরের মানুষটার ঘুম আর ভাঙলো না।

কালে সবই সয়ে যায়। হয়তো ওঁরই এই হেলাচ্ছেদ্দাও মেনে নিতাম শেষ পর্যন্ত। হয়তো ওঁর কথাই বিশ্বাস করতাম—আমারই অজানা পাপে খোকনকে মেরে ফেলেছি আমি। এমনকি হয়তো ওঁর এই ঘেন্না, এই অশ্রদ্ধা সত্ত্বেও ওঁকে আমি ভালোবাসতাম বাকি জীবন। কেন বাসব না? আমি সত্যিই ওঁর উপযুক্ত নই। কিন্তু হঠাৎ এই সময় আসল কথাটা জেনে ফেললাম একদিন।

সেবার উনি কলকাতা থেকে সুন্দর একজোড়া খরগোশ নিয়ে এলেন। কী চমৎকার সাদা ধবধবে রঙ। কুঁচ ফলের মতো লাল একজোড়া চোখ। একেবারে বাচ্চা। বুঝতে পারি আমার জন্যই এ-দুটি এনেছেন উনি। দখল করলাম খরগোশ-জোড়াকে! ঘাসপাতা খাওয়াতাম নিজের হাতে। চাকরটাকে দিয়ে কাঠের খাঁচা বানালাম। তারের জালতি লাগিয়ে দিলাম।

উনি হেসে বলেন, "বা-রে, এ দুটোকে কি আমি তোমার খেলার জন্যে এনেছি নাকি? তুমি যে একেবারে দখল করছ খরগোশ-জোড়াকে?"

মনে মনে হাসি; বুঝি গো মশাই সবই বুঝি। এটুকুও কি বুঝব না? পুরুষমানুষে আবার খরগোশ পোষে নাকি? লোকে খরগোশ কেনে বাড়ির ছেলেমেয়ের জন্যে। আর কেনে তারা, যাদের বউ ছেলেমেয়ে নাড়াচাড়া করতে পায় না! আমিও তাই মিথ্যা অভিমান দেখিয়ে বলি, "বেশ, চাই না!"

উনি বলেন, "আচ্ছা বেশ, একটা তোমার একটা আমার। তুমি যেটাকে ইচ্ছে পছন্দ করে নাও।"

আমি তাতেই রাজি। আমি বড়টাকে পছন্দ করি, লাল ফিতে এনে গলায় ঘুন্টি বেঁধে দেই। নিজের হাতে কপির পাতা খাওয়াই। পোষ মানল কিন্তু ছোটটাই বেশি। আমার হাত থেকে চুক্‌চুক্ করে ভিজে ছোলা খেয়ে যেত। ওদের নিয়ে একবারে মেতে উঠলাম! কী করব বল ভাই? ছেলেপিলে নেই, বইপড়া আসে না, স্বামীর মন পাই না—মেতে রইলাম খরগোশ-জোড়াকে নিয়ে। খাওয়ানো, নাওয়ানো, সপ্তাহে একদিন খাঁচা সাফ করা। উনি যেন ভুলেই গেলেন ওদের কথা। দুটোই মানুষ হতে থাকে আমার হেপাজতে।

হঠাৎ একদিন উনি কী যেন লক্ষ্য করলেন। পৃথক খাঁচায় দুটি আলাদা রাখার ব্যবস্থা করলেন! এতদিনে নিজের খরগোশের ওপর দাবি জানালেন। আমার ওপর কড়া হুকুম জারি করা হল—ওদের নাওয়ানো, খাওয়ানো—কোন কিছুই নাকি করতে পারব না আমি। মনে মনে হেসে আর বাঁচি না। 'রঙ্গ কতই দেখব আর। ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার!' নিজের ঘড়ি-কলম-মানিব্যাগ কোথায় যার হুঁস থাকে না,—উনি মনে করে ওদের খেতে দেবেন, স্নান করাবেন, জল দেবেন। বেশ, দেখা যাক দৌড়টা কত।

যা ভেবেছিলাম; ছোট খরগোশটার খাবারে কম পড়ছিল। বেচারি ছটফট করে খিদের জ্বালায়। খাবার দিতে গিয়ে দেখি খাঁচায় তালা লাগানো রয়েছে। ভারী রাগ হল। চাকরটাকে পাঠিয়ে দিলাম কলেজে, চাবি চেয়ে নিয়ে আসবে।

চাবি এল না, উনি ফিরে এলেন। আমি তখন একটা একটা করে ভেজানো ছোলা খাওয়াচ্ছি ওকে, তারের জালতির ফাঁক দিয়ে। উনি এসেই আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। প্রায় পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলাম! চাকরটার সামনেই ধমকে উঠলেন আমাকে।

ওঁর এ মূর্তি কখনও দেখিনি। চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। মুখ চোখ থম্‌থম্ করছে। কঠিন স্বরে বলেন—"তোমাকে বলিনি, ওকে কিছু খেতে দেবে না? কেন খেতে দিয়েছ ওকে?"

চোখ ফেটে জল এল আমার। তবু সামলে নিয়ে বলি—"তুমি ওকে খেতে দিতে ভুলে গিয়েছ বলেই দিয়েছি। আমি না খেতে দিলে এতক্ষণ মরেই থাকত ও।"

—"না, মরত না, আর মরে-বাঁচে সে বুঝব আমি। এটাকে কিছু খেতে দেবে না, বুঝেছ?"

ভীষণ রাগ হল আমার। এতদিনে উনি দাবি জানাতে এসেছেন, না বিইয়ে উনি কানাইয়ের মা হয়েছেন। কে বড় করল ও দুটিকে এতটুকু বাচ্চা থেকে? কোথায় ছিলেন তখন উনি? আর আমার সেই পোষা খরগোশ মরে-বাঁচে সে বুঝবেন উনি—আমার বুঝবার অধিকার নেই?

আমি বলি, "হয় তুমি খাঁচা খুলে ওকে খেতে দাও—না হয় আমিই এভাবে খাওয়াব।"

উনি বললেন, "না দেবে না। আমি বারণ করছি।"

বলি—"তোমার বারণ মানি না আমি!"

উনি জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কী যেন বললেন নিজের মনেই—ইংরেজিতে।

আমার রাগ আরও চড়ে যায়! উনি জানেন—আমি ইংরেজি বুঝি না, তাহলে এভাবে চাকরের সামনে আমাকে অপমান করার মানে?

বললাম—"আমি ইংরেজি বুঝি না—তা তুমি জানো—যা বলতে চাও তা সহজ করে বল।"

—"হ্যাঁ, ইংরেজি বোঝ না, বাঙলাও জান না—তুমি বোঝ অন্য একরকমের ভাষা! তাই তোমার বোধগম্য ভাষাতেই বলে যাচ্ছি—এটাকে কিছু খেতে দেবে না—আমার মাথার দিব্যি দেওয়া রইল!" বলেই হন্‌হন্ করে বেরিয়ে যান।

তোমরাই বল ভাই—এভাবে অপমান করার কি কোন কারণ ছিল? কী এমন অন্যায় কথাটা বলেছি আমি? যার জন্যে এতবড় দিব্যি দিলেন উনি! তিলতিল ক'রে শুকিয়ে মরতে থাকে বাচ্চা খরগোশটা। কী করতে পারি? গুমরে মরি নিজের মনেই। ওঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করলাম। সারারাত গুম মেরে পড়ে থাকি। উনিও নিজে থেকে ভাব করতে আসেন না। আসবেন না, জানতাম। আজকাল আমাকে এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচেন। ঝগড়া হওয়ায় নতুন ছুতো হয়েছে। জো পেয়ে গেছেন উনি। ওঁর তো মজাই!

পরদিন চাকরটা ফাঁস করে দিল—উনি অফিস যাওয়ার সময়। শুনে উনি এসে দাঁড়ালেন আমার খাটের কাছে। ঘুমিয়ে থাকার ভান করে মিট্‌কি মেরে পড়ে থাকি।

—"কাল থেকে কিছু খাওনি শুনলাম।"

আমি চুপ।

উনি বসে পড়েন আমার খাটের পাশে। চোখের উপর থেকে জোর করে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলেন, "আমায় মাপ কর তুমি। হঠাৎ রাগের মাথায় রূঢ় কথা বলেছি। ওঠো লক্ষ্মীটি, খেয়ে নাও।"

আমার অবস্থা তখন 'এইবার ডাকিলেই খাইতে যাইব।' এত মিষ্টি কথা অনেকদিন শুনি না। আমার রাগ জল হয়ে গেল। বলি—"তাহলে চাবিটা দাও, ওটাকে খাইয়ে আসি।"

উনি বলেন, "না, ওকে কিছু খেতে দিও না। ওর বাচ্চা হবে। বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে বাচ্চার পরিণতি কীভাবে ব্যাহত হয় তাই পরীক্ষা করছি আমি।"

আমি অবাক হয়ে যাই। ছোটটা মাদি খরগোশ? ওর বাচ্চা হবে? কিন্তু ভরপেট খেতে পাবে না সে? কেন? ওঁর একটা নিষ্ঠুর খেয়াল মেটাতে হবে বলে? আমি দৃঢ়স্বরে বলি—'এ হতে পারে না।'

উনি বলেন, "দেখ, তোমার মত আর পথ আমার মত আর পথ থেকে ভিন্ন। সে কথা জেনেই বিয়ে করেছিলাম তোমাকে। ভেবেছিলাম, প্রেমের ত্রিবেণীতে গিয়ে মিলবে আমাদের জীবনের ভিন্নমুখী ধারা। তা তুমি হতে দিলে না। আমি তোমার বারব্রত-ছুঁৎমার্গ মেনে নিলাম, মানিয়ে নিলাম। তুমি কিন্তু বিজ্ঞানকে স্বীকার করতে পারলে না একতিলও; নিজের জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছ, অসহনীয় করে তুলেছ আমার জীবনকেও। আমি বুঝিয়েছি, যুক্তি দিয়ে স্বমতে আনবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। আমি জবরদস্তি করতে পারতাম, করিনি। আমার ব্যক্তিগত জীবনে তোমার সংস্কারাচ্ছন্ন রুচিকেই সম্মান জানিয়ে এসেছি। আমার অনুরোধ—আমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতেও তুমি হাত দিতে এস না! এ তুমি বুঝবে না।"

আমি আর্তকণ্ঠে বলেছিলাম, "এর আগেও তুমি এরকম পরীক্ষা করেছ?"

—"হ্যাঁ, কেন?"

—"না খেতে পেলে বাচ্চার কী ক্ষতি হয় কেমন করে জানতে পার?"

—"অতি সহজে। ল্যাবরেটারিতে ডিসেক্ট করে।"

—"ডিসেক্ট কী?"

—"পেট কেটে!"

কথা ফুটল না আমার মুখে। অনেকদিনের একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সব পরিষ্কার হয়ে যায়। এত নৃশংস আমার স্বামী? ঐ এলোভুলো মানুষটি! যে দয়া করে বিয়ে করেছে গাঁয়ের এক সাধারণ মেয়েকে, বিনাপণে? এ পাপের স্পর্শ লাগবে না আমার সংসারে? ওপরে ভগবান নেই, তিনি কি অন্ধ? আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, নিজের পাপের ফল উনি চাপাতে চাইছেন আমার ঘাড়ে। আমার অপরাধেই নাকি খোকন এল না আমার বুক জুড়ে। উনি খেতে না দিয়ে খরগোশটাকে আধমরা করবেন,—তারপর নিয়ে যাবেন কলেজে, পেট চিরে বার করবেন বাচ্চাটাকে। দেখবেন, ওঁর নৃশংসতার কতদূর ফল হয়েছে। এরপর কোনওদিন সুস্থ সবল সন্তান আসতে পারে আমার কোলে?

কদিন শুধু গুমরে গুমরে কেঁদেছি। এ লজ্জার কথা, এ দুঃখের কথা কাকেই বা বলি! মাদি খরগোশটা তিলতিল করে শুকিয়ে মরে। আগের মতো আর ছটফট করে না। নিঃঝুম মেরে পড়ে থাকে সারাদিন। আহা বেচারি! উনি কী বুঝবেন, কী কষ্ট হচ্ছে ওর! পেটে ছেলে ধরার কষ্ট তো জানেন না। তার ওপরে উপোস! নিরুপায় হয়ে বাবাকে চিঠি লিখলাম। তিনিই বিপদে চিরকাল পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। বাবা জবাবে লিখলেন, "স্বামীর আদেশ পতিব্রতা সাধ্বী রমণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে। কিন্তু ধর্ম তাহারও উপর। যে জীব তোমার গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে তাহাকে রক্ষা করাও তোমার ধর্ম। তোমার স্বামীকে এ পাপকার্য হইতে নিবৃত্ত করাও তোমার কঠিন কর্তব্য। স্বামী মাথার দিব্য দিয়া খাওয়াতেই বারণ করিয়াছেন,—তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াও তুমি কৌশলে খাঁচা খুলিয়া দিতে পারো। বাসুদেব রক্ষা করিলে কৃষ্ণের জীব মাতৃত্ব লাভ করিবে।"

খাঁচা খালি দেখে উনি আগুন হয়ে ফেটে পড়েছিলেন। আমি কিন্তু মিছে কথা বলিনি; বলেছিলাম, "আমার কর্তব্য আমি করেছি। ওকে তিলেতিলে মরতে দিতে পারি না আমি।"

উনি ভীষণ রাগ করেছিলেন। আমার সঙ্গে কথাই বলেননি অনেকদিন। তা না বলুন, আমার দুঃখ

নেই। কথায় বলে না 'যখন তখন করে পাপ, সময় বুঝে ফলে'—কথাটা পাপকাজের বেলাতেই নয়, পুণ্যকাজের বেলাতেও খাটে। আমার এ পুণ্যকাজের ফল হয়েছিল। তখন তখনই নয়—পাঁচ বছর পরে। অবশ্য আরও কারণ ছিল। ঁপীতুঠাকুরের প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন বাবা! মাদুলিও পাঠিয়েছিলেন একটা। আশ্চর্য সে মাদুলির ক্ষমতা। যেদিন ধারণ করলাম সেদিন উনি যেন একেবারে বদলে গেলেন। তোমরা নিশ্চয় মাদুলিতে বিশ্বাস কর না? কিন্তু আমার কথা শুনলে বিশ্বাস না করে থাকতে পারবে না। যে লোক আমার দিকে পাঁচ বছর চোখ তুলে তাকায়নি, মাদুলি পরার সঙ্গে সঙ্গে সে যে এমনভাবে বদলে যেতে পারে তা কি বিশ্বাস হয়। ঁপীতুঠাকুরের প্রসাদী খাওয়ার পরেই খোকন এল আমার পেটে। বাবাকে লিখলাম ঁপীতুঠাকুরের পূজা দিয়ে মাদুলি পাঠাতে। ভারি ভয় ছিল মনে মনে। উনি একেবারেই ছেলেপিলে ভালোবাসেন না। ছেলের জন্যে আমি মাথা খুঁড়ে মরছি—আর উনি শুধু চেষ্টা করেছেন কি করে আমি মা না হই! তাই যা কিছু পূজা-অর্চনা মানসিক সব আমাকে লুকিয়ে করতে হত। খোকন যে আসবে একথা ওঁকে জানাইনি। যে রকম বদমেজাজি লোক, যদি চটে ওঠেন। যদি জানতে পারেন ঁপীতুঠাকুরের দোর ধরে আমিই এটা করছি—তাহলে কি আর উনি আমাকে আস্ত রাখবেন? কিন্তু লুকিয়েই বা রাখব কতদিন? বলতে তো হবেই একদিন। এমনিভাবে নিজের মনেই ভেবে মরছি এমন সময় বাবা মাদুলি আর পূজার ফুল পাঠালেন।

উনি বলেন, "মাদুলি কিসের?"

আমি বলি, "পরে বলব।"

সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যাবেলা স্নান সেরে নিয়মমত মাদুলি ধারণ করলাম। যেমন নির্দেশ ছিল। রাত্রে সাহসে ভর করে মরিয়া হয়ে বলেই ফেল্লাম।

শুনে অবাক হয়ে গেলেন উনি। প্রথমটা বিশ্বাসই করতে চান না—শেষে যখন শুনলেন চারমাস হয়ে গিয়েছে তখন....

থাক ভাই। সব কথা তো আর বলা যায় না। কিন্তু তোমরা যা আশঙ্কা করছ তা মোটেই হয়নি। উনি একটুও রাগ করেননি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, রাতারাতি মাদুলির এতটা ফল হবে। অদ্ভুত খুশি হয়ে উঠলেন তিনি—আদরে, সোহাগে একেবারে পাগল করে দিলেন আমাকে। পাগল একেই বলে। এতদিন চেষ্টা করছিলেন যেন আমি মা না হতে পারি। পাঁচটা বছর এই নিয়ে কত কষ্ট সহ্য করেছি। আমি নাকি স্বাভাবিক নই, আমার বুক জুড়ে সন্তান এলে নাকি উনি ভীষণ দুঃখিত হবেন। আর যেই শুনলেন যে আমি মা হতে চলেছি অমনি....

হাসছ তো। জানি হাসবেই। ওঁর পাগলামি দেখে আমিও হেসেছিলাম সেদিন। এলোভুলো মানুষটি একেবারে হিসাবের গুরুঠাকুর হয়ে উঠলেন। কারও বউয়ের যেন আর বাচ্চা হয় না। ওই যে বলে না, 'আদেখ্‌লের ঘটি হল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল' ওঁরও সেই বৃত্তান্ত। পরদিনই কলকাতা নিয়ে গেলেন আমাকে। ডাক্তার দিয়ে দেখানো হল। শিশি-শিশি ওষুধ, ছুঁচ-ছুঁচ ইন্‌জেকশান! কী কাণ্ড! সপ্তাহে সপ্তাহে ওজন নাও, নিয়মমাফিক খাও। রোজ বিকেলে ওঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে হয়। এত অত্যাচার কখনই সইতাম না; কিন্তু একটা কারণে আমি কোনও আপত্তি করিনি। কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা হয়। মাদুলি ধারণ করার পর থেকে উনি হঠাৎ রাতারাতি বদলে গেলেন। যেন সে মানুষই নয়। যেন আট বছর আগেকার দিনগুলো, সেই বিয়ের পরেকার টাটকা দিনগুলো ফিরে এসেছে আবার! মাঝেকার এই পাঁচটা বছর যেন স্বপ্নকথা। কই, উনি তো আমার কোন ইচ্ছাই এড়িয়ে যান না। তবে কি ভুল বুঝেছিলাম?

কিন্তু সুখের দিনগুলো কী ছোট! ক'মাস আগে যখন দ্বিতীয়বারের মত হাসপাতালে যাই, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম ফিরে এসে দেখব আবার সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে? মাদুলিটা কি কোনও অনাচারে নষ্ট হয়ে গেল? না হলে এমনভাবে আবার উনি বদলে গেলেন কেন খোকন হবার পর? সারাদিন আবার উনি বই নিয়ে পড়ে থাকেন বাইরের ঘরে।

মাঝে মাঝে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে,—"ওগো দয়াময়, এ তোমার কেমন ব্যবহার? দয়া করে বিয়ে করেছিলে আমাকে। দয়া করে ভালোবেসেছ কখনও কখনও—আবার মাঝে মাঝে এমন ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দাও কেন?"

হাসপাতালে যাবার আগে ছিলাম সুখের সুয়োরানি—সোনার চাঁদ ছেলে কোলে নিয়ে ফিরে এসে দেখছি কখন অজান্তে আবার দুয়োরানি হয়ে গেছি! কেন? কী অপরাধ হল আমার? এ যেন একেবারে গল্পকথা। গল্পের রাজা যেমন রাতারাতি রাখাল হয়ে যায়—আমারও তাই হল—

'কালকে ছিল সোনার পিঁড়ে। আজ বসেছি আঁস্তাকুড়ে।'

ওঁকে আমি বুঝতে পারিনি। পারবও না কোনওদিন। একদিকে উনি স্নেহশীল, দয়াময়, কোমল ভাবুক মানুষ। তখন অল্প আঘাতে ওঁর চোখে জল আসে। তখন গাঁয়ের কালো কন্যেকে এনে বসান সোনার সিংহাসনে। আদরে-সোহাগে তাকে পাগল করে দেন। তখন সে সুয়োরানির শাড়ি-গহনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা করতে থাকেন। তারপর কোথা থেকে দিয়ে কী হয়। উনি বদলে যান একেবারে। যেন অন্য মানুষ। নৃশংস নির্দয়, যেন পাথরে গড়া। তখন জ্যান্ত ব্যাঙ, গিনিপিগকে টেবিলে চিৎ করে ফেলে হাতে-পায়ে পিন ফুঁড়ে—উঃ! তখন ভুলেও আমার দিকে তাকান না। কাছে গেলে সরে যান—যেন অস্পৃশ্য অশুচি আমি। সেই মুহূর্তে বোধহয় দুনিয়ার ঘৃণ্যতম পাপও উনি করতে পারেন অম্লানবদনে!

বিশ্বাস কর না? আমি প্রমাণ দেব। আমার কাছেই তিনি এমন ঘৃণিত পাপের প্রস্তাব করেছিলেন যে, শুনলে শিউরে উঠবে তোমরা। কে বলবে পণ্ডিত অধ্যাপকের এমন বিকৃত রুচি থাকতে পারে। স্বামী হয়ে স্ত্রীকে এ-কথা বলতে পারে। আর শুধু বলা নয়, সেই অধর্মের পাপকাজে আমাকে সহায়তা করতে বলেছিলেন। খোদার ওপর খোদগিরি করবেন উনি। ভগবানের বিধানকে পাল্টে দেবেন। চন্দ্রসূর্য যেন এখনও উঠছে না। কত অনুরোধ-উপরোধ। একআধদিন নয়—প্রতি রাত্রে! সে কাজের কী সব সাজ-সরঞ্জাম পর্যন্ত কিনে এনেছিলেন। স্বামীর কথার কখনও অবাধ্য হইনি। এবার হতে হল। কী করব? ধর্ম সবার ওপরে। আমি তাই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম ওঁর পাপ-প্রস্তাব! কী প্রস্তাব? সে কথা ভাই মুখ ফুটে বলতে পারব না আমি!

দুই

কোন একটি উপন্যাস পড়িতে পড়িতে যদি হঠাৎ দেখি তাহার ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু, শব্দের বানান সমস্তই অতর্কিতে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইতে শুরু করিল—তখন আমরা কী করি? কাণ্ডজ্ঞানহীন গ্রন্থকারকে ইচ্ছামত গালি দিয়া পুস্তক বন্ধ করিয়া উঠিয়া যাই। কারণ উপন্যাস রচনার একটা সর্বজনস্বীকৃত প্রচলিত রীতি আছে। সে রীতি লঙ্ঘন করিলে লেখককে শাস্তি পাইতে হইবে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে কী করিব! কোনও একটি লোককে লইয়া ঘর করিতে করিতে যদি সহসা অনুভব করি তাহার সুর বদলাইয়া গেল—তখন তো তাহাকে মুড়িয়া রাখিতে পারিব না। অনুরাধা নামের যে গ্রাম্য পণ্ডিতের অরক্ষণীয়া কন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছিলাম তাহার পৈত্রিক নাম—রাধারাণী। সেটা সেকালের নাম। আমার পছন্দ হয় নাই। তাই একটু নূতনতর নামের মোড়ক দিবার প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু নামের পরিবর্তন কি মানুষটার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয়? কতটুকু জানিতাম তাহাকে বিবাহের সময়ে? উপরের মলাটের শুচিশুভ্র প্রচ্ছদপট আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বইটি ঘরে আনিয়া পড়িতে শুরু করিলাম। ভালো লাগিল। তাহার পর হঠাৎ এক পরিচ্ছেদে আসিয়া নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি। হঠাৎ দেখি উপন্যাসটির ভাব-ভাষা বিষয়বস্তু সমস্তই অতর্কিত আঘাতে ভিন্ন খাতে বহিতে শুরু করিয়াছে। বই বন্ধ করিবার উপায় নাই। বাকি পরিচ্ছেদগুলিও পড়িতে হইবে। ভালো লাগুক আর না লাগুক—পরীক্ষার পূর্বে রাত্রি জাগিয়া ছাত্র যেমন নীরস পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া যায় তেমনি করিয়া হইলেও এ পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়িতেই হইবে আমাকে।

এই কথাই ভাবিতেছিলাম কাল রাত্রে আমার পাঠগৃহে। জীবনকে আমরা খণ্ড খণ্ড রূপে দেখি। যে কোনো ঘটনা, যে কোনো মানুষকে আমরা বিচার করি এই একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে। আমার দৃষ্টিপথে যেটুকু গোচর সেটুকু আমার নিকট তাহার পরিচয়। তাই এত ভুল বোঝাবুঝি। মতে ও পথের পার্থক্য লইয়া দুনিয়ার এত মাথা ফাটাফাটি। অধিকাংশ মানুষই আত্মবিশ্বাসে কাজ করে। আর অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো সত্যের আংশিক উপলব্ধি লইয়া দৃষ্টিহীনদের মতান্তর। আমার জীবনের

ব্রত—সত্যকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিচার করিয়া গ্রহণ করিব। যেটুকু আপাতদৃশ্যমান তাহার অতীতেও সত্য থাকিতে পারে! তাই সহসা কোন সিদ্ধান্তে আসিতে চাহি না। অনুরাধাকেও বুঝিবার চেষ্টা করি, বুঝাইবারও।

বারান্দার বড় ঘড়িটায় একটানা কয়েকটা বাজিয়া গেল—ঢং ঢং ঢং ঢং। কয়টা বাজিল? প্রথম হইতে গোনা হয় নাই। এগারোটা? না বারোটা? টেবিলের ড্রয়ারটা টানিয়া হাতঘড়িটা দেখিতে গেলাম। ড্রয়ারে ঘড়িটা নাই। গেল কোথায়, এখানেই তো থাকে। এখানে ওখানে খুঁজিতে থাকি, হঠাৎ নজরে পড়িল দেওয়ালের একটা পেরেকে টাঙানো আছে হাতঘড়িটা। উঠিতে হইল। ঘড়িটা টেবিল ল্যাম্পের নিকট আনিয়া দেখি সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে। অর্থাৎ থামিয়া আছে। দম দিতে ভুলিয়াছি। আজকাল বড় ভুল হইতেছে। পূর্বে তো এইরূপ ভুল হইত না। অনুরাধার এইবারকার অসুখের পর হইতেই বেশি ভুল হইতেছে। অথচ এমন একদিন ছিল যখন তিলমাত্র ভুল হইলে ক্ষোভের আর সীমা থাকিত না। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় একটা এক্সট্রা ভুল করায় অঙ্কে পুরা একশ নম্বর পাই নাই। মনে আছে ভুলটা জানিতে পারিয়া সারারাত ঘুম হয় নাই।

দম দেওয়া শেষ হইল। এইবার কাঁটা ঘোরাইতে হয়। কিন্তু কয়টা বাজে, এগারোটা না বারোটা? বাহিরে আসিয়া বারান্দার আলোটা জ্বালিলাম। মধ্যরাত্রে অধ্যাপক গৃহস্বামীকে তাহার খবরদারি করিতে দেখিয়া বড় ঘড়িটা যুক্তকর কপালে ঠেকাইল।

ড্রয়ারে ঘড়িটা রাখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। অনুরাধা নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ফিনকি দিয়া জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গুমট গরম। বাহিরে একটানা ঝিল্লিস্বর। তাহা ভিন্ন বিশ্বচরাচরে আর কোথাও প্রাণের সাড়া নেই। শব্দ আছে। বারান্দার বড় ঘড়িটার। একটানা যান্ত্রিক শব্দ—টক্, টক্, টক্, টক্। হিসাব রাখিয়া চলিয়াছে—সীমিত জীবনের সময়ের অপব্যয়।

দোতলার খোলা ছাদে ক্যাম্পখাট পাতিয়া সুবিমল ঘুমাইতেছে। ঐ এক আশ্চর্য ছেলে। ঘরে শুইলে ওর নাকি ঘুম হয় না। বর্ষা ও শীতের কয়টা মাস বাদ দিয়া সারাটা বৎসরই মুক্ত আকাশের তলায় রাত্রিযাপন করে।

বড় ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। দুই দিকে দুইখানি খাট পাতা। এদিকে একখানি ড্রেসিং টেবিল—তাহার উপর সামান্য কয়েকটি প্রসাধন দ্রব্য। পায়ের দিকে আলমারিতে অনুরাধার জামা-কাপড়, টাকা-পয়সা, গহনা থাকে। উন্মুক্ত জানলা দিয়া এক ঝলক জ্যোৎস্না মেঝের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অস্পষ্ট, আলোকে ঘরের সবকিছুই দেখা যাইতেছে। নিঃশব্দে খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। গেঞ্জিটা খুলিয়া মশারি উঠাইয়া শুইতে যাইবার পূর্বে একটু থামিলাম—ভারি ইচ্ছা করিতেছে, ওর খাটের কাছে আসিয়া একবার দেখি। বিনিদ্র অনুর মুখখানা দেখিবার একটা অদম্য বাসনা জাগিতেছে। ইতস্তত করি। না, কাজ নাই। অনুরাধার ঘুম বড় সজাগ।

সন্তর্পণে খাটে উঠিতে যাইব, ও-খাট হইতে অনু বলিয়া উঠে—বনপর্বটা শেষ হল?

চমকিয়া উঠিলাম—কী শেষ হল?

—বনপর্ব!

এবার বুঝিতে পারি। কিছুদিন ধরিয়া যে বিরাট নিবন্ধটা লিখিতেছি অনুরাধা তাহাকে 'মহাভারত' বলে বটে।

বলিলাম—তা অষ্টাদশ-পর্বের মধ্যে বনপর্বের কথাই বা মনে পড়ল কেন? ওটা আকারে বড় বলে?

—না, একজনের বনবাসের ব্যবস্থা করছ বলে।

আমি হাসিয়া লঘু করি—আমার প্রবন্ধ লেখায় কাকে আবার বনে যেতে হচ্ছে? তোমাকে নাকি? কই সেরকম তো লক্ষণ দেখছি না।

অনুরাধা ছড়া কাটে,—পিসিমা বলতেন, "মনের দুখে যাসনে বনে, বন আছে তোর ঘরের কোণে। ভাতার যখন ঘুরায় মুখ, ঘরেই বনবাসের সুখ।"

-আশ্চর্য সঙ্কলন অনুরাধার। কোথা হইতে এইসব উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ করে? আর সময়মতো মনেও পড়ে এইসব আধা-অশ্লীল ছড়া! লোক-সমাজে অনুরাধার যাতায়াত নাই। আমাকে নানা রকম নিমন্ত্রণ

রাখিতে হয়। কলেজ সোস্যাল, রি-ইউনিয়ান, সভা-সমিতি। অনুরাধা আমার সহিত কখনও যায় না। এক-আধবার পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম—দেখিলাম, ও এ পরিবেশে অসোয়াস্তি বোধ করে। আজকাল অনু আমার সহিত বস্তুত কোথাও যায় না। সুবিমলই ওর একমাত্র সঙ্গী। জানি না, সে এই ছড়াগুলি কী ভাবে গ্রহণ করে।

—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

—না, ঘুমাব কেন? এইমাত্র তো শুলাম।

—তবে কথা বলছ না যে?

—কী বলব?

—তা ঠিক। নির্জন ঘরে স্ত্রীকে বলবার মতো কী কথা থাকতে পারে মানুষের? পাঁচজনের সামনে তবু দু-কথা বলা যায়। একা ঘরে অহেতুক কথা বলে লাভ কী? এখানে চুপ করে থাকলে তো কেউ ভাববে না, ওদের স্বামী-স্ত্রীর মিল হয়নি।

—কী আজে-বাজে বকছ অনু? কেন এসব কথা ভেবে মিথ্যে কষ্ট পাও?

—মিথ্যে? তুমি বলতে চাও এ আমার মিথ্যে অভিযোগ? তুমি কোনোদিন আমাকে সত্যিকারের ভালোবেসেছ?

মধ্যরাত্রে এ কী কঠিন প্রশ্ন করিয়া বসিল অনুরাধা? কী জবাব দিব? কয়মাস ভিন্ন কক্ষে শুইতাম—এসব ঝঞ্ঝাট ছিল না। গভীর রাত্রে ধর্মপত্নীর এজাতীয় কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। বিবাহের পূর্বেও অনুরাধার স্বাস্থ্য এমন কিছু ভালো ছিল না। গোল বাধিল সন্তান হওয়ার সময়। প্রথম সন্তান হওয়ার সময় জানা গেল তাহার শারীরিক ত্রুটি আছে। আমি খুব সাংসারিক নই। প্রথমাবস্থাতেই যদি ডাক্তার দেখাইতাম, তাহা হইলে হয়তো আমাদের প্রথম সন্তানটিকে বাঁচাইতে পারিতাম। ত্রুটি আমারই। সেদিনকার সব কথা মনে পড়ে। হাসপাতালের চওড়া বারান্দাটায় পায়চারি করিতেছিলাম। হঠাৎ লেবার-রুম হইতে সার্জেন বাহিরে আসিয়া আমাকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিলেন—জননী আর সন্তান দুইজনকেই বাঁচানো সম্ভবপর নহে। আমি কাহাকে চাই?

অনুরাধা প্রায়ই বলে মৃত্যুই তাহার কাম্য। তাহা হইলে আমি নাকি নিষ্কৃতি পাই। সেদিন কিন্তু সন্তান অপেক্ষা তাহার জননীকেই চাহিয়াছিলাম আমি।

—আমার সঙ্গে কথা বলতে কি বিরক্ত বোধ হয়?

—কেন এমন করে বলছ অনু? তুমি তো জান—কত ভালোবাসি তোমাকে?

—ছাই বাস। আজ চার মাসের মধ্যে কোনওদিন এসে বসেছ এ খাটে?

—বসিনি? রোজ সকাল-সন্ধ্যা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি তোমার পাশে বসে। আর্নড-লীভ সব ফুরিয়ে ফেলেছি! তুমি বলছ কী অনু? কলেজে আমার বদমান হয়ে গেছে এই জন্যে। কমলবাবু সেদিন বলছিলেন—আরে মশাই বাচ্চা তো আমাদেরও হয়, কিন্তু সেজন্যে এমন আঁতুড় আঁকড়ে পড়ে থাকি না।

অনুরাধা একটু যেন নরম হয়। বলে—ওসব বাজে কথা, কে বলছিলেন বললে?

—কমলবাবু। হিস্ট্রির। তাছাড়া তুমিও তো সেদিন কী যেন ছড়া কাটলে—ঘটিহীনের ঘটি হল, ঘটি ঘটি জল খেল—না কী যেন!

অনুরাধা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে। বলে—ঘটিহীন কী গো? বল আদেখ্‌লের। এতবার শোন তবু মনে থাকে না তোমার?

এই জন্যেই ওকে এত ভালোবাসি। এত অল্পতেই ও সন্তুষ্ট হয়। একটু রসিকতা, একটু মিষ্টি কথা, আর ও একেবারে খুশিয়াল হইয়া ওঠে। বোটানি-জুলজির বিদ্‌ঘুটে ল্যাটিন নাম লইয়া যাহার কারবার, তাহার পক্ষে এটা যে একটা ইচ্ছাকৃত বিস্মৃতিও হইতে পারে—এটুকু বুঝিবার মতো বুদ্ধিও তাহার নাই।

—তা, তুমি এখানে এসে ব'স না। এত চেঁচিয়ে কি কথা বলা যায়?

—চেঁচাতে হবে কেন। এই তো পাশাপাশি খাট।

—তার মানে তুমি আসবে না!

—শুয়ে পড়েছি যে।

—বুঝেছি, থাক।

অনু চুপ করে। আমার ঘুম আসে না। বুঝিতেছি, অনু অভিমান করিতেছে। তা করুক, এখনই ঘুমাইয়া পড়িবে। আমি উঠিব না, ওঠা উচিত নহে। ওর শয্যায় গিয়া গল্প করিতে বসা বিপদজনক।

কিন্তু এভাবে চলিবে কী করিয়া বাকি জীবন?

প্রথম সন্তানটিকে জীবিত পাই নাই। আমি সে জন্য দায়ী। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অপরাধ আমার। আমি সময়মতো সাবধানতা অবলম্বন করি নাই। জীবনের ত্রিকোণমিতিতে একবার আলফা স্থলে বিটা লিখিলে আর রক্ষা নাই। সে অঙ্ক আর মিলিবে না। অনুরাধার দেহাভ্যন্তরে নবজীবনের স্পন্দন শুনিতে পাইয়াই আমার কর্তব্য ছিল বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া। সে ব্যবস্থা করি নাই! তখন গুরুত্বটা বুঝি নাই। যখন বুঝিলাম তখন আর উপায় নাই! স্ত্রী-পুত্রের একজনকে বাছিয়া লওয়ার প্রশ্ন উঠিল। প্রথমাবস্থাতেই যদি ডাক্তার দেখাইতাম তাহা হইলে তখনই জানিতে পারিতাম যে, স্বাভাবিক প্রসব সম্ভবপর নহে। তখন নিশ্চয়ই মফস্বলের ভরসা ত্যাগ করিয়া কলকাতায় আসিতাম। সিজারিয়ান করানো চলিত—এবার যেমন করানো হইল।

.....হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। অনু কাঁদিতেছে। বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া গুমরাইয়া কাঁদিতেছে। নিদ্রিত হইবার ভান করি।

এ কী বিপদে পড়িয়াছি। এর সমাধান কোথায়? কত জটিলতাই না আসে জীবনে! অনুরাধাকে সত্যিই আমি ভালোবাসি। প্রথমদিন যেমন বাসিতাম আজও তেমনি বাসি। না থাক তাহার রূপ, না থাক যৌবনের মাদকতা—তবু এই শান্ত পল্লিবালিকাটিকেই একদিন নিজে পছন্দ করিয়া জীবনসঙ্গিনী করিয়াছিলাম। হ্যাঁ, ভালোবাসিয়াই। অনু আজও বলে—না, না, তুমি কোনোদিনও আমাকে ভালোবাসনি, শুধু দয়া করেছ! কে চেয়েছিল তোমার দয়া?

দয়া? অসম্ভব নয়! হয়তো অনুকম্পাই জাগিয়েছিল প্রথমে। না, সত্যকে অস্বীকার করিব না। অনুকম্পাই আছে আমার দাম্পত্য জীবনের আদি-কাণ্ডে। অরক্ষণীয়া পূর্ণযৌবনা মেয়েটির প্রতি একটা মমতা জাগিয়াছিল। কন্যাদায়গ্রস্ত সরল গ্রাম্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটির প্রতি একটা কারুণ্যই বোধ করি আমার প্রেমের গঙ্গোত্রী; কিন্তু সেই মনোবৃত্তিই তো একমাত্র উপাদান নহে। আদিকাব্যের প্রথম শ্লোকও তো জন্মগ্রহণ করিয়াছিল করুণার উৎসমুখে—কিন্তু রামায়ণ মহাকাব্যে সেই কারুণ্যরসই তো একমাত্র উপজীব্য নহে। ঐ একহারা মেয়েটি যখন আসিয়া আমার সংসার-তরণির হাল ধরিয়া বসিল, তখন তাহারই ভিতর দেখিয়াছিলাম গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণময়ী মূর্তি।

তিল তিল করিয়া জয় করিয়া লইয়াছিলাম অনুরাধাকে। ওর লজ্জা, ওর সঙ্কোচ ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়াছলাম। হীনম্মন্যতা ছিল ওর চরিত্রের একটি দুর্বলতা। সেটা সে জয় করিতে শিখিল। ঐ ভীরু এণাক্ষীর কোমল হাতটি ধরিয়াই অতিক্রম করিয়াছিলাম যৌবরাজ্যের এক গোপন সিংহদ্বার। অজানিত মহাদেশের পথের সন্ধান পাইয়াছিলাম ওরই সাহচর্যে। বিবাহের অনতিকালের মধ্যে অনুরাধার অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছিল। শুধু মনে নহে—দেহেও। কৃশ তনু কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। স্বচ্ছসলিলা শীতের নদী যেন রূপান্তরিত হইল ভাদ্রের ভরা-গাঙে। জৈবিক কারণ আমার অজানা নহে। গ্রন্থিরস-মাহাত্ম্য আমাকে পড়াইতে হয়, তবু মনে হইল এ শুধু ভালোবাসারই দান এ শুধু। কুমারী মেয়েটির অনাদৃত যৌবন যেই সম্মানিত হইল—অমনি যেন তাহার জীবনের বাগিচায় বসন্ত আসিয়া পৌঁছিল।

তারপর দেখিলাম তাহার অপর একরূপ। মাতৃত্বের রূপ। অধ্যাপক অবনীমোহনের প্রদীপ হইতে সে একটি নূতন দীপশিখা জ্বালিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। সে প্রদীপ জ্বলে নাই। জন্মমুহূর্তেই চিরতরে নিভিয়া গেল। তাহার জন্য আমি নিজেকে দায়ী করি। অনুরাধা কিন্তু আমার যুক্তি স্বীকার করে নাই। সে বিজ্ঞানকে মানে না। সে দোষারোপ করিল এক অদৃশ্য শক্তির উপর। ভগবান, নিয়তি, কর্মফল—ঐ জাতীয় কিছু। আমার সমস্ত যুক্তিতর্ক ভাসিয়া গেল। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সে কর্ণপাত করিল না। সে কথা বুঝিবার মতো শিক্ষাই ছিল না তাহার। এখানেই শেষ হইলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু ঘটনাস্রোত তো থামিয়া থাকে না।

ওর দেহের অভ্যন্তরে যে অস্থির বিকৃতি আছে—ওর পক্ষে যে স্বাভাবিক ভাবে জননীত্ব লাভের

উপায় নাই—এই মূল-সত্যটাকে সে ছড়া কাটিয়া উড়াইয়া দিল। পেল্‌ভিক্ গার্ডল্ কী, তাহার ন্যূনতম অথবা স্বাভাবিক ব্যাস কত এ সকল কথা সে শুনিতেই চাহিল না। ও দোষারোপ করিল সার্জেনের উপর। তা করুক—কিন্তু সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্যও সে সাবধান হইতে অস্বীকার করিল। এখানেই আসিল প্রথম জটিলতা।

নানা যুক্তি দিয়া, আলোচনা করিয়া, বই পড়িতে দিয়া তাহাকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছি—কিন্তু অনুরাধার আজন্ম সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিতে পারি নাই। আমার পরামর্শে সে কর্ণপাত করে নাই। এ কী অত্যাচার! ভগবানের ব্যবস্থার উপর মানুষ হস্তক্ষেপ করিবে? ঈশ্বরের দুনিয়া নাকি চলে অঙ্কশাস্ত্রের মত কঠিন নিয়মে—সেখানে মানুষের হস্তক্ষেপ পাপ!

আশ্চর্য যুক্তি ওর। ধরা যাক্ ঈশ্বর নামে সত্যিই একজন অলক্ষ্যবাসী ম্যাথমেটিসিয়ান আছেন। ওর যুক্তি, তিনি যখন যোগ করিতে চাহেন তখন তাঁহাকে বাধা দিলে পাপ হইবে। অথচ সে ভদ্রলোক যখন বিয়োগ অঙ্ক কষিতে বসেন তখন ঔষধ, ইন্‌জেকশন, অক্সিজেন সিলিন্ডার আনিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে ধূলিসাৎ করিলেও কোনো পাপ হইবে না!

আজ আট বৎসর হইল আমাদের বিবাহ হইয়াছে। ইহার ভিতর প্রথম তিনটি বৎসর কাটিয়াছিল নিরুপদ্রবে। চতুর্থ বর্ষে অনুরাধার ক্রোড়ে আসিল প্রথম সন্তান। না, ভুল বলিলাম। অনু সেই শিশুকে ক্রোড়ে পায় নাই। বস্তুত সে সন্তানকে ও চক্ষেই দেখে নাই। দেখিতে চাহিয়াছিল—ডাক্তার অনুমতি দেন নাই। কী লাভ সেই খণ্ডিত কর্তিত মাংসপিণ্ডটিকে দেখাইয়া? অনুশোচনা বাড়ানো বই তো নয়! আমি দেখিয়াছিলাম—কিন্তু সে কথা তাহার নিকট স্বীকার করি নাই।

এইদিন হইতেই আমাদের জীবনের জটিলতা শুরু হইল। ওর দেহে যে আঙ্কিক ত্রুটি আছে, এই সহজ সত্যটাকে সে স্বীকার করিল না। বলে,—আমার চেয়ে কত রোগা-পটকা মেয়ে কোলে ছেলে নিয়ে বাড়ি চলে গেল—আর যত দোষ এই নন্দ ঘোষ। আসলে ডাক্তারবাবু নিজের ভুল আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন। নিজে জানেন না নাচতে, দোষ হল উঠোনের।

প্রতিবাদ করিয়াছি, বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছি—কোনো ফল হয় নাই। এ প্রসঙ্গ পারতপক্ষে আর উত্থাপনই করিতাম না।

কিন্তু জীবনের গতি তো থামিয়া থাকে না! অতীতের বিশ্লেষণ বন্ধ করা যায়—কিন্তু ভবিষ্যতের আশঙ্কা? বর্তমানের আচরণ? তাহাকে তো এড়ান যায় না। জীবন তো উপন্যাস নয়—যে ভালো না লাগিলে বই বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিব। অভিমান করুক—রাগ করুক, অনুর নিরাপত্তার কথাটা তো উপেক্ষা করিতে পারি না। চার-পাঁচ বৎসর অমোঘ দুর্দৈবকে দিনক্ষণ হিসাব করিয়া প্রতিহত করিয়াছিলাম! তারপর একদিন অনুরাধারই জয় হইয়াছে। মোট কথা আমি হারিয়া গেলাম। ওর দেহের অভ্যন্তরে আবার দেখা দিল নূতন জীবনের উন্মেষ। খুশিয়াল হাসিতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! মাথা দোলাইয়া ছেলেমানুষের মত বলিল—দেখলে তো? বলেছিলাম না? খোদার ওপর খোদগিরি করবে তোমরা! এখন কী? পারল তোমার বিজ্ঞান কিছু করতে?

কী জবাব দিব? বিজ্ঞান চলে ক্ষুরধার সঙ্কীর্ণ পথে। তিলমাত্র বিচ্যুতিকে সে দণ্ড দেয় ক্ষমাহীন কঠোরতায়! অনুরাধা কোনওদিন আমাকে বিজ্ঞানসম্মত পথে চলবার অধিকার দেয় নাই। এতদিন যে দুর্ঘটনা ঘটে নাই এটাই বিস্ময়! এসব কথা কাহাকে বুঝাই? আট বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি—ওসব যুক্তিতর্ক বৃথা! এবার আর ভুল করি নাই। বিশেষজ্ঞকে দিয়া যথাসময়ে অনুকে পরীক্ষা করাইলাম। নিয়মমতো সেবা-যত্নের ব্যবস্থা হইল। আশঙ্কা ছিল এত ঔষধপত্র, এত নিয়মের নির্দেশ সে মানিতে রাজি হইবে না—কিন্তু আশ্চর্য, সে অতি সুশীলা হইয়া উঠিল। তাহার এ পরিবর্তনের কোনো অর্থ বুঝিলাম না—হয়তো বিজয়ের আনন্দেই সে অধীর।

....নাঃ! আর তো পারা যায় না! অনুর কান্নার বেগ বাড়িয়াছে। এত জোরে ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে যে সত্য সত্য নিদ্রিত হইলেও আমার ঘুম ভাঙিবার কথা—কপট নিদ্রাকে আর জিয়াইয়া রাখা চলে না।

অস্ফুটে ডাকিলাম—অনু!

ও সাড়া দেয় না। কান্নার বেগটা শুধু বাড়ে।

—কী হল, সাড়া দিচ্ছ না যে?

তবু নিরুত্তর! উঠিয়া বসিলাম। ইতস্তত করিয়া অগত্যা বলি—বেশ আমি তোমার বিছানায় যাচ্ছি, কিন্তু কথা দাও.....

আমাকে বক্তব্য শেষ করিতে দেয় না! হঠাৎ আর্তকণ্ঠে ফাটিয়া পড়ে—থাক, থাক দয়াময়—তোমাকে আসতে হবে না।

এরপরে আর এ পৃথক শয্যায় পড়িয়া থাকা চলে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মশারি তুলিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম করি।

অনু উঠিয়া বসে। বলে—তুমি এ-খাটে এলে সত্যি বলছি আমি বেরিয়ে যাব ঘর থেকে; আমি চেঁচাব কিন্তু। আমি ঠাকুরপোকে ডেকে তুলব।

বাধ্য হইয়া পুনরায় শুইয়া পড়ি। অনুও শোয়! কান্নার শব্দটা থামিয়াছে। হয় চুপ করিয়াছে, অথবা নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। ঢং করিয়া বারান্দার ঘড়িতে একটা শব্দ হইল। সাড়ে বারোটা না একটা? বুঝিতে পারিলাম না।

আমার ঘুম চড়িয়া গিয়াছে। কী করিয়া এই কঠিন সমস্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহাই ভাবিতেছি। অনু ফলাফল দেখিয়া বিচার করিতে অভ্যস্ত। উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ করিতে সে নারাজ। যে কয়েকমাস তাহার দেহের গোপন কারখানায় নব জীবনের অঙ্কুরোদ্‌গম হইতেছিল—সেই কয়মাস সে অবোধ আনন্দে আমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে। এখন আর আমাকে সে ঐ ভাবে পায় না। এর যে জৈবিক কারণ তাহা সে কিছুতেই বুঝিল না। লাভের সময় খুশিয়াল আনন্দে ছেলেমানুষি করিত, লোকসানের সময় কাঁদিয়া ভাসাইল—অথচ একবারও খাতা-পেন্সিল লইয়া কষিয়া দেখিল না, কেন এই লাভ—কীসের এ লোকসান। ওদের এই এক সুবিধা। জীবনের ট্রায়াল-ব্যালান্স না মিলিলে আমাদের নিদ্রা হয় না। ওদের ও বালাই নাই। গোঁজামিলের অজস্র ফল্‌স ভাউচার আছে। প্রয়োজনমতো প্রয়োগ করিলেই হইল—ভগবান আছেন, অদৃষ্ট-নিয়তি-কর্মফল আছে, না হউক ব্রাহ্মণের অভিশাপ অথবা পূর্বজন্মের সুকৃতিকে কে ঠেকাইবে? আমার আচরণের পরিবর্তনটার জৈবিক কারণ সে দেখিল না। দেখিবে কী করিয়া, ওর মনে যে বদ্ধমূল ধারণা রহিয়াছে—ওর রূপহীনতাই আমার বীতরাগের কারণ।

এবার সে সুস্থ-সবল সন্তান লইয়াই হাতপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যটি ভাঙিয়াছে। অবশ্য ডাক্তারের মতে কয়েকমাস সাবধানে চলিলে, নিয়মমত আহারাদি করিলে, পরিশ্রম না করিলে ক্রমে সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। সুতরাং আমাকে দ্বিগুণভাবে সাবধান হইতে হইল।

অনু খোকনের জন্য একটি বেবি-কট কিনিতে বলিল। আমি আপত্তি করিয়াছিলাম। আমি নিজের জন্য পৃথক খাট বানাইয়াছি। বেবি-কটের আর প্রয়োজন ছিল না। ও কিন্তু কর্ণপাত করিল না, সুবিমলকে দিয়া খোকনের জন্য ছোট দোলনা খাট আনাইল। অনুর দুগ্ধ খোকনকে খাওয়ানোতে নিষেধ ছিল—তাই রাত্রে একটি দুগ্ধবতী ধাত্রীর ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তাহাকেই শিখণ্ডী করিয়া আমি অন্তরালে আত্মগোপন করিলাম। অনু তাহাকে সহ্য করিতে পারিত না। অনবরত সে আমাকে বুঝাইত সে ভালো হইয়া গিয়াছে—খরচ করিয়া ধাত্রীটিকে রাখা নিরর্থক। আমি সম্মত হই নাই। শেষে একদিন সুবিমলও আসিয়া তাহার বৌদির পক্ষে সওয়াল শুরু করিল! সচরাচর সুবিমল এ সকল কথার মধ্যে থাকে না। সহসা তাহাকে অনুর পক্ষ লইয়া সুপারিশ করিতে দেখিয়া কিছু বিস্ময় বোধ করিয়াছিলাম। সুবিমল আমার নিজের ভাই নহে। সম্পর্কটা এমন কিছু নিকটও নহে। গ্রাম সম্পর্কে ওর বাবাকে আমি মামা বলিয়া ডাকি। ওর বাবা আজন্ম গ্রামের মানুষ। সম্পন্ন গৃহস্থ। লেখাপড়ায় সুবিমল বরাবরই ভালো। যখন কলেজে পড়িতে চাহিল তখন তিনি ছেলেকে হস্টেলে-মেসে পাঠানোর অপেক্ষা আমার নিকটে রাখাই বাঞ্ছনীয় বোধ করিলেন। আমি অনুর সহিত পরামর্শ করিলাম। বলিলাম—ও বরং এখানে থেকেই পড়ুক। তবু তোমার একজন সঙ্গী হবে।

অনু আপত্তি করিয়াছিল। অপরিচিত পুরুষমানুষ বাড়িতে আসিয়া থাকিবে, সে কেমন করিয়া সম্ভব! বুঝাইলাম, বাইরের লোক তো নয়—সে তোমার দেওর।

—দেওর! কেমন ভাই হয় তোমার?

সম্পর্কটা বুঝাইতে গিয়া বেগ পাইতে হয়। অনু হাসিয়াই খুন, বলে—বুঝেছি, বুঝেছি, সইয়ের মায়ের বকুলফুলের....

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—আহা তা কেন, ওর বাবা আমার মামা হন!

—কী রকম মামা? তোমার মায়ের কীরকম ভাই?

বিব্রত হইয়া বলি—অত জেরার কী দরকার, আপন ভাই নয়। গ্রাম্য-সম্পর্কে মায়ের ভাই হন।

ও বলে—সে কথা বল্লেই হয়, 'ওর গোয়ালে বিয়ালো গাই, সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই।"

সেই সুবিমল আজ অনুর একান্ত ভক্ত, সেবক, বন্ধু। সুবিমলও যখন আসিয়া তাহার বৌদির সহিত আমার বিরুদ্ধে তর্ক জুড়িল তখন বাধ্য হইয়া ধাত্রীটিকে বিদায় দিলাম। এবং তৎক্ষণাৎ সেই সাবেক সমস্যাটির সহিত পুনরায় মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইল। আজ চার-পাঁচমাস পরে নির্জন কক্ষে স্ত্রীর সহিত শুইতে আসিয়াছি এবং আসিয়াই আমার বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি।

...ঢং ঢং করিয়া বারান্দার ঘড়িতে দুইটা বাজিল। তাহা হইলে তখন দেড়টা বাজিয়াছিল। নাকি ইতিমধ্যে আরও বার দুই বাজিয়াছে, খেয়াল করি নাই। সে যাহাই হউক, এখন রাত দুইটা। কিন্তু ঘুম কি আজ আর আসিবে না? অনু নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুমাইয়াছে। না, ঘুমোয় নাই—মশারির ভিতর হাতপাখা নাড়িতেছে।

হঠাৎ খোকন কাঁদিয়া ওঠে!

উঠিতে হইল। ওর খাটের সংলগ্ন বেবি-কট। খোকনকে সন্তর্পণে তুলিয়া লইলাম। কাঁথাটা ভিজা। ও, তাই ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। শিশুকে বাম স্কন্ধে লইয়া কাঁথাটা পরিবর্তন করিয়া পুনরায় শোয়াইয়া দিই।

—ওকে আমার কাছে দাও।

—কেন? ও তো ঘুমিয়ে পড়েছে। শুইয়ে দিয়েছি, আর কাঁদবে না।

—হ্যাঁ কাঁদবে। ওর ক্ষিদে পেয়েছে, দাও আমার কাছে!

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকি। আবার সেই একগুঁয়ে মেয়েটি অবুঝের মতো তর্ক করিতেছে। খোকনের জীবনযাত্রা ঘড়ির কাঁটার নির্দেশ মানিয়া চলে। অসুস্থা অনুর বুকের দুগ্ধ সে খায় না, একথা বিস্মৃত হওয়ার কোনো কারণ নাই; তাহা হইলে এ জিদের অর্থ কী? তবু সে কথা না বলিয়া অন্য কথা বলি—একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে, তুলতে গেলেই উঠে পড়বে।

—বেশ তুমি শোও গিয়ে, আমি তুলে আনছি—যাও!

অনু উঠিবার উপক্রম করে। মশারি তুলিয়া বাহিরে আসে।

—কেন তুমি মাঝে মাঝে এমন অবুঝ হও বলতো? খোকন কি তোমার বুকের দুধ খায়, যে মাঝরাতে টেনে তুলছ ওকে?

—এতদিন খেতো না, এবার থেকে খাবে। তুমি নিজে যা খুশি কর, ওকে কেন বঞ্চিত কর?

—কেন বঞ্চিত করি তা তুমি জান না? ডাক্তারবাবু বলেন—

—তোমার ঐ ডাক্তারবাবুর নাম কর না আমার কাছে। খুনে অসভ্য ডাকাত একটা।

—কিন্তু ঐ ডাক্তারবাবুর দৌলতেই খোকনকে পেয়েছ, এটা ভুলে যেও না। এটুকু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত তোমার।

—কৃতজ্ঞতা! তুমি বুঝি মনে করেছ তোমার ঐ অসভ্য ডাক্তারবাবুর দৌলতে পেয়েছি আমার খোকনকে? ঐ বিশ্বাস নিয়েই থাক। কী করে খোকনকে পেয়েছি জান?

হাসিও পায়, কান্নাও আসে। এত বড় সত্যটাকে ছড়া কাটিয়া উড়াইয়া দিবে অনু? সে কি কোনোদিনই বুঝিবে না, ঐ সদ্যোজাত বিস্ময়কে দুনিয়ায় আনিবার কৃতিত্বটা একান্তই বিজ্ঞানের! কে অসম্ভবকে সম্ভব করিল? আমার বঞ্চিত পিতৃত্ব, অনুর তৃষ্ণাতুর মাতৃত্বকে কে সার্থক করিল? অনুরাধা? আমি? তাহা তো নহে। এ শুধু উন্নত শল্যশাস্ত্রের দান! খোকন ম্যাক্‌ডাফের মতো জননীর সন্তান নহে, জুলিয়াস সিজারের মতো চিকিৎসক তাহার জনক।

—কী করে পেয়েছি জান খোকনকে?

—কী করে?

—এতদিন বলিনি তোমাকে। আজ বলতে বাধ্য হলাম। খোকনকে পেয়েছি বাবা পীতুঠাকুরের দয়ায়। বাবা পুজো দিয়ে প্রসাদী পাঠিয়েছেন, তাইতেই খোকন এল আমার বুকে।

প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। বলিলাম, তা হবে।

—জানি, জানি, বিশ্বাস করবে না তুমি। তাই জানি বলেই এতদিন বলিনি তোমাকে। আজ তুমি ডাক্তারবাবুর কথা তুল্লে তাই রাগের মাথায় বলে ফেল্লাম। ডাক্তারবাবুর আদেশ! তাই খোকন কোনোদিন মায়ের দুধ পাবে না। অনেকদিন ওসব বুজরুকি শুনেছি, আর আদিখ্যেতা ভালো লাগে না। দাও এখন খোকনকে।

তবু প্রতিবাদ করিতে হয়—তোমার শরীর এখন অসুস্থ। ও দুধ খেলে খোকনের শরীর খারাপ করবে! লক্ষ্মীটি, কথা শোন।

—কক্ষনো করবে না! মায়ের দুধ খেলে নাকি ছেলের শরীর খারাপ করবে? রাখ তোমার ডাক্তারের ফুটানি। বাবা কী বলেন জান?

এই আর এক বিড়ম্বনা! এই বিজ্ঞানের যুগে অভ্রান্ত সত্য নাকি একজনই বলিয়া থাকেন। তিনি অর্ধশিক্ষিত একজন গ্রাম্যপণ্ডিত। আমার পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয়! তবু এসময়ে আর রাগারাগি করিলাম না, বলিলাম—কী?

—মায়ের বুকের দুধের চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য নেই। সন্তানের কাছে তাই অমৃত।

—ঠিকই বলেন তিনি—যদি মা সুস্থ থাকে!

—আমার কিছু অসুখ নেই।

কী জবাব দিব! চুপ করিয়া থাকি।

হঠাৎ অনুরাধা সুর বদলায়। বলে—আচ্ছা তুমি কী বলত! আমার কাছে আসতে চাও না, তাই আমার একটা মনগড়া অসুখের ছুতো দেখাও। আমাকে দেখতে পার না, তাই আমার চলন বেঁকা হয়েছে। বেশ তো, আমি আপত্তি করিনি, কিন্তু খোকনকে কেন সেজন্যে বঞ্চিত করছ? আর অসুস্থ অসুস্থ বলছ, আমার কষ্টটা তো দেখবে! ব্যথায় টন্‌টন্ করছে, অথচ খোকনকে তোমরা কাছে আসতে দেবে না।

এ কথায় বিচলিত হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করি ব্রেস্ট-পাম্পটা দিব কিনা।

অনুরাধা চাপা গর্জন করিয়া উঠে—না থাক্, চাইনা ওসব!

মিষ্টি করিয়া বলি—সত্যিই ব্যথায় টন্‌টন্ করছে।

—তবে কি আমি মিথ্যা কথা বলছি! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি—বেশ!

সহসা বেড সুইচটা জ্বলিয়া উঠে। সবুজ আলোর আবছায়ায় ঘরটা ভরিয়া যায়। বিকচ-উরসা, আলুলায়িত-কুন্তলা মেয়েটির চোখ সেই অস্ফুট আলোকেই জ্বলিতেছে দেখিলাম।

আমার সমস্ত শরীরে একটা শিহরন বহিয়া যায়! বাইরে একটা দমকা শীতল হাওয়া ওঠে। বেড সুইচটাও নিভিয়া যায়! সর্বাঙ্গে শীতল স্পর্শ।

* * * *

বাহিরের ঘড়িতে আড়াইটার সঙ্কেত। স্তব্ধ রাত্রের নৈঃশব্দ্যের উপর ঐ একটা ঘণ্টারই দীর্ঘস্থায়ী অনুরণন। বড় ঘড়িটা যেন ধিক্কার দিয়া উঠিল। সেও যেন মর্মাহত আমার ব্যবহারে। মধ্যরাত্রে পাঠনিরত অধ্যাপককে মাত্র আড়াই ঘণ্টা পূর্বে সে হাত যুক্ত করিয়া নমস্কার করিয়াছিল, এজন্য যেন এখন সে অনুতপ্ত। রক্তমাংসে গড়া এই সাধারণ মানুষটাকে ব্যঙ্গ করিতেই বুঝি এতক্ষণে ঢং করিয়া উঠিল।

তিন

আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসটা দেখছি সেখান থেকে সমস্ত দৃশ্যটা দৃষ্টিগোচর নয়। তাই অনেক কেন'র জবাব জানিনা আমি—জানা সম্ভব নয়। তবু ওঁদের দাম্পত্য-জীবন যে স্বাভাবিক পথে চলছে না—এটুকু আমিও বুঝতে পারি। আর আমি তো এ সংসারে তিন বছর আগে এসেছি—যারা পরে এসেছে, নীরজা অথবা বামুনদি—ওরাও এ সত্যটা উপলব্ধি করেছে। না করলেও অনুমান করেছে। মিল ওঁদের হয়নি—এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু কেন? নিঃসংশয় মানসিক গঠনের বৈষম্যই এর মূল কারণ। অধ্যাপক অবনীমোহন জ্ঞানমার্গের পথচারী। তিনি ধীর, গম্ভীর, অপ্রমত্ত। বিজ্ঞান একটা দুরতিক্রম্য বাতাবরণ রচনা করে রেখেছে তাঁর চারিধারে। তিনি নাস্তিক; বিজ্ঞানই তাঁর ধর্ম। ঈশ্বর তাঁর কাছে প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ; এই বিশ্বপ্রপঞ্চের গোপন কেন্দ্রলোকে স্পিনোজা-বর্ণিত কোনো সর্বশক্তিমান অজ্ঞেয় সত্তাকে তিনি মেনে নিতে রাজি নন। জীবনের গোপনতম আদি-রহস্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আইপীসে। সত্য তাঁর কাছে অস্বীকার্য—যতক্ষণ না 'ডিসেক্ট' করে আর স্লাইড তুলে তুলে তাকে যাচাই করে নেন বীক্ষণাগারে। সত্য যখন স্বীকৃত হয়—তখন দেখা যায় কেটে-কুটে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে জীবনের প্রাণচাঞ্চল্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন মৃত্যু-মন্দিরের গর্ভগৃহে। তিনি বলেন—জীববিজ্ঞান তাঁর ধ্যেয়; আমি মনে করি জীববিজ্ঞান নয়, মৃত্যুবিজ্ঞান!

অসংখ্য প্রাণীর জীবনস্পন্দন তাঁর কাছে স্বীকৃত—তারা আজ তাঁর বীক্ষণাগরে স্পিরিটের শিশিতে পেয়েছে সমাদরের স্থায়ী সিংহাসন। কাদম্বিনীর মতো তাদের মরে প্রমাণ দিতে হয়েছে যে, তারা বেঁচে ছিল। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে না দেখলে জীবনকে তিনি দেখতে পান না। ওদিকে বৌদি জীবনকে গ্রহণ করেছে তার পরিপূর্ণতায়। বিচার করেনি, বিশ্লেষণ করেনি, স্বীকার করেছে আনত মস্তকে। বুদ্ধি দিয়ে দাদা যা পেতে চাইছেন—তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে বৌদি তার বিশ্বাসের জোরে।

এরা ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। ওদের পথ আলাদা, লক্ষ্য আলাদা, যান বিভিন্ন, এমনকি পাথেয় পর্যন্ত এক দেশের মুদ্রা নয়। তবু ইচ্ছা থাকলে এই দুই ভিন্নমুখী ধারা মিলিত হতে পারত জীবনের এক পাদপীঠে। কজন স্বামী আর স্ত্রী মত আর পথ এক সুরে বাঁধা থাকে? তবু তারা ফিরে ফিরে আসে একই সঙ্গমে। দ্রুতছন্দ তবল্‌চি কোথায় যাবে বীণাকারকে পেছনে ফেলে? ফিরে তাকে আসতে হবেই তেহাই অতিক্রম করে, একই সমের মাথায়। মোটা চামড়াই হোক, আর সরু তারই হোক—তবলা আর বীণা যে একই রাগ-রূপের সন্ধানে অভিযাত্রী। দাদা আর বৌদির জীবনে আপাত-পার্থক্যটা এতদূর প্রসারিত যে, ভয় হয় কোথাও বুঝি ওঁরা হাত মেলাতে পারবেন না। কোনো অর্থ হয় না এ যুক্তির। এশিয়া আর আমেরিকা মহাদেশের মাঝখানে থাকুক না কেনও প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল বিস্তৃতি—রাতের আঁধারে ওরা চুপিচুপি হাত মেলাতে পারে বেরিং প্রণালীর সঙ্কীর্ণতায়। কিন্তু ওঁরা শুধু দূরেই সরে গেলেন, কাছে সরে আসেননি।

আমি একান্তভাবে দায়ী করি দাদাকেই—অধ্যাপক অবনীমোহনকেই।

কী প্রয়োজন ছিল তাঁর পল্লি-প্রান্তের সেই আশ্রম-মৃগীর প্রতি শরসন্ধানের? ব্রাহ্মণের অশিক্ষিতা অরক্ষণীয়া কুমারী কন্যাকে উদ্ধার করবার মহানুভবতা দেখাতে কেউ তো তাঁকে প্ররোচিত করেনি! বৌদি হ'চ্ছে কলসি। পদ্মনিধি থেকে শীতল জল ভরে এনে ঘরের কোণে রেখে দাও—সে সংসারের সকল তৃষ্ণাতুরকে তৃপ্ত করবে। সে মাটির ঘট। তার গায়ে আলপনার নকশা আঁক, মেটে ঘরের কুলুঙ্গিতে বসিয়ে দাও তাকে—মাথায় দাও একগোছা স্থলপদ্ম—দেখবে কী বাহার! এ সরল কথাটা দাদা বুঝলেন না। সস্তা বাহাদুরি দেখাতে তিনি ঐ মাটির পাত্রের ওপর চড়ালেন সোনালি রাঙতার মোড়ক—ওকে তাঁর সৌধশীর্ষের মঙ্গল-কলস করলেন। রৌদ্রে-জলে-ঝড়ে গৃহচূড়ার মঙ্গল-কলস ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, তার নকল রাঙতার মোড়ক পড়ছে খুলে, কিন্তু সে মুখ ফুটে আর্তনাদও করতে পারছে না। এত বড় সম্মানের আসনের অমর্যাদা হবে যে!

বৌদি এ জীবনে অনভ্যস্ত—ভুল না হওয়াটাই তার পক্ষে অস্বাভাবিক। কিন্তু দাদা কেন পারেন না সে ভুল মানিয়ে নিতে? রাধাবৌদিকে দেখেশুনেই বিয়ে করেছিলেন তিনি। বৌদির শিক্ষার অপূর্ণতা অথবা প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ পরিবারের সংস্কারের কথা তাঁর অজানা ছিল না। তাঁর ভাষায় বলতে পারি

এগুলি ছিল তাঁর প্রাকপরীক্ষার পূর্বস্বীকৃত অভ্যুপগম—হাইপথেটিক্যাল ডাটা। তাহলে হঠাৎ বীতকাম হয়ে উঠলেন কেন তিনি জীবনে? কী অধিকার ছিল তাঁর বৌদির জীবনটা এভাবে ব্যর্থ করে দেবার? নাকি রাধারানী বৌদি ওঁর খাঁচাবদ্ধ খরগোশ গিনিপিগের সমগোত্রীয় একটি জীব? একটি পরীক্ষা চলছিল বৌদিকে নিয়েও—পরীক্ষায় সুফল পাওয়া গেল না। অতএব রিজেক্টেড স্পেসিমেনটিও ফেলে দেবেন তিনি ল্যাবরেটরির লিটার বিনে?

তিন বছর আগে এসেছিলেম এ সংসারে। শৈশবে মাকে হারিয়েছি, বড় বোন নেই। রাধাবৌদির অকৃত্রিম স্নেহে অভিষিক্ত হয়েছে আমার জীবন। এ যে কত বড় পাওয়া তা যে পায়নি তাকে বোঝানো যাবে না, যে পেয়েছে তাকে বোঝাতে যাওয়া বাহুল্য। কী অদ্ভুত এই মানুষে-মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন! তিন বছর আগে ওকে চিনতেম না—অথচ আজ যেন সে আমার জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। রাধাবৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যখন ভাবি তখন অবাক হয়ে যাই। ওকে আমি মায়ের মত দেখি না, আমার চেয়ে ক'বছরেরই বা বড় ও! বড় বোনের সঙ্গে এ জাতীয় হাসিঠাট্টা চলে না। ও আমার বান্ধবীর পর্যায়ভুক্ত নয়—কারণ ওর আদেশ আমি মাতৃআজ্ঞার মত মেনে চলি। তাহলে রাধাবৌদি আমার কে? মাঝে মাঝে মনে হয়, ভারতবর্ষ বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে নর ও নারীর বিভিন্ন এবং বিচিত্র সম্পর্ক স্বীকৃতি পেয়েছে। য়ুরোপ একটিমাত্র সম্পর্ক জেনেই খুশি, আমরা নর ও নারীর সম্পর্ককে অত ক্ষুদ্রায়তনে সীমিত করিনি। য়ুরোপখণ্ডের কোনও ভদ্রলোক কি ভাবতে পারেন যে, কোনও উৎসবে তাঁর স্ত্রী তাঁর ভাইকে যেদিন আমন্ত্রণ করবেন সেদিন তিনি নিমন্ত্রণ রাখতে যাবেন বোনের বাড়ি এবং গিয়ে দেখবেন ভগ্নীপতি গেছেন তাঁর বোনের কাছে ভাইফোঁটা নিতে? ঐ একটি বিশেষ দিনে সে কারও স্বামী নয়—সে একজনের ভাই। জৈষ্ঠ্যের এক চিহ্নিত দিনে যেমন তার পরিচয়—স্বামী নয়, ভাই নয়, জামাতা। নীলের দিনে আবার সে শুধু মায়ের ছেলে!

এ সংসারে তেমনি আমার পরিচয় রাধাবৌদির দেওর! ওর দান শুধু অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছি এতদিন। প্রতিদান দিতে পারিনি! তাই ওর অপমানে মনে মনে জ্বলতে থাকি। অনাদৃত বৌদির অভিমানক্লিষ্ট মুখখানা দেখে রাগ হয় দাদার ওপর। কিন্তু কী করব? ওর যেখানে ব্যথা সেখানে বাইরে থেকে আমরা কেউ সান্ত্বনার চন্দন লেপন করতে পারব না। দীর্ঘদিন ধরে দূর থেকে লক্ষ্য করে আসছি ওদের বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবন। যেন কোন বিদ্রোহী দেবতার অনবধানতায় একটা সৌখিন চিনেমাটির ফুলদানি দু-টুকরো হয়ে গেছে। বাইরে থেকে খাঁজে খাঁজে ওদের জোর করে মেলাতে চাও? ওরা মিলবে না, ভেঙে পড়বে ভেতরের জোর না থাকায়। এ ধারণাটা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

তারপর হঠাৎ একদিন লক্ষ্য হল, যা জানতেম তা বুঝি সত্য নয়! আমার অনড় বিশ্বাসের পাহাড়ের তলায় হল অতর্কিত ভূকম্পন। স্পষ্ট অনুভব করলেম, ওদের অন্তরলোকের কোন অগোচরে গড়ে উঠেছে মিলনের সেতু। লুটিয়ে পড়া তরুলতা যেমন ধীরে ধীরে এসে জড়িয়ে ধরে জানলার গরাদ, তেমনি করে বৌদি এসে আঁকড়ে ধরলেন লৌহকঠিন অধ্যাপক স্বামীকে। দুই মহাদেশ যেন হাত মেলাল এক অদৃশ্য যোজকে। এটা কী করে সম্ভব হল, ভেবে কূলকিনারা করতে পারিনি। কিন্তু পরিবর্তনটা সূর্যোদয়ের মতো স্পষ্ট। ভাঙা ফুলদানির জোড়ার দাগ আর নজরে পড়ে না। দাদার বইয়ের আলমারির তালায় মরচে ধরে গেল। পড়ার ঘরে আর বসেনই না। তারপর কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! সন্ধ্যাবেলা দাদা পদব্রজে সস্ত্রীক সান্ধ্যভ্রমণে বার হলেন! একদিন নয়, পরপর কদিনই। ব্যাপার কী? বৌদি যেন শেলীর ভরতপক্ষী—পার্থিব দেনাপাওয়ার গণ্ডি ছাড়িয়ে সে যেন উঠে গেছে কোন ঊর্ধ্বলোকে, গান গাইতে গাইতে। ঠাট্টা করে একদিন বললেম : বৌদির যেন নতুন করে বিয়ে হল মনে হচ্ছে।

— আহা-হা!—রাঙিয়ে ওঠে রাধাবৌদি।

আমি ঘনিয়ে এসে বলি, কী ব্যাপার বল তো বৌদি? আমার দাদাটিকে এতদিন বই-পাগলা বলেই জানতেম—বই নিয়ে তাঁকে মাতামাতি করতে দেখেছি—সেটা অভ্যস্ত; কিন্তু ইদানীং সন্ধির কোন সূত্র অনুযায়ী হ্রস্ব-ইকারের স্থলে হ্রস্ব-উকার প্রয়োগ হল?

বৌদি এত ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না, বলে কী বলছ, স্পষ্ট করে বল।

— বুঝলে না? বই-পাগলা হঠাৎ বৌ-পাগলা হয়ে উঠল কেমন করে? রবিবার দশটার মধ্যে

খাওয়া-দাওয়া মেটানো তো আইনভুক্ত নয় এ সংসারে। এগারোটার মধ্যে শয়ন-কক্ষে অর্গল? অনর্গল এত কী ইয়ে চর্চা চলে তোমাদের?

কপট ক্রোধে বৌদি ধমক দেয়, দাঁড়াও, তোমার অসভ্যতা ঘোচাচ্ছি। তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড় তা খেয়াল আছে? এক-আধ নয়, চার বছরের বড়।

— তাতে কী? আমি কি মিছে কথা বলছি নাকি?

— মিথ্যে-সত্যি বোঝাপড়া ক'র তোমার দাদার সঙ্গে। আজ কলেজ থেকে ফিরে এলেই বলে দেব সব কথা!

আমি আতঙ্কিত হবার অভিনয় করি, দোহাই বৌদি! আমি তাহলে বাড়ি ছেড়ে পালাব!

আমার ভয়তরাসে মুখখানা দেখে খিলখিল করে হেসে ওঠে ও।

কারণটা জানা গেল অনতিবিলম্বে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেম। এই তাহলে ওদের বিড়ম্বিত জীবনের গূঢ় রহস্য? না হবেই বা কেন? আজ সাত-আট বছর ঘর করছেন ওঁরা—অথচ সে ঘর কলমুখরিত হয়নি কোন শিশুর কাকলিতে। একবার নাকি এসেও ফিরে গেছে। এবার দাদাকে খুব ব্যস্ত মনে হল। সপ্তাহে সপ্তাহে ডাক্তার দেখানো, প্রত্যহ বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। বুঝলেম নিজের ভুল, চীনেমাটির ফুলদানিটা আসলে ভাঙেনি কোনও দিনই। ফুল ছিল না ঘরে—তাই অনাদৃত পড়ে ছিল ওটা, ঘরের কোণে ধুলো বালির মধ্যে।

বৌদি ফিরে এল হাসপাতাল থেকে—কোথায় ভাবলেম, এবার নিবিড়তর হবে ওদের মিলন—হল তার বিপরীত। আবার সব গুলিয়ে গেল আমার। কোন দূর দিগন্তে দুর্যোগের ঘন মেঘ কখন অতর্কিতে ঘনিয়ে উঠল জানতেও পারলাম না। শুধু লক্ষ্য করে দেখলেম, এক রবিবারে দাদা তেল দিয়ে মরচেধরা আলমারির তালাগুলো খোলবার চেষ্টা করছেন। তাঁর অঙ্গে পুনর্বার উঠল বিজ্ঞানের নির্মোক। বৌদি নির্বাসিত হল আবার শয়নকক্ষের অশোকবনে।

বিরোধ শুধু হল সামান্য একটা অজুহাতে। ধাত্রীটিকে নিয়ে। সেটিকে বিতাড়নের ব্যবস্থা হল। আমাদের যৌথ যুক্তির গঙ্গাস্রোতে ভেসে গেলো দাদার আপত্তির ঐরাবত।

কিন্তু যা আশা করেছিলাম তা হল না। মিলল না আর ওদের হাত, কাজে কিম্বা খেলায়। বিপরীত পথযাত্রী দুটি জাহাজকে যেমন মনে হয় মিলনের অধীর আগ্রহে ছুটে আসছে পরস্পরের দিকে, তারপর কাছাকাছি এসে তারা পাশাপাশি পাশ কাটায়—আর ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে;—ওঁরা তেমনি করলেন। অকূল সংসার সমুদ্রে এত কাছাকাছি এসে ওঁরা পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন—বিপরীত মুখে। বিদেহী দেবতার এ কী বিচিত্র লীলা!

সেদিন সকালবেলা আমি আর দাদা একসঙ্গে খেতে বসেছি। আমাদের আহার-পর্বটা আপাতত বৌদির শয়নকক্ষে। এখানে খাওয়া-দাওয়াটা সারলে তবু গৃহকর্ত্রী একটু দেখাশোনা করতে পারেন। ঘরে টেবিল আছে, সেখানে বসে খেলে হাঙ্গামাটা কমে; কিন্তু রাধাবৌদির ব্যবস্থাপনায় অনাচারের বাষ্পমাত্র অনুপ্রবেশ করতে পারে না। তাই মাটিতে জল ছিটিয়ে ঠাঁই করেছে নীরজা, বামুনদি রেখে গেছেন দুথালা ভাত। পাশাপাশি আমরা দু'ভাই খেতে বসেছি। বৌদি বসে আছে সামনে মাটিতেই খোকনকে কোলে নিয়ে। বিজলি পাখাটা ঘুরছে মাথার ওপর—তবু বৌদির হাতে অকারণে একখানি তালপাতার পাখা। অকারণ আমাদের তরফে—বোধকরি বৌদির তরফে নয়।

বৌদি বলে, ভাবছিলাম মনুকে একখানা চিঠি লিখে দিই। চলে আসুক এখানে।

দাদা মুখ তুলে প্রশ্ন করেন: মনু কে?

— মনামী। মনে নেই তোমার?

— ও হ্যাঁ। তোমার যেন কী রকম বোন হয়। বিয়ের সময় দেখছি।

— পরেও দেখেছ তাকে। সুনুর বিয়েতে এসেছিল।

— তা হবে! মনে নেই। তা হঠাৎ তাকে চিঠি লেখার মানে?

— অনেক দিনই আনব আনব মনে করেছি, হয়ে ওঠেনি। এখন তো ওর কলেজের ছুটি হল, কিছুদিন এসে ঘুরে যাক্ না।

— কলেজে পড়ে বুঝি?

— হ্যাঁ, কলকাতায় একটা বোর্ডিং-এ থেকে।

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, বেশ, তা লিখে দাও।

দাদা না চিনলেও আমি চিনেছি মেয়েটিকে। এর অনেক কথা অনেক প্রসঙ্গে শুনতে হয়েছে আমাকে বৌদির কাছে। মেয়েটির একটি আলেখ্যই আঁকা হয়ে আছে আমার মনের ক্যানভাসে। সে ছবি ম্লান হবার উপায় নেই। সুযোগ আর সুবিধা পেলেই কিছুদিন পর পর বৌদি বসে যায় ইজেল-ব্রাশ নিয়ে পোর্ট্রেটটাকে মেরামত করতে। নিজের জীবনে বৌদি যা কিছু পায়নি—তাই সে অসঙ্কোচে আরোপ করে এই বোনটির ওপর। বুদ্ধিতে এমন মেয়ে নাকি হয় না। বৌদির সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা অবশ্য নেই। ওর বাবার একজন বড় যজমানের মেয়ে। সম্পর্কটা রক্তের নয়—রাগের, অনুরাগের। মনু ছেলেবেলা থেকেই পিতৃমাতৃহীনা। বৌদিকে ডাকত দিদি বলে। এখন সে সাবালিকা, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী। কলকাতায় থেকে পড়ে। কতবার কত প্রসঙ্গে এই মেয়েটির রূপগুণের সুখ্যাতি শুনতে হয়েছে বিস্তারিত। ঠাট্টা করে বলেছি : তুমি যা বলছ বৌদি, তাতে তো তাঁর নাম হওয়া উচিত ছিল মেনকা, রম্ভা, অথবা তিলোত্তমা। এমন বিদঘুটে নাম হল কেন তাঁর?

— ও যখন হয়, তখন ভবেশকাকা বিলেতে। তিনিই ফিরে এসে ঐ নাম রাখেন।

আমি বলি, তা রাখুন, কিন্তু বিলাতি নামেই মেয়ে কিছু মেমসাহেব হয়ে উঠবে না।

বৌদি চোখ বড় বড় করে বলে, তাই ওঠে ঠাকুরপো। নেহাত শাড়ি পরে থাকে বলে ওকে বাঙালি বলে চেনা যায়। না হ'লে—

আমি বলি, থাক্ থাক্।

— তুমি দেখনি, তাই বিশ্বাস করছ না। দেখলে বুঝতে।

তারপর মুখ টিপে হেসে বলে, তোমার মতো ছেলেকে মুখে লাগাম দিয়ে চরিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে।

আমি আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ভান করি। বলি, বানান করে বল বৌদি, কী বলছ, চরিয়ে না চড়িয়ে?

বৌদি খিলখিল করে হেসে বলে, দুই-ই। রূপ দেখে যখন মাথা ঘুরে যাবে, তখন চড় না চালালে ঠিক মতো চরানো যাবে কী করে?

আমি হেসে বলি, থাক বৌদি, সুন্দরী মেয়েতে কাজ নেই আমার। ওরা সব পটের বিবি—দেওয়ালে অথবা আলমারিতেই ওদের মানায় ভালো। আমার ঘরে যে আসবে সে যেন তোমার মত শান্ত লক্ষ্মীশ্রী নিয়েই আসে। তীব্র বিলিতি সেন্টের চেয়ে কালাগুরুর গন্ধই আমার ভালো লাগে বেশি।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় বৌদি। ঠাট্টার বাষ্পটুকু পর্যন্ত অন্তর্হিত হয় নিমেষে; বলে: ও বাহাদুরিটা নাইবা দেখালে ঠাকুরপো! গরিব-ঘরের সাধারণ ছেলেদের ওপর ও ভারটা থাক না। তোমরা, রাজপুত্রেরা, আর হাততালি নাইবা কুড়োলে ঘুঁটে-কুড়ুনির মেয়ে ঘরে এনে।

জবাব দিতে পারিনি। বুঝি, অনবধানতায় আঘাত করে বসেছি ওর বেদনতন্ত্রীতে।

কদিন পরে কলেজ যাওয়ার সময় বৌদি আমায় ডাকে : আমার একটা উপকার করবে ঠাকুরপো?

আমি এগিয়ে আসি : এভাবে প্রশ্ন করার মানে?

— তোমার ছুটি কটায়?

— রোজ যা হয়, চারটে দশে।

— শেষ ঘণ্টাটা কামাই করতে পার না?

— পারি, যদি তুমি হুকুম কর। কেন, কী করতে হবে?

— আজ সাড়ে চারটের লোকালে মনু আসবে। ওঁকে স্টেশানে পাঠাব যে ভবেছিলাম; কিন্তু ওঁর বুঝি কী কাজ আছে বিকালে। তুমি যেতে পারবে? মনু অবশ্য চালাক মেয়ে—নিজেই হয়ত খোঁজ করে চলে আসতে পারবে। তবু আমাদের কারও স্টেশানে যাওয়া উচিত; নয়?

একটু ইতস্তত করে বলি, কিন্তু তোমার বোনকে আমি চিনব কী করে?

বৌদি মুখ টিপে হেসে বলে : চারটের লোকালে কি একগাড়ি মেনকা-রম্ভা নামবে বলে আশঙ্কা হয় তোমার?

— তার মানে?

— কথাটা তুমিই বলেছিলে একদিন। অনেকদিন অবশ্য দেখিনি মনুকে। এখন দেখতে কেমন হয়েছে জানি না। তবে রম্ভা কাঁচাই হোক আর পাকাই হোক, নজরে তোমার পড়বেই। টিপে না দেখলেও বুঝতে পারবে মনে হয়।

আমি রাগ করে কী একটা কথা বলতে যাই। হঠাৎ বৌদি আমার হাত দুটি ধরে বলে, রাগ করনা ভাইটি। তোমার সঙ্গে যে আমার ঠাট্টার সম্পর্ক।

— হোক, তাই বলে একজন বাইরের ভদ্রমহিলাকে নিয়ে—

— সে আমারই তো বোন। তা কী করব বল ভাই, সেই ঠান্‌দিদের আমলের মানুষ। আমার ঠাট্টা-তামাসাগুলো একটু সেকেলে তো হবেই। এজন্যে তুমি তোমার দাদার মতো যেন আমাকে ঘেন্না কোরো না—

ব্যথিত হয়ে বলি, এমন করে বোলোনা বৌদি, ছিঃ!

হঠাৎ আমার ভাবান্তরে বৌদিও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেয় কথাটা : তাছাড়া মেয়েদের কামরা থেকে একা মেয়েছেলে নামবে—সে তুমি দেখলেই চিনতে পারবে।

অগত্যা রাজি হয়ে যাই।

— দেখ, যদি কলেজ কামাই করলে কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে না হয় থাক।

— না অসুবিধা আর কী। ঠিক আছে।

বৌদি মুখ টিপে হাসে আবার।

— হাসছ যে?

— ওমা, কই হাসলাম?

— না, তুমি হেসেছ।

— আর একদিনের কথা মনে পড়ে গেল আমার।

— কোনদিন?

— অনেকদিন আগেকার কথা। মনে আছে তোমার? মনসাতলায় দিয়াশিনী মায়ের ভর হয়। সেখানে নিয়ে যেতে বলেছিলাম তোমাকে, তুমি রাজি হওনি। পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে।

বললাম, দেখ বৌদি, তুমি যা ভাবছ তা নয়। মনসাতলায় তোমাকে নিয়ে যেতে চাইনি অন্য কারণে। দাদা এসব পছন্দ করেন না।

— জানি ঠাকুরপো! কিন্তু আমি যা কিছু পছন্দ করি—তোমার দাদা তো তাই অপছন্দ করেন। আমার ইচ্ছে বলে কি কিছুই থাকবে না?

— কেন থাকবে না? এই যে তুমি তোমার বোনকে আনতে চাইলে—দাদা তো এককথায় রাজি হ'য়ে গেলেন।

বৌদি ম্লান হাসে : কেন রাজি হয়েছেন জানো? ওঁর সেই মহাভারত লেখার সুবিধা হবে বলে। কলেজ ছুটি হ'লেই তুমি বাড়ি যাবে, এখন একা বাড়িতে আমার সময় কাটতে চাইবে না—হয়ত সারাদিন বিরক্ত করতে চাইব ওঁকে। তাই আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে মনুর আসায় ওঁর আপত্তি নেই, আগ্রহ আছে। যত ভাবো তোমার দাদা গোবেচারি লাজুক, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

আমি হেসে প্রতিবাদ করি : এতো মজা মন্দ নয়। দাদা গররাজি হলে তখন বলতে তোমার কোনো ইচ্ছাই মেনে নেন না তিনি।

— সব কথা তোমাকে যে বলা যায় না ঠাকুরপো।

চুপ করে যাই, তারপর বলি : তবে আনছ কেন তোমার বোনকে?

— কী করব? সময় তো কাটাতে হবে। যে লোক ভালোবাসে না তার কাছে যাওয়ার যে কী বিড়ম্বনা....

হঠাৎ থেমে যায় বৌদি। আমিও অপ্রস্তুত। এজাতীয় খোলাখুলি কথা বৌদি কখনও বলে না! হঠাৎ সামলে নিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে, ওমা সওয়া দশটা বেজে গেছে; যাও যাও, তোমার দেরি হয়ে যাবে!

*　　*　　*

সাইকেল রিক্সাটা স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করার আগেই এসেছে ট্রেনটা। মানুষজন সার বেঁধে বেরিয়ে আসছে প্ল্যাটফর্ম থেকে। বিব্রত বোধ করি। আর একটু আগে আসা উচিত ছিল। এখন বৌদির বোনকে খুঁজে বার করা মুশকিল। লেডিজ কামরা থেকে একা মেয়ে কে নেমেছে তা আর জানতে পারা যাবে না! স্টেশনবাসটার গলায় ফার্স্ট গিয়ারটা আটকে গেছে, ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠছে। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে কণ্ডাক্টর হাঁকছে—জজকোর্ট—হাইস্ট্রীট—কদমতলা—

জনবহুল স্টেশন চত্বরটার চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নিজেকে আরও অসহায় মনে হল। অল্পবয়সি মেয়ে অবশ্য নজরে পড়েছে অনেক! গায়ে গায়ে লেগে মানুষ চলেছে। সাইকেল-রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ি অথবা বাসে উঠছে। কেউ রওনা দিচ্ছে পায়ে হেঁটেই। কে একা এসেছে, কে সঙ্গীর সাথে চলেছে বোঝা দুষ্কর। আমার রিক্সাওয়ালার সাথে যাতায়াতের দরদাম করাই ছিল। তাকে অপেক্ষা করতে বলে চারদিক খামোখা একবার ঘুরে আসি। বৃথা চেষ্টা। ফিরে এসে রিক্সায় বসে বলি : নে চল্।

স্টেশন এলাকা থেকে বড় রাস্তায় পড়েই দেখি মোড়ের পুলিসের নির্দেশে দাঁড়িয়ে গেছে রিক্সার সারি! যেন একটা সরীসৃপ বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রিক্সা দাঁড়িয়েছে একের পিছে এক, একের পাশে আর এক। আমার ঠিক পাশেই এসে দাঁড়ালো একখানি ত্রিচক্রযান। বসে আছে একটি মেয়ে। আড়চোখে দেখেই চম্‌কে উঠলাম। এ নয় তো? বছর বিশেক বয়স। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। বাঙালি মেয়ের পক্ষে এতটা উগ্র ফর্সা রঙ যেন বিধাতার একটা বাড়াবাড়ি। বিকালের পড়ন্ত রোদটা ঠেকাতে একটা হাত রেখেছে চোখের ওপর আড়াল করে। যেন হাতির দাঁত কুঁদে বার করা হয়েছে হাতখানি। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখের পাশ দিয়ে কুণ্ডলায়িত একটা কুন্তলচূর্ণ অসোয়াস্তিকর ভাবে দুলছে; আধুনিকতার একটা সপ্রতিভ ছাঁদ ওর সর্বাঙ্গে। মেয়েটিও গ্রীবা হেলনে আমাকে লক্ষ্য করল যেন একবার। চোখাচোখি হল। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেম না। ওর ঠোঁটের কোণায় খেলে গেল একচিলতে চাপা হাসির বিদ্যুৎ। আমি তখন অন্য চিন্তায় বিভোর। এরকম একদৃষ্টে চেয়ে থাকার যে অন্য একটা অর্থও হতে পারে তা মনে ছিল না। হঠাৎ মেয়েটি লক্ষ্য করলে আমার হাতের বইখাতাগুলো—একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করে : আপনি কি এখানকার কলেজে পড়েন?

ওর চোখে-মুখে চাপা হাসিটা তখন লেগে আছে।

—হ্যাঁ, কেন?

—প্রফেসর রায়ের বাসাটা চেনেন? বাইওলজির—

কথাটা তার শেষ হয় না। আমি অস্ফুটে বলি : মনামী!

মেয়েটির মুখে বিস্ময়। অপরিচিত পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টিটা সম্ভবত তার সয়ে গেছে। কিন্তু নিজের নামটা এভাবে শোনা তার অভ্যাস নয় বোধকরি। ভ্রূ কুঁচকে ওঠে ওর। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। এসব লক্ষ্য করিনি সে সময়। পরে ঘটনাটার কথা যখন ভেবেছি, তখন মনে পড়েছে এসব।

ও বলে : আপনি আমাকে চেনেন বুঝতে পারছি। আমি আপনাকে চিনি না।

আমি কিছু বলার আগেই সামনে—পিছনে রিক্সার সারি একদল রাজহাঁসের মতো কলস্বরে ডেকে ওঠে—গতির নির্দেশ পেয়েছে ওরা!

আমার রিক্সাটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে নেমে আসি। বলি, প্রফেসর রায়ের ছোট ভাই আমি। আপনার সন্ধানেই স্টেশনে এসেছিলাম।

মনামীর কুঞ্চিত ভ্রূযুগল অবশ্য সরলায়িত হয় না। সম্মুখের দিকে চেয়ে ও নির্বিকারভাবে বলে, ও কিন্তু জামাইবাবুর কোন ভাই ছিল শুনিনি তো কখনও।

—সেটা জামাইবাবুর ভায়ের দুর্ভাগ্য। বৌদির যে বোন আছেন এটা টীকা-টিপ্পনী সমেত আমার জানা আছে বহুকাল।

—বুঝলাম। কিন্তু আপনি তো ইতিপূর্বে আমাকে কখনও দেখেননি, চিনতেন কী করে যে রিসিভ করতে এসেছেন?

—শুনেছিলাম, হাজার লোকের মধ্যেও আপনাকে খুঁজে নেওয়া যায়।

ওর ঠোঁটের কোণার সেই চিকচিক হাসিটা ফিরে আসে ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গেই মিলিয়ে যায় ভ্রূর কুঞ্চনরেখাটা। রুপালি পর্দায় যেন ফেড ঈন—ফেড আউট। দাঁত দিয়ে আবার ঠোঁটটা কামড়ে কী যেন ভাবতে থাকে। আমি বলি, দুখানা রিক্সার ভাড়া মিছিমিছি গুনে কী হবে। আপনি এটায় এসে বসুন। একসঙ্গে গল্প করতে করতে চলে যাই। থাক, থাক, আমিই ভাড়াটা মিটিয়ে দিচ্ছি ওকে।

মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি মনামী বলে : ধন্যবাদ। তার দরকার হবে না।

—আচ্ছা, না হয় বাড়ি গিয়ে হিসাবটা মিটিয়ে দেবেন আমাকে।

পকেট হাতড়ে একটা দোয়ানি বার করে ওর রিক্সাওয়ালার প্রসারিত করে অর্পণ করার উদ্যোগ করি। ও বুঝে নিয়েছিল সোওয়ারি তার সাথি পেয়েছে।

মনামী হঠাৎ রূঢ় কণ্ঠে ওর রিক্সাওয়ালাকে ধমকে ওঠে, থামলে কেন? চলো তুমি।

রিক্সাওয়ালা নিজেকে সামলে নেয়। আমিও। ও প্যাডলে চড়ে বসে বলে, কিন্তু কোনদিকে যাব তা তো বলবেন?

মেয়েটি আবার ধমকে ওঠে, ভাড়া করার সময় যে বললে তুমি খুঁজে নিতে পারবে?

অপমানটা নিরাবরণ। বুঝলাম, আধুনিকতার যে বিজ্ঞপ্তিটা আঁটা রয়েছে ওঁর সর্বাঙ্গে সেটা মজ্জার সঙ্গে মেশা নয়—সজ্জার মতোই আরোপিত। প্রগতি ওঁর রুজ-পাউডার-লিপস্টিকেই সীমিত। একা পথে বার হন বটে তবে অনাত্মীয়ের সঙ্গে এক রিক্সায় চড়লে এঁদের আজও জাত যায়। খুরওয়ালা জুতো খুটখুট করে একশ্রেণীর অতি-আধুনিক জীবকে আজকাল ঘুরতে দেখা যায় হকার্স কর্নারে আর মার্কেটে—যাঁদের কনুইয়ের গুঁতো থেকে আত্মরক্ষার্থে পথচারীরা স্বতই তৎপর—অথচ সত্যিকারের আধুনিকতার প্রমাণ দেবার ডাক এলে দেখা যায় যাঁদের সব ফুটানিই সঙ্কুচিত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ক্ষুদ্রায়তন হাত-বটুয়ায়—ইনি তাঁদেরই সমগোত্রীয়া। মনে মনে হাসি। রিক্সাওয়ালাকে বলি, কী হে, বলেছিলে একথা? বাড়ি খুঁজে নেবে?

রিক্সাওয়ালাও তিরিক্ষে মেজাজ দেখায়। দেখাবে না কেন? ধমকটা এবার তো আর বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে বর্ষিত হয়নি। বলে, বাড়ি তো বাবু খুঁজে নিতে পারি, কিন্তু কোন পাড়ায় যাবেন তা তো উনি বলবেন? গোটা টাউন তো ওঁকে টেনে টেনে দাবড়ে বেড়াতে পারি না!

ওর সওয়ারি গর্জে ওঠে, কোন পাড়ায় যাব, আর কোন বাড়িতে যাব দেখিয়ে দিলে খুঁজতে পার তুমি? খুব বাহাদুর তো?

আমি রিক্সাওয়ালাকেই উপদেশ দিই, শোন্, পুরুষমানুষ সওয়ারি তুললে জিজ্ঞাসা করিস, কোথায় যাবে। কোন পথে, কোন পাড়ায় যাবে। একা মেয়েছেলে দেখলে কখনো ও কথা জিজ্ঞাসা করবি না। মায় কার বাড়ি যেতে চায় তাও জানতে চাইবি না। মুখ দেখে বুঝে নিতে হবে। না হলে ওঁদের একা পথে বার হওয়ার বাহাদুরিটা ম্লান হয়ে যায়। বুঝলি?

রিক্সাওয়ালাটা যেন ডেন্টিস্টের কাছে এসেছে চিকিৎসা করাতে!

—আয় বাবা, আর ঝকমারি বাড়াসনে! আমার পিছু পিছু আয়!

আগুপিছু দুখানা রিক্সা চলতে থাকে আবার। এ আঘাত মেয়েটির স্বোপার্জিত। রঙটা কটা বলে পথচারীদের বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে অভ্যস্ত, হয়তো মনে করে দুনিয়ায় সব ছেলেই ওর সঙ্গে ভাব করতে চায়। ওর গা ঘেঁষে বসতে পেলে বুঝি পৃথিবীর তাবৎ হাপিত্যেস ছেলের দল মোক্ষলাভ করবে। ভুলটা তার ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ওকে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার, আজকের অর্থনৈতিক দুনিয়ায় পথ চলতে হ'লে প্রতিটি আধুলি কিভাবে বাঁচে তা আমাদের খেয়াল করতে হয়। পথের সাথি কে হল এ নিয়ে এ যুগের ছেলেদের মাথাব্যথা নেই। হোক্ সে সুন্দরী তন্বী, হোক না কেন পঙ্গু বৃদ্ধা। প্রমোদ ভ্রমণে লক্ষ্যটা থাকে উপলক্ষ্য, সেখানে সঙ্গী-সাথির সান্নিধ্যটাই বড় কথা। দুনিয়ার ওমনিবাসে আমরা যে আজকাল ঝুলতে ঝুলতে দশটা-পাঁচটা করছি, এখানে আমরা খেয়ালও করি না কে চলেছে আমার পাঁজর ঘেঁষে। পথ আমাদের দুর্গম। এ পথে চলতে আমাদের মেরুদণ্ড বেঁকে যাচ্ছে, ঝরঝর করে ঝরছে ঘাম। সেই স্বেদেই আবার পিচ্ছিল হচ্ছে পথ। এ পথে যদি একসাথে পা ফেলতে চাও তাহলে এগিয়ে এস। দৃঢ়মুঠিতে ধর আমাদের কঠিন কব্জি। আর তা যদি না পার, তবে পথে বেরিও না সোনামণি! আলতা পায়ে, সিঁদুর লেপ্‌টে, শাঁখা-নোয়া-ঘোমটা সমেত—ঐ তোমাদের ফুটানির হাত-

বটুয়া আঁকড়ে অপেক্ষা কর ঘরের কোণে। আমাদের একলা চলতে দাও, পথে নেমে পায়ে পায়ে জড়িয়ে জিব কেটো না। ভয় নেই, ফেলে পালাব না তোমাদের। সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর ওপার থেকে গজমতীর হার এনে যে ঘরের কোণের রাজকন্যার গলাতেই দোলাতে হয়—এ শিক্ষা ঠিকই পেয়েছি ছেলেবেলায়, মা-ঠাকুরমার কাছে। অতটা ক্ষমতায় কুলায় না বটে—তবে হাঁউ-মাউ-খাঁও করে বড়বাবুর হাত থেকে মাসকাবারি জীয়নকাঠিটা যখন ছিনিয়ে আনি তখন তোমাদের পায়েই ঢেলে দিই তা। দিই না? থাকো' তোমার ঘরের কোণেই। জার্মানির কারখানায়, চীন কিম্বা রাশিয়ার যৌথ-খামারে আর প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যেমন করে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছিল পুরুষের কাঁধে কাঁধ ঘষে, পার তো তেমনি করে এগিয়ে এস; আর তা যদি না পার, তবে সুস্থির হয়ে গিয়ে বস ঘরের কোণে—যেমন বসে থাকতেন তোমার মা, আমার ঠাকুরমা। হাত-বটুয়ার ভ্যানিটি আর খুরওয়ালা জুতোর এ্যাম্বিশান সম্বল 'উইমেন্‌স্ লিব্'-এর কপচানিটা বন্ধ থাক্!

—এই রোখ্‌কে।

পর পর দুখানি রিক্সা এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। পিছনের রিক্সাওয়ালাকে বলি, এই বাড়িই।

মেয়েটি ভাড়া মিটিয়ে সুটকেস হাতে গটগট করে চলে যায় ভিতরের দিকে। ভঙ্গিটা গট্‌গটের—আওয়াজটা যদিও খুটখুটের। আমি নামলেম কিনা ফিরেও দেখে না। ওর রিক্সাওয়ালা বলে, আর দুআনা?

ও ঘুরে দাঁড়ায়।

সত্যিই গর্ব করার মতো রূপ আছে মেয়েটির। মুখটা থমথম করছে এখনও। বলে, স্টেশনে যে তুমি বললে দশ আনা নেবে?

—তখন কি জান্তাম এ্যাদ্দুর আসতে হবে? বাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন না, কত রেট!

আমি ততক্ষণে এক টাকার একটা নোট আমার রিক্সাওয়ালার হাতে দিয়ে চলতে শুরু করেছি বাড়ির দিকে।

—ওই দেখুন উনি একটাকা দিলেন।

ও আবার দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। বটুয়া হাতড়াচ্ছে খুচরো পয়সার সন্ধানে। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা বিমূর্ত স্বগতোক্তি করি, ওকে আমি কলেজ থেকে স্টেশন ঘুরে আসার ভাড়া দিয়েছি আট আনা হিসাবে।

তারপর রিক্সাওয়ালাকে বলি, একা মেয়েছেলে পেয়ে দু-আনা ঠকিয়েছিস। আর ঠকাসনে বাবা। অধর্ম হবে। কেন জুলম করছিস?

মনামী ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে হাতটা টেনে নেয়। চলতে থাকে আবার। রিক্সাওয়ালা বলে, জুলুম কেন করব স্যার? এ তো চেয়ে নিচ্ছি, বক্‌শিস।

আমি বলি, সে কথা আলাদা।

মনামী আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। বটুয়া হাতড়ে বলে, আর পাবে না! ভাঙানি নেই—

আমি সেই দোয়ানিটা রিক্সাওয়ালার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলি, নে বাবা, তোরও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক!

উঠে যাই ওপরের ঘরে।

চার

কানটা ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। সামলে নিলুম। শোধ নেওয়া যাবে সুযোগমতো!

ব্যাগটা নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল রাধাদির সঙ্গে! কী রোগা হয়ে গেছে রাধাদি!

—ওমা, তুই এসে গেলি? একলা? ঠাকুরপো যায়নি স্টেশনে? ওমা, কী সুন্দর হয়েছিস তুই আজকাল। বাড়ি খুঁজে পেলি কী করে?

এতগুলো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমিও প্রতিপ্রশ্ন করি—জামাইবাবু কোথায়? তোমার বাচ্চা?

বাচ্চাটা ছিল ছোট একটা বেবি-কটে। তুলে নিলুম। সুন্দর ফুটফুটে। কে বলবে রাধাদির বাচ্চা!

—ওমা, কী চমৎকার হয়েছে! চিবুকটা ঠিক তোমার মতো।

রাধাদি বলে—একটু রোগা হয়ে গেছে।

বলি—উঃ, কতদিন পরে দেখা হ'ল।

ও হেসে বলে—তা বটে। 'গাঙে গাঙে দেখা হয় তো বোনে বোনে হয় না।'

হেসে বললুম—তোমার স্বভাবটা আজও বদলায়নি। ঠিক তেমনি ছড়া কাটো দেখি।

ঘরোয়া গল্পে দুজনে মেতে উঠি। একটু পরেই জামাইবাবু ফিরলেন।

বললুম, চিনতে পারেন?

—পারি, না পারার কারণ নেই।

—কে বলুন তো?

—নামটা যে বলতে পারব না।

—কেন? আমি কি আপনার ভাশুর?

—না, কিন্তু এম-এসসি পড়ার সময় সখ করে কিছুদিন ফ্রেঞ্চ শিখেছিলাম। তোমার নামটা বলতে ভয় পাই—পাছে ভুল বুঝে বস।

দুজনেই হেসে উঠি। রাধাদি বলে—কী ব্যাপার?

জামাইবাবু আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন—তোমার বোনকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ।

রাধাদি প্রশ্ন করে—কী রে?

কী বলব? এড়িয়ে গিয়ে বলি—সে তুমি বুঝবে না।

রাধাদি গম্ভীর হয়ে যায়। জামাইবাবু একটু গল্প করে উঠে যান জামাকাপড় ছাড়তে।

দুদিনেই লক্ষ্য করলুম সংসারের চাকায় জং ধরেছে। মসৃণতা নেই তার গতিচ্ছন্দে। দিদির মন নেই সংসারে। বাচ্চাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাছাড়া সব বিষয়েই কেমন আনমনা। উদাসীন। ঘরের এখানে-ওখানে ঝুল জমেছে। ময়লা পড়েছে। কেউ সাফ করায় না। জামাইবাবুর এসব খেয়াল নেই। কোন পুরুষমানুষেরই বা থাকে! সংসারের সঙ্গে তাঁর দু-তরফা সম্পর্ক। আহার ও নিদ্রা। বাকি সময়টুকু সংসার এবং তাঁর অক্ষিতারকার মাঝখানে থাকে একটা ব্যাফল-ওয়াল। ইট নয়, অক্ষর দিয়ে গাঁথা বিজ্ঞানের বই।

জঞ্জাল আমার ধাতে সয় না। ঘরদোর সাফ করলুম কদিন ধরে, ঝাড়লুম ঝুল। ফ্যানের ব্লেড সাফ করলুম সাবান দিয়ে। জানলাগুলোর পর্দা কিনে আনা গেল জামাইবাবুর সাহচর্যে! টাঙানো হল সেগুলি। ছবিগুলো একদিন ঝাড়ামোছা করা গেল। দিদির অবশ্য সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। দুর্বল। চেয়ে চেয়ে দেখলে আমার মালিন্য-বিদায়ের পালা—সপ্রশংস দৃষ্টিতে।

রবিবার। জামাইবাবু বললেন—আজ আমি বাজার করব। মাংস খাওয়া হয়নি অনেকদিন। মুখ বদলাতে চাই। মনু মাংস রাঁধতে জান?

আমি বললুম—মাংস আর একদিন হবে। আজ আপনার আলমারির বইগুলো রোদে দেব। একা হাতে পারব না। সাহায্য চাই।

উনি বলেন—বেশ তো, চল। হাতে হাতে বইগুলো নামিয়ে ফেলি।

গাছকোমর করে কাপড় সাঁটি। র‍্যাক থেকে উনি বই পাড়তে থাকেন। বিছিয়ে দিই সেগুলো রোদে।

রাধাদি এসে দাঁড়ায়, বলে—আমিও লেগে যাব নাকি তোমাদের সঙ্গে?

জামাইবাবু বাধা দিয়ে বলেন—থাক বাপু! তুমি আর ঐ শরীর নিয়ে এর মধ্যে এস না। সুবিমলকে বরং ডেকে দাও।

রাধাদি জবাব দেয় না। ডাকতে চলে যায়। কেউই ফিরে আসে না কিন্তু। আমরা দুজনেই নামিয়ে ফেলি বইগুলো শেষ পর্যন্ত। হঠাৎ জামাইবাবু বলেন—কই, সুবিমল তো এল না?

আমি নিরুত্তর। জানতুম ও আসবে না। ঈর্ষা, না অভিমান?

জামাইবাবু বলেন—তুমি তো কদিনেই ঘরদোরের চেহারাটা বেশ পালটে ফেলেছে। রুচিবোধ থাকলে সামান্য জিনিসেই কেমন ছিমছাম থাকা যায়। এই সেন্সটা তোমার দিদির নেই। নিজের দেহ থেকে শুরু করে কোনো কিছুই প্রপার অর্ডারে সাজিয়ে রাখার দিকে উৎসাহ নেই।

আমি দিদির পক্ষ নিয়ে বলি—করবে কোত্থেকে বলুন। ওই তো ওর স্বাস্থ্য। ঘরদোরের যত্ন সে নেবে কখন?

—কিন্তু স্বাস্থ্যও তো ভেঙেছে ঐ একই কারণে। শী ডাজন্ট কেয়ার ঈভন ফর হার হেল্‌থ।

—এটা আপনি অন্যায় বলছেন। আফটার অল শী এলোন কান্ট বি রেস্‌পন্সিবল ফর হার প্রেজেন্ট স্টেট অফ হেলথ্‌।

—শী এলোন ইজ্‌। সেইটেই তো সব চেয়ে দুঃখের কথা মনামী। তোমার দিদিকেই না হয় জিজ্ঞাসা করে দেখ।

এ কথার জবাব না দেওয়াই শোভন।

ওদের স্বামী-স্ত্রীর যে মিল হয়নি এটা বোঝা যায়। আমারও নজরে পড়ে সেটা। এরকমটা না দেখলেই অবাক হতুম। এটা কিন্তু জামাইবাবু অন্যায় বলেছেন। রাধাদির স্বাস্থ্য ভাঙার জন্য সে একা দায়ী হতে পারে না। মাতৃত্ব। সুতরাং অধ্যাপক অবনীমোহনও দায়ী।

সে যাই হোক, দিদির একটা বিরাট ত্রুটি আছে। অমার্জনীয় অপরাধ। জামাইবাবুর মন রাখবার একটুও চেষ্টা করে না। বোকামী। যত যাই বলি না কেন, পুরুষের ভালোবাসা কেড়ে নিতে হয় জোর করে। সে কী ভালোবাসে, কী পছন্দ করে এটাও জানতে হয়। নইলে কী দিয়ে বাঁধবে তাঁকে? হ্যাঁ, ঈশ্বরদত্ত সম্পদ যদি তোমার থাকে তো সে আলাদা। তোমাকে দেখেই যদি সে—'দেহি পদবল্লব' বলে লুটিয়ে পড়ে তবে অবশ্য তুমি যা ইচ্ছে করতে পার। কিন্তু রূপ তো সকলের নেই। তাই সামলে চলতে হয়। জামাইবাবু একটু ছিমছাম ভালোবাসে। দিদির পাউডারের কৌটোয় পাউডারও—দিদির ভাষায়—'বাড়ন্ত'! আজ না হয় তার শরীর ভেঙেছে—সুস্থ থাকলেও নাকি জামাইবাবুর সঙ্গে পথে বার হত না, ওঁর ছাত্ররা কী ভাববে! বাড়াবাড়ি। কী আবার ভাববে? ভাববে যে, অধ্যাপকমশাই সস্ত্রীক বেড়াতে বেরিয়েছেন। দুদিনের জামাইবাবুর অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিলুম আমি—আর আজ আট বছরেও দিদি তাঁকে চিনল না। নিজে থেকে তো বোঝেই না, ভালো করতে গেলেও কান দেবে না। সেদিন বললুম—চুলগুলো কী করে রেখেছ দিদি, হয় আমার মত ছেঁটে ফেল, নয় জট ছাড়িয়ে যত্ন নাও। এস বেঁধে দিই।

বললে—থাক ভাই। আমাকে বাদ দিয়েই তোমাদের সাজন-গোজন চলুক।

সত্যি দুঃখ হয় জামাইবাবুর জন্যে। অবশ্য দায়ী তিনি নিজেই। সম্পূর্ণ ভাবে। কী দরকার ছিল এই ফলস্‌ শ্যিভালরির? সোসাইটিতে কি মেয়ে ছিল না ওঁর আমলে? উনি জীবনকে দেখতে চান চার দেওয়ালের বাইরে। বৃহত্তর পটভূমিকায়। সেখানে দিদি এসে ওঁর পাশে দাঁড়াতে পারে না। দুধের স্বাদ উনি ঘোলে মেটান। আমাকে টেনে নিয়ে যান বেড়াতে। সিনেমায়। মার্কেটে অথবা জলসায়। আমি আপত্তি করি না। ভালোই লাগে নতুন সোসাইটিতে মিশতে। আরও একটা কারণে সেজেগুজে ওঁর সঙ্গে বেড়াতে ভালো লাগে। একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ জানলা দিয়ে লক্ষ্য করে আমাদের। মনে মনে হাসি;—অভিমান, না ঈর্ষা?

প্রথমদিন থেকেই ও এড়িয়ে চলেছে আমাকে। লোকটা অসভ্য। প্রথমদিনই ওকে চিনে নিয়েছি। প্যাটপ্যাট করে তাকিয়েছিল কেমন! ব্রুট! দুচক্ষে দেখতে পারি না এই হ্যাংলামি। এক লহমার আলাপে ও মনে করেছিল ওর পাশে বসব রিক্সায়। দুঃসাহস। ও এখন ভোল পালটেছে। ভুলেও আমার দিকে চোখ তুলে তাকায় না। এ চালও বুঝি আমি! অনেক ঘাটের জল খেয়েছি। ও এমন ভাব দেখায় যেন বাড়িতে যে একটা লোক বেড়েছে এটা ওর খেয়ালই নেই। খেয়াল যে তোমার আছে এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধিও আছে আমার ঘটে। তুমি নিজেই তো স্বীকার করেছ বাছা, 'হাজার লোকের মধ্যে সে কথা খেয়াল হয়।'

দিদি সেদিন প্রশ্ন করলে—ঠাকুরপোর সঙ্গে তোর কোনো আলাপ হয়নি?

বললুম—কেন হবে না? হয়েছে।

—তবে ওর সঙ্গে কথা বলিস না যে?

—বলব না কেন? তবে অহেতুক বকবক করার তো কোনও কারণ নেই। ভালো কথা, কলেজের তো ছুটি হয়ে গেছে। তোমার পাতানো দেওরটি বাড়ি যাচ্ছেন কবে?

—কেন, ওকে তাড়ালে তোর কী লাভ?

—না, তাড়াবার কথা হ'চ্ছে না। তবে লোক যত কমে সংসারটা ততই হালকা হয়। আমার ঝামেলা কমে। উনি অহেতুক এখানে মাটি কামড়ে কেন পড়ে আছেন তাই জিজ্ঞাসা করলুম।

দিদি হাসে। বলে,—হয়তো লোভনীয় কোনো কিছুর সন্ধান পেয়েছে এখানে। তাই বাড়ি যেতে মন সরছে না।

ঠোঁট বেঁকিয়ে বলি—সেইটে তাহলে বুঝিয়ে দিও তোমার দেওরকে। এখানে বিশেষ সুবিধা হবে না। এ বড়ই কঠিন ঠাঁই।

দিদি ওকে কিছু বলেছে কিনা বোঝা গেল না। লোকটা কিন্তু নড়বার নাম করে না। আমাকে যে অবজ্ঞা আর উপেক্ষা করে সেটা জানানোর জন্যে সর্বদাই ব্যগ্র। সেদিন বিকেলে দিদির সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ ও ঘরে ঢোকে। নিজের একটা বুশকোট দেখিয়ে বলে—বৌদি, এ বোতামগুলি তুমি লাগিয়ে দিয়েছ?

দিদি লক্ষ্য করে বলে—না তো? কেন?

ও হাসে। বলে—তবে বোধহয় ধোপানীই লাগিয়ে দিয়েছে। আর ধোপানী ছাড়া এমন রুচি হবে কার? সাদা বুশকোটে হলদে রঙের বোতাম!

হাতে ছিল একটা ব্লেড। পটপট করে বোতামগুলো কেটে রেখে দিল আমাদের দুজনের সামনে। হাসতে হাসতে চলে যায় নিজের ঘরে।

দিদি জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁরে, তুই লাগিয়ে দিয়েছিলি?

বলি—দায় পড়েছে ওর জামায় হাত দিতে।

ধোপাবাড়ি থেকে জামাকাপড়গুলো এলে ভাঙা বোতাম মেরামত করে রাখি। অবশ্য ওর জামাতে হাত দিতে ভারী গরজ আমার। এটাকে বোধহয় জামাইবাবুর জামা বলেই মনে হয়েছিল। কী জানি, মনে নেই। মনে নেইই বা কেন? নিশ্চয়ই তাই। না হলে ছুঁতেই ঘৃণা হত আমার। সমস্ত বাড়ি ঝাড়ামোছা করেছি—বাকি আছে একখানি মাত্র ঘর। ও ঘরখানাতে ঢুকিও না আমি।

কিন্তু ওর স্পর্ধা দিন দিন সীমাহীন হয়ে উঠেছে। নির্লজ্জতাও। সেদিন রাত্রে জামাইবাবু আর ও একসঙ্গে খেতে বসেছিল। দিদির ঘরেই। আমি পরিবেশন করছি। কথায় কথায় নারী-প্রগতির কথা উঠল। জামাইবাবুর সঙ্গে আমি প্রায়ই তর্ক করি। আক্রমণটা চলে পুরুষ জাতটার ওপর; লক্ষ্য করি তীরগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না! সম্পর্কটা মধুর হওয়ায় বেশ ঠেশ দিয়ে বলি জামাইবাবুকে। পার্শ্ববর্তী লোকটির গায়ে সেগুলি বেঁধে! ও কিন্তু ভুলেও একটা কথা বলে না। যেন ব্রহ্মচারীর আহার। কথা বলা বারণ। নীরবে আহার করে যায়। শেষ করে বলে—আমার হয়ে গেছে দাদা, উঠি! কী নাকেমুখে গুঁজে খায় লোকটা। আশ্চর্য!

সেদিন আলোচনাটা বেশ মুখরোচক হয়ে উঠেছিল। বিষয়টা ছিল মেয়েদের সমান অধিকার সম্পর্কে। নারী-প্রগতি। জামাইবাবু বলেন—কিন্তু সমান অধিকার তো তোমরা চাও না? অবস্থাবিশেষে তোমরা সমান অধিকার দাবি কর বটে, কিন্তু বেগতিক দেখলেই লেডিজ ফার্স্ট!

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললুম—লেডিজ ফার্স্ট কথাটা আমাদের নয় জামাইবাবু! ওটি পুরুষের উক্তি! কয়েক শতাব্দী আগে 'নাইটহুড শ্যিভালরি' বলে একটা জিনিস ছিল—সেটার মানে অবশ্য আপনারা বুঝবেন না আজকাল—অভিধানে দেখে নেবেন; সেই শ্যিভালরি বস্তুটাই আজকের পুরুষমানুষের বেলায় এসে ঠেকেছে ঐ লেডিজ ফার্স্ট ম্যাক্সিমে। ওটা আমাদের দাবি নয়—আপনাদের অযাচিত দাক্ষিণ্য!

জামাইবাবু হেসে বলেন—'নাইটহুড-শ্যিভালরি' শব্দটা চেনাচেনা লাগছে বটে। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, সে যুগের লেডি-ল্যাভেরা নাইটদের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করতেন না। তাঁরা ছিলেন অবলা সবলা; দস্তানা-খোলা নগ্ন পাঞ্জা দেখে তাঁরা মূর্ছা যেতেন! তোমরা তো তা মানো না।

—মানি নাই তো। কেন মানব? সব বিষয়েই আমরা পুরুষদের সমান হব।

—তাহলে ঐ লেডিজ ফার্স্ট ম্যাক্সিমটা শুধু 'অযাচিত' হয়ে থেমে আছে কেন, 'প্রত্যাখ্যাত' অথবা 'অগ্রাহ্য' বিশেষণে বিভূষিত হয় না কেন? সুযোগ পেলে নিতে তো ছাড়না দেখি।

—কেন ছাড়ব? ভগবান আপনাদের সবলতর করে গড়েছেন। শক্তি দিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন, দৈহিক ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাদের তা দেননি।

—দেননি নাকি? কী একচোখামি। আমি তো এত কথা জানতাম না।

আমি বলি, তর্কের মাঝখানে কৌতুক করে তারাই যারা কোণঠাসা হয়। হার যদি স্বীকার করতে লজ্জা পান, তাহলে না হয় আমিই থামি।

—না না, বল কী বলছিলে।

—বলছিলুম যে, দৈহিক ক্ষমতায় আমরা অপমানের সমান হতে পারি না! সেটা ঈশ্বরের বিধান নয়। আর সব বিষয়েই আমরা সমান হব। পাখির গান গাওয়ায় কৃতিত্ব নেই—সেটা ঈশ্বরের দান। আমাকে তিনি স্বর দিয়েছেন; আমি যদি গান গাই তবেই আমার কৃতিত্ব! লেডিজ ফার্স্টের সুযোগটা আমরা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পারি। সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু ভেবে দেখবেন, 'আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে, তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।' ওটুকু বাদ দিলে আপনাদেরই পৌরুষ হানি হয়—আমাদের হয় না।

লম্বা বক্তৃতায় ঘরটা থম্‌থম্ করত। সেটা ঘটতে দিল না সুবিমল। হঠাৎ বিষম খেয়ে বসল এই সময়। দিদি ছুটে আসে হাতপাখা হাতে। ওকে বাতাস করতে। সুবিমল সামলে নেয়। বলে থাক থাক বৌদি। তুমি অমন পাখা হাতে তেড়ে এস না। ভয় হয়, এও বুঝি মেয়েদের ব্যাকরণ-বহির্ভূত একরকমের পৌরুষ প্রকাশ।

দিদি থতমত। জামাইবাবুর হো-হো করা হাসি। তারপর হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ায় সামলে নেন। কথাটার মোড় ঘোরাতেই বোধ করি বলেন—আচ্ছা ধরা যাক ট্রামবাসের লেডিজ সিটের কথা। তুমি কি মনে কর মেয়েদের জন্য আলাদা সংরক্ষিত আসন থাকা উচিত?

আমার কান ঝাঁঝাঁ করছিল। সুবিমলের বিষম খাওয়াটা চালাকি, একটা অভিনয়। বুঝি সব। কিন্তু তর্ক করতে বসে চটতে নেই। ঠকতে হয় তাতে। গম্ভীর হয়ে বলি—হ্যাঁ, মনে করি।

—কেন? পৃথিবীর অন্য কোথাও তো মেয়েদের সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন হয় না। যতদূর মনে পড়ে দিল্লি-বোম্বাইতেও নেই। বাঙালি মেয়েদের বেলাতেই বা আইনের ঠেকা দিতে হবে কেন?

বিদ্রূপের হাসি হেসে বলি—একটু ভুল হল আপনার। আইনের ঠেকাটা বাঙালি মেয়েদের জন্য নয়।—বাঙালি ছেলেদের জন্য প্রয়োজন।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য শহরে পুরুষেরা বেশি শিক্ষিত, বেশি ভদ্র। মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে দেখলে তারা নিজেরাই আসন ছেড়ে দেয়। বসতে বলে। কথাটা হয়তো নতুন লাগবে আপনাদের,—ওরা একে বলে কার্টসি। এটিকেট। বাঙ্‌লাদেশের ছেলেরা ও বস্তুটা শেখেনি। তাই তাদের ভব্যতাজ্ঞানের অভাবের পরিপূরক ওই আইনের ঠেকা।

—কিন্তু তোমরা যে সমান অধিকার চাইছ সব ক্ষেত্রে। আমাদের সাথে গা ঘেঁসে দাঁড়াতেই বা পারবে না কেন? দুনিয়ার আর পাঁচটা জাতের মেয়েরা তো তা পারে।

—পারি আমরাও। পারছিও। তবে তফাতটা কোথায় জানেন। অসুবিধা হচ্ছে আমাদের গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ানোটা এদেশের ছেলেরা দুর্লভ সৌভাগ্য মনে করে বলে। স্টেট বাসগুলোর সামনের দরজাটা লেডিজ গেট বলে সেই গেটে লোক ঝুলতে ঝুলতে চলে। অথচ পিছনের গেটের কাছে বসার জায়গা হয়তো খালি আছে! ইংলন্ডে অথবা জার্মানিতে এ দৃশ্য আপনি দেখতে পাবেন না।

—তুমি কি মনে কর লেডিজ সিটের ব্যবস্থা উঠে গেলে আমাদের দেশের ছেলেরা মেয়েদের বসতে দেবে না।

—হ্যাঁ, তাই মনে করি। অনুমান নয়। এর প্রমাণ আছে। লেডিজ সিট ভর্তি হয়ে যাবার পরও যখন মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে তখন তো আপনারা ভদ্রতা দেখান না।

—দেখাই। আমি আসন ছেড়ে দিই তাঁদের। অনেকেই দেয়।

—আবার অনেকেই দেয় না। বেশির ভাগই দেয় না।

হঠাৎ ঘুরে জামাইবাবু সুবিমলকে প্রশ্ন করেন—তুমি কী কর?

সুবিমল চম্‌কে ওঠে—অ্যাঁ, আমি আপনাদের কথা ঠিক শুনছিলাম না। প্রশ্নটা কী?

বেশ বুঝতে পারি, আমাদের কথাই একমনে শুনছিল ও। ইচ্ছে করেই অন্যমনস্কতার ভান করছে। যেন এসব ছেলেমানুষি তর্কাতর্কিতে সে কানই দিচ্ছে না। জামাইবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন। ও বলে—এসব ক্ষেত্রে আপনার মতো হঠাৎ কলকাতা-আসা মফস্বলবাসী আর নিত্য দশটা-পাঁচটার অফিস যাত্রীরা মেয়েদের সঙ্গে একটু ভিন্ন আচরণ করেন।

জামাইবাবু বলেন—কে কী করেন তা তো জানতে চাইছি না। তুমি কী কর তাই বল।

—আমি? আমি এ রকম ক্ষেত্রে মহিলাটির জাত নির্ণয় করি। যদি দেখি মেমসাহেব তবে আসন ছেড়ে দিই—যদি দেখি বাঙালিনী তাহলে ছাড়ি না।

অবনক্সাস! এতক্ষণে ওর সেই বিষমখাওয়া বিকট হাসিটা আমার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়। জামাইবাবুকে বলি—ওঁর দোষ নেই, স্বাধীনতার পরেও অনেকের এজাতীয় ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স রয়ে গেছে।

সুবিমল একবার মুখ তুলে তাকায়। কী যেন বলতে চায়। তারপর এতবড় বক্রোক্তিটাও হজম করে। আহারে মন দেয়। দিদির আর সহ্য হয় না। এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল সে। হঠাৎ যোগ দেয়। বলে—তুমি বলছ কি ঠাকুরপো, মেয়েটি যদি বুড়ি হয় তবু বাঙালি বলেই তাকে বসতে দাও না?

—না দিই না।—নির্বিকার কণ্ঠে ও বলে।

—হেতুটা! প্রশ্নটা জামাইবাবুর।

—হেতুটা এই যে, বিদেশি ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েরা ট্রামে-বাসে ভ্রমণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। দ্বৈতআসনের আধখানা খালি থাকলে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষকে বসতে বলে। বাঙালি মেয়েরা তা বলে না। তাঁদের একজনকে বসতে দিলে দুজনকে দাঁড়াতে হবে। একবার এসপ্ল্যানেডের মোড়ে আমি একটি আধুনিকা বাঙালি মেয়েকে সিট ছেড়ে দিই। বাকি আধখানা আসন খালিই পড়ে থাকে। আমরা দুজনেই নামলাম হাজরার মোড়ে। একটা সিনেমা হাউসে ঢুকে পর পর টিকিট কেটে পাক্কা আড়াই ঘন্টা সিনেমা দেখলাম পাশাপাশি। আবার বাড়িও ফিরলাম এক বাসে। তাঁর দ্বৈত আসনের আধখানা খালি সিটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে। এ শুধু কলকাতা শহরেই সম্ভব।

জামাইবাবু বলেন—সেই মহিলাটিকে অবশ্য আমি সাপোর্ট করছি না, কিন্তু সব মেয়েই কিন্তু এরকম নয়।

ও হেসে বলে—সব বাঙালি মেয়েই এই রকম, এ আমি অনেক দেখেছি।

—তবু, কালীঘাটের স্টপেজ থেকে আধুলি মাপের সিঁদুরের টিপ এঁটে যে সব প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা মহিলা ট্রামে বাসে ওঠেন—

—না, তাঁদের জন্যও সিট ছাড়ি না আমি। পথে যখন বেরিয়েছেন তখন পথ চলার দায়িত্ব নিতে হবে; পুরুষমানুষের পাশে বসতে যদি তাঁর আজও সংস্কারে বাধে, তবে ট্যাক্সি অথবা রিক্সায় বাড়ি যান, নিদেন হেঁটেও যেতে পারেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মন থাকাটা অপরাধ নয়। কিন্তু ঐ মন নিয়ে বিংশ শতাব্দীর অবদান এই ট্রামে-বাসে চলার সুযোগ নেবার কোনও অধিকার নেই তাঁদের। তার ওপর আরও অন্যায় করেন তাঁরা, যাঁরা ঐ নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির মন নিয়ে ঘোরাফেরা করেন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির বেশভূষায়!

বুঝলাম, এ সবগুলিই আমার উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। সেই প্রথমদিনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কিন্তু ওর যুক্তি অকাট্য নয়। আমার তূণেও আছে এর চোখা চোখা জবাব। কিন্তু প্রত্যুত্তর করার আগেই ও রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে পড়ে।

কাওয়ার্ড!

পাঁচ

লৌহখণ্ড মাত্রেই চুম্বক। চৌম্বকবৃত্তি প্রতি লৌহখণ্ডের ভিতর আছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চুম্বক কণিকা ছোট ছোট কুণ্ডলীতে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করে। তাই বাহির হইতে প্রতি লৌহখণ্ডই যে চুম্বক এ সত্য বুঝা যায় না। বিশেষ প্রণালীতে সেই আত্মসন্তুষ্ট কুণ্ডলীগুলিকে একমুখী করিতে হয়, তখন তাহার ভিতর আকর্ষণী শক্তি দেখা দেয়। লৌহখণ্ড চুম্বকে রূপান্তরিত হয়।

মানুষ মাত্রেই চুম্বকখণ্ড। তাহার চৌম্বকবৃত্তিও সামান্য লৌহখণ্ডের মত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বিশেষ বয়সে, বিশেষ পরিবেশে সেই আত্মসন্তুষ্ট মানুষের মনে আকর্ষণী শক্তি জাগিয়া উঠে। তাহার দৃষ্টি, শ্রবণ, মনন একমুখী হইয়া যায়—নিকটবর্তী লৌহখণ্ডকে তখন সে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে। সন্নিকটবর্তী লৌহখণ্ডের প্রতি রোমকূপেও জাগিয়া উঠে অনুরূপ আকর্ষণী শক্তি।

মনামী এবং সুমিবমলের অবস্থাও আজ ঐরূপ। দুর্ভাগ্যবশত কোন বিদেহী দেবতার অভিশাপে উহারা পরস্পরের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। ফলে আকর্ষণের পরিবর্তে উহাদের অন্তরে জাগিয়াছে বিকর্ষণী শক্তি—'রিপালশন্'।

মনু মেয়েটি প্রাণচাঞ্চলা, শতাব্দীর পঞ্চমাংশ যে আনমনে পায়ে পায়ে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে তাহা সে নিজেই জানে না। হাসিতে খুশিতে সে যেন সর্বদাই উচ্ছল। মেয়েদের এই রূপটি আমি ভালোবাসি। নদী যেখানে হ্রদের রূপ ধরিয়াছে সেখানে আপাতদৃষ্টিতে তাহার শান্ত স্বচ্ছ রূপ মনোহর করে বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির বুঝিতে বাকি থাকে না যে, তাহার তলদেশে শুধুই পাঁক, শুধুই ক্লেদাক্ত দাম। যেখানে সে স্রোতস্বিনীর মতো উপলখণ্ডের উপর নূপুরের আঘাত হানিয়া ছুটিয়া চলে সেখানে তাহার অঙ্গে মালিন্য লাগিতে পারে না।

মনু বেড়াইতে ভালোবাসে। দোকানে দরদস্তুর করিয়া সওদা করায় তাহার শখ। প্রায় প্রত্যহই আমাকে লইয়া বাহির হয়। একাও যাইতে পারে, কিন্তু কলেজের পর সন্ধ্যাটা আমিই বা কী করি? দুইজনে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াই। প্রতিদিনই কিছু না কিছু কিনিয়া আনি। বালিশ-ঢাকা, টেবিল-ক্লথ, প্রসাধনের সাজ-সরঞ্জাম।

অনু আরও গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। বেশ বুঝিতেছি, মনুর প্রতি আমার এই বিশেষ পক্ষপাতিত্বটা সে সহ্য করিতে পারিতেছে না। না পারাই স্বাভাবিক। নিজের সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সচেতন, মনুর সৌন্দর্যটাও কিছু চোখে না পড়িবার মতো নহে। অনু নিশ্চয় 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি' পড়ে নাই, তবু গত শতাব্দীর সন্দেহবাতিক সংস্কার তাহার মজ্জায় মজ্জায় জড়িত। তাই, এই যে মনুর সহিত হাসি গল্প করিতেছি, তাহাকে সঙ্গে করিয়া সান্ধ্য-ভ্রমণে যাইতেছি, আমার বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের সারাংশ লইয়া আলোচনা করিতেছি—এগুলি সে সহ্য করিতে পারে না। তাহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইতেছে। হউক;—আমিও তাহাই চাই। সে বুঝিতে শিখুক প্রাক্‌বিবাহযুগের পৈতৃক অন্ধ-সংস্কারকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে আমাকে হারাইবার সম্ভাবনা আছে। আমার পাশটিতে আসিয়া স্থান দখল করিতে হইলে সংস্কারকে ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে! হয় কেক্‌টিকে খাও, নয় তুলিয়া রাখ। খাইলে রাখা যায় না, রাখিলে খাওয়া যায় না। মনামী এ সংসারে দুদিনের অতিথি, দুদিন পরে চলিয়া যাইবে। এ সংসারে তাহার কোন শাশ্বত ভূমিকা নাই। কিন্তু এই একটি দৃশ্যের অভিনয়েই সে দর্শক-মনে স্থায়ী চিহ্ন আঁকিয়া যাক। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রাখিয়া যাক আধুনিকা নারীর একটি সুন্দর উদাহরণ। নিজের চেষ্টায় অনুকে আধুনিকা হইতে হইবে। লক্ষ্য করিতেছি, মনুকে সে আজকাল আর সহ্য করিতে পারে না। ওর ধারণা—এই মেয়েটি আসিয়াই আমার মনে ভাঙন ধরাইয়া দিয়াছে। ভুল বুঝুক ক্ষতি নাই। এ ভুল সহজেই ভাঙিতে পারিব; কিন্তু এই সূত্রে সে বুঝিয়া রাখুক যে, ঘরের কোণে পানীয় জল সংরক্ষিত না থাকিলে তৃষ্ণার্ত মানুষ ঝরনাতলায় উচ্ছল পাত্রের সন্ধানে বাহির হইবেই।

আমি তো অনুর নিকট আকাশকুসুম দাবি করি নাই। যেখানে সে অপূর্ণ সেখানে সাধ্যমত পূর্ণতা আনিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাকে আমি পার্টিতে লইয়া যাইতে চাহি নাই, নাইট ক্লাবের পরিবেশে তাহাকে লইয়া যাইতে চাহি না; কিন্তু আমার কোনো সহকর্মী বন্ধুর সম্মুখে চায়ের কাপটা নামাইয়া রাখিয়া যুক্তকরে নমস্কার করা কি এতই কঠিন? তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে চাহিয়াছিলাম সে রাজি

হয় নাই। কোনোদিনই আমার পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইতে চাহে নাই। আমার পায়ের তলায় আসন সংগ্রহ করাই ছিল তাহার চরম লক্ষ্য। কিন্তু জীবনসঙ্গিনীকে আমি তো চরণের শৃঙ্খলরূপে পাইতে চাহি না।

অনুরাধা আমাকে ভালোবাসে—তীব্রভাবে ভালোবাসে। কিন্তু ভালোবাসা কি অপরের চোখে নিজেকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু? তুমি আমাকে ভালোবাস, তাই আমার চোখের সম্মুখে তুমি ফুল লইয়া ফুটিতে চাও, আকাশে রামধনুর মতো উঠিতে চাও। কিন্তু অনুরাধা তাহা চাহে নাই। রূপে যাহারা ভুলাইতে চাহে না, তাহাদেরও অন্যদিকে পরিশ্রম করিতে হয়—হাত দিয়া যদি দ্বার না খুলিতে চাও খুলিও না—অন্তত গান গাহিয়া সে দ্বার খুলিতে হইবে। অনুরাধার হয়তো বিশ্বাস—গান গাহিবার প্রয়োজন নাই—দ্বার আপনিই খুলিবে! মন্ত্রপাঠ করিয়াছি না? এক সঙ্গে সপ্তপদ চলিয়াছি না? কালো কোকিল যদি বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিতে পারিত তাহা হইলে হয়তো সৃষ্টিকর্তা তাহাকে ঐ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরটি দিতেন না। এই হইতেছে অনুর থিওরি।

তাহা ভিন্ন সেই আদিম সমস্যাটিকে উপেক্ষা করার উপায় নাই। তাহার সহিত সকল ব্যবধান যখন তিল তিল করিয়া মিলাইয়া আসে—আমাদের বিবাদ কলহের অবসানে যখন স্তব্ধ রাত্রির সঙ্গোপনে আমরা সন্ধির প্রস্তাব মানিয়া লই—তখনই সেই আদিম সমস্যাটা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। অনুর দৈহিক নিরাপত্তার জন্য আমাকে উঠিয়া পড়িতে হয়—যাহাকে কাছে টানিবার জন্য দুই বাহু প্রসারিত করি তাহাকেই শেষে জোর করিয়া দূরে ঠেলিয়া দেই। অনু কাঁদিতে শুরু করে, আমি লাইব্রেরি ঘরে উঠিয়া যাই। এক-আধ রাত্রি নহে—এ নাটকের শততম রজনী কবে যে নিঃশব্দে অভিনীত হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা কেহই জানি না। এ সমস্যার হাত হইতে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কিন্তু অনুরাধা সে কথায় কর্ণপাত করে না। ধর্মের এক অদ্ভুত বিকৃত ব্যাখ্যায় জীবনকে সে জটিলতর করিতেছে। ওকে বুঝাইয়াছি, বই পড়িয়া শুনাইয়াছি, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছি—কোনও ফল হয় নাই।

শেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম খোকন হওয়ার মাসখানেক আগে।

ঐসময় অনুকে নিবিড় করিয়া পাইয়াছিলাম। সকল বাধা-বন্ধন দূর হইয়াছিল। তাহাকে তখন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে আর কোন বাধা ছিল না। সাবধান হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাটা ঘটিয়াছে, এখন কয়েক মাস সাবধানতার প্রশ্নই ওঠে না। তাই গল্প করিতে করিতে আমাকে হঠাৎ উঠিয়া যাইতে হয় না। দাম্পত্য-কলহ যেন স্বপ্নকথা হইয়া উঠিল। অনু অবশ্য কার্য-কারণের সন্ধান করে নাই। আমি যে তাহাকে দূরে ঠেলিতেছি না—আমি যে তাহার সহিত একত্রে হাসিতেছি, গল্প করিতেছি, রাত্রে একই শয্যায় শুইতেছি ইহাতেই সে সন্তুষ্ট। 'এফেক্ট' লইয়াই তাহার কারবার, 'কজ'-এর সন্ধান সে করে না।

মনে আছে, সেই সময় একদিন সন্ধ্যাবেলায় অনুকে লইয়া গিয়াছিলাম আনন্দময়ীতলায়। স্থানীয় ভূতপূর্ব রাজার পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবীপ্রতিমা। দেবীমন্দিরে ইতিপূর্বে কখনও যাই নাই। সেদিন গিয়াছিলাম। অনু পূজা দিল। পুরোহিতের নির্দেশে দুইজনে যুগলপ্রণাম করিলাম। আশীর্বাদী ফুল অঞ্চলে বাঁধিয়া যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন সে খুশিয়াল, আনন্দে অধীর।

বাড়িতে আসিয়া অনু বলে—তুমি হঠাৎ এমন বদলে গেলে যে?

আমি বিস্মিত হইয়া বলি—বদলে গেলাম! মানে?

আমার কোলে মাথা রাখিয়া ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়ে। আমার আঙুল নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলে—তুমি বুঝতে পার না। আমি তো বুঝি। তুমি একেবারে বদলে গেছ। সবদিক থেকে। আগে আমাকে দূরে দূরে ঠেলতে, এখন একেবারে নয়নের মণি হয়ে গেছি। আগে ঠাকুর-দেবতা একেবারেই মানতে না—আমার লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদটা পর্যন্ত খেতে চাইতে না; আজ নিজে থেকে আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে গেলে—

আমি হাসিয়া বলি—তোমার যা ভালো লাগে আমাকে তা করতে হবে বইকি। তেমনি আমিও যা চাই তা তোমাকে পারতে হবে।

আমার চিবুকে একটু নাড়া দিয়া খুশিয়াল অনু বলে—এ ছেলে বাঁচলে বাঁচি! বেশ, এখন আমার একটা হুকুম শোন দেখি, লক্ষ্মী ছেলের মতো। ওদিকে ফিরে বস। আমি বেড়াতে যাবার কাপড়টা ছেড়ে ফেলি।

আমি ভালোমানুষের মতো পিছন ফিরিয়া বসিলাম। অনু গলার হারটা খুলিয়া আলমারিতে রাখে। আলনা হইতে সাধারণ একখানা মিলের শাড়ি লইয়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। আবার সাবধান করিয়া দেয় আমাকে—এদিকে চাইবে না কিন্তু!

হাসি পায়। অনু আবার ছেলেমানুষ হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের ঊষাযুগে যে সকল ছেলেমানুষি মানাইত, আজ দীর্ঘ আট বৎসর পরে সেগুলি যে অত্যন্ত বেমানান, এ বোধও বোধকরি ওর নাই। না হইলে বারে বারে আমাকে এভাবে সাবধান করিবার অর্থ কী? কপট ক্রোধ, মান-অভিমান, ছদ্ম-তাড়না—সবই ফিরিয়া আসিতেছে তাহার স্বভাবে। প্রথম প্রথম অনুরাধা ছিল অত্যন্ত লাজুক। ওর লজ্জা ভাঙিতেই অনেকদিন লাগিয়াছিল। বিবাহের পূর্বেই সে আমার সাথে কথা বলিয়াছিল; অথচ আশ্চর্য, ফুলশয্যার রাত্রে সে আমার চোখে চোখ রাখিয়া কথা পর্যন্ত বলিতে পারে নাই। শুধু সেই একরাত্রিই নহে, আজও তাহার লজ্জা যেন সম্পূর্ণ ভাঙে নাই। বাতাস উঠিলে যেমন লজ্জাবতীর পাতাগুলি চকিতে মুদ্রিত হইয়া যায়—আজও মধ্যরাত্রে বেড্‌সুইচ জ্বালিলে সে চাদরের তলায় তেমনি আত্মগোপন করে।

রাত্রে আমার বুকে মুখ লুকাইয়া আশ্লেষশয়না অনু বলে—তুমি ভারি অসভ্য! কেন পেছনে ফিরলে তখন?

আমি বললাম—এটাই যে মেয়েদের আসল রূপ!

—কোনটা?

—আসন্ন মাতৃত্বের রূপ!

—যাও! ভারি অসভ্য তুমি।

—জীবনরহস্যের আদি সত্য নগ্ন—সেটাকে সমাজ একান্ত করে রাখে; তাই সে অসভ্য। অসভ্য, কিন্তু অসত্য নয়!

জানি, এ সকল গুরুগম্ভীর কথা ও বুঝিতে পারে না। তবু আচ্ছন্নের মতো শুনিয়া যায়। অভিভূত হয়। ওর ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদামের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে বলি—তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব, দেবে?

আমার এই কাতর কণ্ঠস্বরে অনু চমকিয়া ওঠে। আমার আনত মস্তক টানিয়া লয়। কবোষ্ণ সিক্ত স্পর্শ অনুভব করি ওষ্ঠপুটে। অনু কানে কানে বলে—কী না দেওয়া আছে বল তোমাকে? কী কেড়ে নিতে বাকি রেখেছ? এতদিন তুমি হাত বাড়িয়ে নাওনি তাই—আমার দেওয়ার ইচ্ছা তো কম ছিল না।

—কথা দাও, যা চাইব দেবে?

—না, আগে তুমি বল।

—না, আগে কথা দিতে হবে।

অনু মিটিমিটি হাসিতেছে। এ যেন এক মজার খেলা। গুরুগম্ভীর বাক্যবিন্যাস নয়, এ খেলায় ও যোগ দিতে পারিতেছে। কী চাহিতে পারি আন্দাজ করিতেছে। সহসা একটা কথা আমার মনে পড়িল। হঠাৎ অনুভব করিলাম, অন্যায় করিতেছি। অনুকে সত্যে আবদ্ধ করিয়া বাধ্য করিতেছি। এ-ও তো অত্যাচারের নামান্তর। স্নেহের অত্যাচার! অনুর নিকট যাহা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি তাহা নারীর এক অপূর্ব সম্পদ। প্রকৃতিদত্ত ধন। একবার হারাইলে তাহা আর ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই। কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মতো এ সম্পদ কাড়িয়াই লইতে পারি—প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতা আমার সাধ্যাতীত। বিজ্ঞান অপূর্ব; কিন্তু বিজ্ঞান অপূর্ণ! যে দ্রব্য দান করিতে পারি না তাহা গ্রহণ করিবার কী অধিকার আছে আমার?

—আমি আগে কথা না দিলে বলবে না? বেশ তাহলে—

আমি বাধা দিয়া বলি—আচ্ছা থাক।

—কী হল?

—না; আগেই কথা দিতে হবে না। আমি কী চাইছি, তা বলছি! কেন চাইছি তা-ও বুঝিয়ে দেব। তুমি কথাটা চিন্তা করে দেখ, বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী যদি রাজি হও ভালো—না হও জোর করব না।

—বেশ বল।

—তোমাকে আগেই বলেছি যে, তোমার শরীর স্বাভাবিক নয়। পেল্‌ভিক গার্ডল বলে একটা হাড়

আছে তোমার মাজার কাছে—

বাধা দিয়ে অনু বলে—ওসব বাজে কথা বাদ দাও। কাজের কথা কী আছে বল।

আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই আমার সহধর্মিণী!

কী আমার ধর্ম?

বিজ্ঞানের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা। অজ্ঞেয়কে জানা। প্রাক্‌বিশ্বাসের সহজ পথে নহে—'নেতি নেতি' করিয়া বিচার মার্গে। জীববিজ্ঞান আমার ধ্যেয়। জীবকোষের আদিম রহস্যলোক হইতে যাত্রা করিয়াছি প্রাণময় চৈতন্য গঙ্গোত্রীর উৎস সন্ধানে। কঠিন সে মানস-তীর্থের যাত্রাপথ।

আর আমার সহধর্মিণী? যে এই যাত্রাপথে আমাকে অনুপ্রেরণা দিবে, সেই সখী, সচিব।

সহযাত্রিণী? সে বিশ্বাসই করে না এ ধর্মমঙ্গল!

—কই বললে না!

—হ্যাঁ বলি। তোমাকে অনেকদিন আগেই বলেছি যে তোমার শরীর—। অনু উঠিয়া বসে; রুদ্ধস্বরে বলে—হ্যাঁ, শুধু অনেকদিন আগেই নয়, চিরদিন বলছ। এইমাত্র একবার বলেছ। কেন মনে কর, ভুলে গেছি আমি? ভুলিনি, ভুলবার উপায় নেই। নিত্যি ত্রিশদিন আয়নায় নিজেকে দেখতে পাই। তাই তো অতবড় একটা আয়না এনে টাঙিয়ে রেখেছ ঘরে। আমি কি বুঝিনা? আমার শরীর যে অপ্সরীর মতো নয়, তা আমি জানি। তুমি দিনে পাঁচবার করে মনে না করিয়ে দিলেও জানি! তোমার আগেও অনেকে এ কথা আমাকে বলেছে। এক-আধজন নয়, এক-আধবার নয়, বুঝলে? এগারোবার।

শেষদিকে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়।

স্তম্ভিত হইয়া যাই। কী কথার কী প্রতিক্রিয়া! শুধু শিক্ষার অভাব! সত্যকে গ্রহণ করিতে পারার শিক্ষা থাকা চাই। ভাষাজ্ঞান না থাকিলে বাক্যের বিকৃত অর্থ হইবেই। শরীর শব্দের অর্থ গাত্রচর্মের ঔজ্জ্বল্য নহে, মুখের সুষমা আর কবরীর দৈর্ঘ্য নহে। অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংসের সমষ্টি এই দেহসৌধ। এ সৌধের কোনো খিলানে ফাটল ধরিলে, কোনো দেওয়ালের বুনিয়াদ বসিয়া গেলে গৃহকর্তার অধোবদন হইবার কোনো কারণ নাই। যে বাস্তুকার ডিজাইন করিয়াছে, যে তত্ত্বাবধায়ক পর্যবেক্ষণ করিয়াছে, যে মিস্ত্রি গাঁথিয়াছে—লজ্জা পাইতে হয় তাহারাই পাইবে! উপমাটা যদি আরও প্রসারিত করা যায় তবে বলিব—গৃহকর্তার কর্তব্য ত্রুটি ধরা পড়িবার পরেই শুরু হইল! সুসময়ে যদি মেরামতের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করেন তিনি, তাহা হইলেই তাঁহার অপরাধ। অনুর পেল্‌ভিক-গার্ডেলের মাপ ছোট, সে অপরাধ কাহার? অনুর নহে নিশ্চয়। তাহার মনে বাসনা-কামনা দিতে ভুল হয় নাই, তাহার হৃদয়ে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ সুধারস সঞ্চারে ত্রুটি হয় নাই—শুধু ভুল হইল পেল্‌ভিক-গার্ডেনের মাপে? পাঁচতলা বাড়িতে সিঁড়িই ব্যবস্থা নাই। নাই তো নাই। স্থানাভাব না থাকিলে এখন সিঁড়িঘর গাঁথিয়া তোল; সে ব্যবস্থা অসম্ভব হইলে দ্বিতল-ত্রিতলের স্বপ্ন ভুলিয়া যাও। একতলাতেই স্থান সঙ্কুলানের বিকল্প ব্যবস্থা কর। কিন্তু সে কথা কে বুঝিবে?

অনু ততক্ষণে বালিশে মুখ লুকাইয়াছে—কে বলেছিল তোমাকে দয়া করতে? আমি তো এ স্বর্গসুখ চাইনি! যাদের শরীর ভালো তাদের কাউকে বিয়ে করলেই পারতে? এখন আর দুঃখ করে কী হবে? 'সেধে-পেড়ে ভাব, আর মেজে-ঘষে রূপ',—ও তো আর হবার নয়!

আমি উঠিবার উপক্রম করি, বলি—আমার অন্যায় হয়েছে। আর ও কথা বলব না। তুমি ঘুমোও।

অনু আমার হাত চাপিয়া ধরে, বলে—কী হল? উঠছ কেন? বলবে না?

—বলতে আর দিলে কই? তোমার দেহের অভ্যন্তরে একটা অস্থির গঠনে ত্রুটি আছে। এটা ধ্রুব সত্য। ফলে আর পাঁচজন মেয়ের মতো সহজে তোমার মা হওয়ার পথে প্রচণ্ড বাধা। এটা তোমার অপরাধ নয়, তবু সেকথা বললে যদি তোমার রাগ হয়— তবে না হয় তা বলব না।

—আচ্ছা বল, আমি আর কাঁদব না।

—না, থাক এখন।

—না, তোমার পায়ে পড়ি, বল।

অগত্যা বলিতে হয়। অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হয়। বিষয়বস্তুটা যে কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে বোঝা সহজ। অল্প কথাতেই শেষ হইয়া যায়; কিন্তু আমাকে অতি ঘুরপথে অগ্রসর হইতে হয়। রূপকের

সাহায্যে আসল বক্তব্য ঘুরাইয়া বলিতে হয়। অনুর আঙ্গিক ত্রুটি ঔষধে সারিবার নহে। সুতরাং মাতৃত্ব তাহার পক্ষে বিপদজনক। সে মা হইতে চলিয়াছে। এবার বিপদের ঝুঁকি লইতেই হইবে। প্রথম হইতেই সেই জন্য যাবতীয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি। অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়া তাহাকে নিয়মিত পরীক্ষা করাইতেছি! সিজারিয়ান অপারেশন করার ব্যবস্থা দিয়াছেন শল্য-চিকিৎসক। ওর ওই স্বাস্থ্যে বারে বারে সে ঝুঁকি লওয়া চলে না। এ বিপদের হাত হইতে চির-পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এমন ব্যবস্থা করা যাহাতে আর সন্তান না আসে। এই কারণে অস্ত্রোপচার আইনসম্মত এবং বাঞ্ছনীয়। সেই পরামর্শই দিয়াছেন চিকিৎসক। আর্থিক সঙ্গতির প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া শূন্য উদর যেমন আপন বুভুক্ষার কথা জানান দেয়, তেমনি অস্থির এই ত্রুটির সহিত কোনো সম্পর্ক না রাখিয়া মানবের জৈবিক প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিবেই। দুইটি একান্তবাসী নরনারীর পক্ষে প্রকৃতির এ অমোঘ দাবিকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। দেহের দ্বারে সেই আদিম প্রবৃত্তি অহরহ আসিয়া হাঁক দিবে—অয়ম্ অহং ভো। হয় তৎক্ষণাৎ উগ্র সন্ন্যাসীকে মুষ্টি ভরিয়া ভিক্ষা দিয়া বিদায় কর—না হইলে শাপগ্রস্ত তোমার আর মুক্তি নাই। বিকৃতি দেখা দিবে জীবনে। সে বিকার কখনও দেখা দিবে মনে, কখনও দেহে। রোগাক্রান্ত হয় মানুষ, অনিদ্রা, জ্বর—কখনও বা মূর্ছারোগ। এমন-কি উন্মাদ হইয়া যায় শাপগ্রস্ত মানুষ!

অনু সাগ্রহে শুনিতে থাকে। এত আগ্রহ করিয়া সে আমার বক্তৃতা কখনও শোনে না। হয়তো বিকালে দেবীর মন্দিরে যে অভিনয় করিয়াছি তাহাতেই সে অভিভূত হইয়া আছে। হয়তো আজ তাহাকে রাজি করাইতে পারিব। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পথ নাই; কিন্তু এভাবে যুক্তিমার্গে তাহা হইবার নহে। তাহাকে স্বমতে আনিতে হইলে তাহার বোধগম্য ভাষায় অগ্রসর হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে নহে।

অনু বলে—আমাকে কী করতে বল?

তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক অদ্ভুত মনগড়া কাহিনির জাল বুনিয়া চলি। বলিলাম—ছেলেবেলায় কাকার সঙ্গে একবার যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম, বুঝলে। সব কথা মনে নেই, গল্পটা মনে আছে, শোন। কোনো এক চম্পাইনগরে না উজানি গাঁয়ে বাস করত নাগারি বিষবদ্যি। মনসাবিদ্বেষী চাঁদ সদাগরের সে বুঝি ছিল প্রধান চেলা। সে ছিল সাপের রোজা। শিবের ভক্ত ছিল নাগারি, বলত—বাবা আমার নীলকণ্ঠ, আমি তাঁর পূজা করি; সাপের বিষে নাগারির কোনো ক্ষতি হত না। নাগরাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। এ বড় লজ্জার কথা। নাগারি রোজা হয়ে সকলের বিষ ঝেড়ে দেয়, অথচ সে নাগদেবী মনসার পুজো করে না! সাপেরা সবাই দল বেঁধে মনসার কাছে দরবার করতে গেল। মনসা তো শুনে রেগে আগুন। কী, এত বড় স্পর্ধা! তিনি নাগরাজ তক্ষককে বললেন—যাও, দংশন কর নাগারির শিশুপুত্রকে। তক্ষক মাথা হেঁট করলেন, বললেন—'মা, তা হবার নয়। শিবের বরে নাগারি সাপের বিষকে জয় করেছে!' এত বড় লজ্জার কথা। শোধ না নিলে মান থাকে না মনসার। কিছুতেই যখন কিছু হল না তখন মনসাদেবী এলেন মহাদেবের দরবারে। ....ভোলো মহেশ্বর তখন ভাঙের নেশায় বিভোর। বললেন—'এ আর বেশি কথা কি? নাগারি লোকটা আমার খুব ভক্ত, আমার কথা ঠেলবে না। যাও মনসা, তুমি তাকে আমার নাম করে বল যে, আমি তাকে বলেছি তোমাকে পুজো করতে।'

মনসা তো তাই চান। নাচতে নাচতে তিনি এসে হাজির হলেন নাগারির বাড়িতে। বিষবদ্যি তখন ষোড়শোপচারে মহাদেবের পূজার আয়োজন করে আসনে বসতে যাচ্ছে। মনসা বললেন—'ওগো বদ্যি, আজ আর মহাদেবের নয়—আমাকে পুজো করবে।'

সব কথা শুনে ক্ষোভে লজ্জায় বিষবদ্যি প্রায় পাগল হয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই—ইষ্ট-আদেশ! মহাদেব ভিন্ন অন্য কাউকে পূজা দেবে না বলে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা বুঝি আর রাখা যায় না!

মনসা বলেন—'কই গো বদ্যি, অর্ঘ্য দাও!'

দুঃখে ক্ষোভে বাঁ হাতে খড়্গখানা তুলে নিয়ে নাগারি ডান হাতের কব্জিতে করলে প্রচণ্ড আঘাত। কাটা হাতখানা ঠিকরে গিয়ে পড়ল গৌরীপটে। নাগারি বলে—'দেখতেই পাচ্ছ ঠাকুরুন, আমার ডান হাত নেই! বাঁ হাতের অশ্রদ্ধার অর্ঘ্য নেবার রুচি যদি এখনও থাকে তবে সামনে এসে দাঁড়াও। আমি ইষ্ট আদেশ পালন করি!'

অনু সাগ্রহে বলে, তারপর?

কেমন যেন নিজের কাছেই লজ্জা করিতেছে। এ কী মিথ্যার কুহক রচনা করিতেছি! সত্যাশ্রয়ী বৈজ্ঞানিকের এ কী ব্যবহার? অন্ধ বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা—এ দুইজনের যে অহি-নকুল সম্বন্ধ। আমার গল্পের নায়ক যেমন মহাদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গর্ব করিত, আমিও কি তথ্যাভিলাষী বৈজ্ঞানিক বলিয়া তেমনি নিজেকে পরিচিত করি না? লক্ষ্যই কি সব—পথ কি কিছুই নহে? তবে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য এ কোন পথে ছুটিয়াছি উন্মাদের মতো?

—কই বল?

—হ্যাঁ, বলি! হঠাৎ মহাদেবের নেশা ছুটে গেল। বললেন—'আমার গায়ে এত রক্ত কেন?' পার্বতী ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, 'হায় হায়, এতক্ষণে তোমার নেশা ছুটল। নাগারি ওদিকে কী কাণ্ড করে বসে আছে দেখগে!'

মহাদেব ষাঁড়ের পিঠে চড়ে এসে হাজির হলেন নাগারির বাড়ি, বলেন—'এ তুই কী করেছিস? আমার গায়ে রক্ত ছিটিয়েছিস!'

বিষবদ্যি বলে—'এ যে তোমারই আদেশ প্রভু! যে হাতে তোমার পুজো করেছি, সে হাতে তো আর কাউকে পুজো দিতে পারব না।'

মহাদেবের মাথা হেঁট হয়ে গেল! অনুতপ্ত হয়ে বলেন—'নেশার ঘোরে আমার ভুল হয়ে গেছে রে। আমারই দোষ। বেশ, তুই আমাকেই দে তোর অর্ঘ্য। বাঁ হাতেই দে! তাই হাত পেতে নেব আমি!'

নাগারি শিউরে ওঠে! লুটিয়ে পড়ে বাবার চরণে। চীৎকার করে ওঠে—'ও আদেশ কোরো না ঠাকুর! সে আমি পারব না। বাঁ হাতে তোমাকে অর্ঘ্য দেব!'

শিব আর কী করেন? একটু ভেবে বলেন—'বেশ, তোকে কিছু করতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি। আমি রইলাম তোর বেলগাছের তলার অনাদিলিঙ্গ বিগ্রহে। তোকে দিতে হবে না, আপনিই ঝরে পড়বে বেলপাতা আমার মাথায়। বাঁ-হাতে গঙ্গাজলও আনতে হবে না তোকে—গঙ্গা উজান বয়ে আসবে নিজেই তোর বাড়িতে। আর তোকে দেব সুরভী গাভী। দুইতে হবে না—তার দুধ আপনি ঝরে পড়বে আমার মাথায়।'

গল্পের উপসংহারে বলিলাম—বিষবদ্যির দ্বারে বাঁধা পড়লেন ভক্তের ভগবান।

অনু আমার কোঁচার খুটে চক্ষু মার্জনা করিয়া বলে—হঠাৎ এ গল্প আমাকে শোনালে কেন?

—বলছি। নাগারি বিষবদ্যি নিজের অঙ্গচ্ছেদ করেছিল দেবতার ত্রুটি শোধরাতে। তার নিজের কোনো দোষ ছিল না। দোষ ছিল দেবতার। নেশার ঘোরে অন্যায় আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। তাই অক্লেশে নাগারি তার একটি অঙ্গ বলি দিয়েছিল। তোমার দেহেও যে ত্রুটি আছে তার অপরাধ তোমার নয়, সেটা বিশ্বকর্মার ভুল; তোমাকেই শোধরাতে হবে নিজের একটি অঙ্গ বলি দিয়ে। তাহলে দেখবে মঙ্গলের দেবতা শিব বাঁধা পড়েছেন তোমার দোরে।

অবাক বিস্ময়ে অনু চাহিয়া থাকে।

এইবার রহস্যজাল ছিন্ন করিবার সময় আসিয়াছে। রূপক ছাড়িয়া বাস্তবে আসি। সব কথা বুঝাইয়া বলি। এইবার সন্তান প্রসবের সময় তাহার দেহের ভিতর একটি ক্ষুদ্র অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। সমস্তই হইবে অজ্ঞানাবস্থায়। সে জানিতেও পারিবে না। কিন্তু তাহাতেই সে নিরাপদ হইবে। তার অবশিষ্ট জীবন মিলনমধুর হইবার পথে আর কোন বাধা থাকিবে না। লাইব্রেরি ঘরে আমাকে ইজিচেয়ারে শুইয়া আর বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হইবে না। সন্তান-সম্ভাবনার আর ভয় থাকিবে না। ইহা ভিন্ন বাহ্যিক জীবনে আর কোনো পরিবর্তনই হইবে না তাহার।

অনু তীব্র আগ্রহ লইয়া সব কথা শুনিতেছিল। তাহার অন্তরে যে ঝড়ের নেপথ্য আয়োজন হইতেছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি থামিতেই উচ্ছ্বসিত রোদনে সে ভাঙিয়া পড়ে। আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া বলে—কেন, কী করেছি আমি! কেন এত বড় শাস্তি দিচ্ছ তুমি আমাকে? ওগো, তুমি তো নেশা-ভাঙ কর না! সকলেই স্বামীপুত্র নিয়ে ঘরসংসার করবে, কেবল আমিই পারব না!

ওর মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিই—বুঝাইয়া বলি সব কথা। সন্তান তো তাহার হইতেছে, হইবে। তাহার সন্তানকে যদি সুস্থ সবল এবং জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় তবেই এ অস্ত্রোপচার করা হইবে। নচেৎ নহে। একটি সন্তানের জননী না করিয়া তো আমি তাহাকে এ অনুরোধ করিতেছি না। তাহাকে

বলিয়া বুঝাই—আমি শুধু পুর্বেই অনুমতি চাহিয়া রাখিতেছি। তাহার অনাগত সন্তানকে স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া যাইবে না। উপর হইতে পেট কাটিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এ বিপদের ঝুঁকি তো বারেবারে লওয়া যায় না।

উচ্ছ্বসিত রোদনে ফুলিতে ফুলিতে অনু বলে—না, না, না। কালো হই, কুচ্ছিৎ হই—তবু আমি মেয়েমানুষ। তবু মা হতে যাচ্ছি আমি। রূপ নেই, গুণ নেই—কী দিয়ে তোমায় ধরে রাখব? হয়তো এইটুকু দিয়েই বেঁধে রাখতে পারব তোমাকে। সেই সম্বলটুকু তুমি জোর করে কেড়ে নিও না। জানি, আমাকে তুমি ভালোবাসতে পারনি; আর যা শাস্তি দাও আমি মাথা পেতে নেব, শুধু এ শাস্তি দিও না আমাকে! ওগো, দুটি পায়ে পড়ি তোমার!

সেই আমার শেষ চেষ্টা! তারপর আর ও চেষ্টা কখনও করি নাই!

ছয়

শরৎবাবু কোথায় যেন লিখেছিলেন—'হায় রে মানুষের মন। এ যে কিসে ভাঙে আর কিসে গড়ে তার কোন তত্ত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; অথচ এই মন লইয়া মানুষের অহঙ্কারের অবধি নাই। যাহাকে আয়ত্ত করা যায় না, যাহাকে চিনিতে পর্যন্ত পারা যায় না, কেমন করিয়া আমার বলিয়া তাহার মন যোগান যায়?'

কথাগুলো মনে পড়ে আমার নিজের কথা ভাবলে। আমার মনটাও যে ওরকম পাগলামি করে বসতে পারে, তা কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছি? এইসব এনামেলকরা অতি আধুনিক গায়ে-পড়া মেয়ে এতদিন ছিল আমার দুচক্ষের বিষ! আমি আকৈশোর যে নারীর স্বপ্ন দেখে এসেছি তার মধ্যে মদিরতা নেই, চকমকির ঠোকাঠুকি নেই, ছিল অচঞ্চল মাণিক্যের দীপ্তি। আমি যাকে স্বপ্ন দেখতেম, তার সিঁথিমূলে ভোরবেলাকার পুব আকাশের আভাস, তার মণিবন্ধে কুন্দশুভ্র শঙ্খবলয়। কট্‌কি শাড়ির লাল পাড় যার রাঙাচরণে আশ্রয় খোঁজে, আলতার রেখা যার পায়ে লোটায়, লজ্জায় লাল হয়ে যে মেয়ে দীপশিখার মতো জ্বলে—জ্বালায় না।

বৌদির বোনটিকে চিনতে আমার ভুল হয়নি। হাবে-ভাবে, আচারে-ব্যবহারে এ শুধু রাধাবৌদিরই নয়, আমার মানসী প্রতিমারও বিপরীত মেরুর বাসিন্দা! জোর করে মনকে সরিয়ে নিয়েছি ওর দিক থেকে। মেয়েটি অত্যন্ত আত্মসচেতন। সুন্দরী মেয়েরা হয় দুজাতের। একদল থাকে তাদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে অচেতন। তারা তাদের সৌন্দর্যের কথা জানতে পারে না যতদিন না বাইরে থেকে কেউ এসে নাড়া দেয়। আর একদল ডুবে থাকে আত্মসচেতনতার মধ্যেই। মনামী এই দ্বিতীয় জাতের সুন্দরী। নিজ রূপলাবণ্যের সম্বন্ধে তার সচেতনতা প্রায় ভব্যতার সীমা ছাড়াতে চায়। ও হচ্ছে ধানুকী জাতের মেয়ে, যারা সর্বদা চায় তাদের ঘিরে থাকুক একদল স্তাবক—তাদের ওরা কাছে টানে দূরে ঠেলবার আনন্দের সন্ধানে। মূর্খ স্তাবকদল আঘাত পায়, তবু ফিরে ফিরে আসে মুগ্ধ পতঙ্গের মতো জ্বলেপুড়ে মরতে। মনামী বোধহয় আশা করেছিল, আমি নাম লেখাব তাদের খাতায়। ও আমাকে চিনতে পারেনি। আমি তাই সচেতন হই, সাবধান হই। প্রথমদিনেই ওকে কঠিন আঘাত করেছি—আমি জানি, মার খেয়ে হজম করে যাবার মেয়ে ও নয়। সে সুযোগ খুঁজছে আমাকে ফিরে আঘাত করবে বলে। সে সুযোগ ওকে আমি দেব না। তাই এড়িয়ে চলি সুকৌশলে। এ জাতের রূপ-সচেতন মেয়ে—যাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাদের রূপের বেদীমূলে অর্ঘডালি ঢেলে দেবার জন্য সারা দুনিয়া প্রহর গুনছে রুদ্ধ নিশ্বাসে, তাদের সবচেয়ে বড় আঘাত করা হয়—যখন কেউ তাদের উপেক্ষা করে।

আমি ওকে দেখেও দেখতাম না।

ও ছটফট করতে থাকে। এ অবজ্ঞাই যে ভীষণ অপমান! তাই ভাব করবার জন্যে, আলাপ করবার উদ্দেশ্যে ও অনেকবারই এগিয়ে এসেছে। আমি অন্যমনস্কের মতো শুধু সরে গেছি উপেক্ষা করে।

আমার আছে লেখার বাতিক। পড়ার টেবিলে প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা ছড়ানো থাকে। কলেজ থেকে ফিরে একদিন মনে হল সেগুলো নাড়াচাড়া করা হয়েছে। বইগুলো একধারে সারিবদ্ধভাবে সাজানো, ক্যালেন্ডারে কার্ডটা নির্ভুল নির্দেশ দিচ্ছে, জামাকাপড়গুলো আলনায় উঠেছে। সন্দেহ হল,

আমার অবর্তমানে ঘরে কেউ আসে। সে সন্দেহ দৃঢ়তর হল বুশ-কোটটায় নতুন বোতাম দেখে। বাধ্য হয়ে ঘরে তালা দিয়ে যেতে শুরু করলাম তারপর থেকে।

আমি আর দাদা যখন খেতে বসি ও তখন এমন সব আলোচনা শুরু করে যাতে স্বতই আমি যোগ দিতে ইচ্ছুক! ও হয়তো চায়—বাকযুদ্ধে আমিও অংশ গ্রহণ করি, ওদের দ্বৈরথ সমরকে ত্রিভুজাকৃতি করতে চায়। তাহলে তৃতীয় বাহুটিকে ছেড়ে ও আমার সঙ্গেই সরাসরি দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে পারে। আর 'দ্বন্দ্ব' শব্দটার তো একটি মাত্র অর্থ নয়।

সেদিন উঠেছিল আধুনিক কথা-সাহিত্য নিয়ে। ও বললে—আজকাল বাজারে যা চলছে তাকে সৌখিন মজদুরি বলতে হয়।

দাদা বলেন—কী রকম?

— কীরকম জানেন? আপনার নজরে পড়ল বস্তিজীবন নিয়ে লেখা একখানা উপন্যাস হঠাৎ ভীষণ চালু হয়ে গেল বাজারে। এক সপ্তাহে তিনটে সংস্করণ হয়ে গেল! আপনি খেয়াল করে দেখলেন না যে, তিনটি সংস্করণেই একই ছাপার ভুল, একই ভাঙা-টাইপ; ভাবলেন সত্যি বুঝি এক সপ্তাহে তিনবার করে ছাপতে হচ্ছে বইটা। আপনার লোভ হল, স্থির করলেন বস্তিজীবন নিয়ে রাতারাতি আপনিও একখানা বই লিখে ফেলবেন। একদিন সন্ধেবেলা সিগারেট টানতে টানতে ঘুরে এলেন কোন বস্তির সীমান্ত ঘেঁসে। আড়চোখে দেখেও এলেন ওদের জীবনের এক খণ্ড-অংশ। বুঝবার মন দিয়ে দেখলেন না কিন্তু; কারণ মনটা পড়েছিল গ্লেজড্-কিড্ জুতোজোড়ায়, বস্তির কাদা থেকে রক্ষা করতে হচ্ছিল যেটাকে। ফিরে এসে লিখে ফেললেন একটা আটশ-হাজার পাতার মহা-উপন্যাস।

দাদা বলেন—বুঝলাম। হঠাৎ তোমার মতে বস্তির জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখবে শুধু বস্তির মানুষ।

— অন্তত দীর্ঘদিন যে গিয়ে বস্তিতে বসবাস করেছে। জীবন দিয়ে যে জীবনকে দেখেছে। পরের মুখে ঝাল খায়নি। এই সেদিন কোথায় যেন একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম শেক্সপীয়ারের ওপর। লেখক রোমিও-জুলিয়েট সম্বন্ধে লিখতে বসে মন্তব্য করেছেন প্রথম দর্শনে প্রেম হতে পারে না। বিনা পরিচয়ে প্রথম দর্শনেই যদি পরস্পরের মনে আকর্ষণ জন্মায় তবে তার জৈবিক প্রেরণার একটা কারণ থাকতে পারে—কিন্তু তাকে ভালোবাসা বলা যায় না।

একটু হাসির আভাস খেলে যায় দাদার ঠোঁটের কোনায়, বলেন—যদিচ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, আমি লেখকের সঙ্গে একমত নই, তবু তোমার মতটা কী?

মনামী অকারণেই কেন যেন রাঙিয়ে ওঠে। ঠিক অকারণেই কি? কী ভাবল সে? তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে, আমার বক্তব্য হচ্ছে—আপনার যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তখন সেকথা বলার বা লেখার অধিকারও আপনার আছে। প্রবন্ধ লেখকের সম্ভবত অভিজ্ঞতা নেই। সে সৌভাগ্য যখন তাঁর হয়নি, তখন এটা লিখে পাণ্ডিত্য জাহির না করাই উচিত ছিল তাঁর। নিজে যা প্রত্যক্ষ অনুভব করিনি, ব্যক্তিগত অনুভূতি দিয়ে যা বুঝিনি, পরের মুখে ঝাল খেয়ে সে বিষয়ে লিখতে যাওয়াকে আমি অনধিকার চর্চা মনে করি।

দাদা বলেন, ঠিক কথা। তবে লেখাটা আমি পড়িনি। তোমার থিয়োরি হিসাবে তার সমালোচনা করাটাও আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা হবে। তা ছাড়া বাঙলা ভাষায় আমি না লেখক, না পাঠক! এই তো একজন উদীয়মান লেখক আছেন, ইনি কী বলেন?

একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ আমার মুখের ওপর মেলে প্রতীক্ষা করে মনামী। শুধু জ্বলজ্বলেই নয়, আমি জানি চাপা কৌতুক উপচে পড়ছে ওর দুচোখে।

দাদা ভেতরের কথাটা জানতেন না। প্রবন্ধটা আমারই লেখা। বেরিয়েছে এ মাসেই, একটা পত্রিকায়—তার কমপ্লিমেন্টারি কপিটা পড়ে আছে আমার টেবিলে। গম্ভীর হয়ে বললাম, আপনারা যা বলতে চাইছেন আমি তার সঙ্গে একমত।

মনামী যেন নিভে যায়। আমার কাছ থেকে কঠোর প্রতিবাদ আশা করেছিল সে। আমার জবাবে ভাববাচ্য ছেড়ে এবার সরাসরি আমাকেই প্রশ্ন করে, অর্থাৎ আপনি মনে করেন, লেখকের যে বিষয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই—যে আনন্দ অথবা দুঃখের বিষয় তিনি নিজের জীবনে অনুভব করেননি, সে কথা লিখবার তাঁর অধিকার নেই?

—নিশ্চয়ই নেই!

—তাহলে আপনি এও স্বীকার করেছেন যে, ঐ প্রবন্ধকারের অন্যায় হয়েছে, 'ল্যভ্ অ্যাট ফার্স্ট সাইট' সম্বন্ধে ও-রকম মন্তব্য করা?

—একশোবার! তবে কী জানেন, এসব মৌলিক গবেষণার কথা তো সব সাহিত্যিক জানতে পারেন না—তাই নরকে না গিয়েও দান্তে তার অপূর্ব বর্ণনা দিচ্ছেন, বহু কনফার্মড ব্যাচিলার দাম্পত্যজীবনের নিখুঁত ছবি আঁকছেন, আর দুনিয়ার তাবৎ মূর্খ লেখক মৃত্যু যন্ত্রণার ছবি আঁকবার জন্য কলম হাতে আমৃত্যু অপেক্ষা করছেন না! কিন্তু দশটা-দশ হয়ে গেছে দাদা। এবার ওঠা যাক।

* * *

কিছুতেই ধরা দিইনি ওর জালে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন আমাকে বারে বারে সর্তক ক'রে বলে দিচ্ছিল যে—ও শুধু অপমান করবার জন্যে, প্রথমদিনের আঘাতটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে সুযোগ খুঁজছে। একদিন সিনেমার তিনখানা টিকিট কিনে এনেও সাধ্য-সাধনা করল। রাজি হইনি।

কিন্তু কী আশ্চর্য। সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে ওর বিরুদ্ধে সজাগ রেখেও এ অঘটন ঘটল। স্বীকার করতে লজ্জা হয় নিজের কাছে; কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করি কী করে? যতই নিজেকে নিরাসক্ত রাখতে চাই, যতই নিজেকে বোঝাই ওরা ভিন্ন জাতের মেয়ে—ওরা ভালোবাসে না, ভালোবাসতে জানে না; ওরা ভালোবাসার অভিনয় করতে জানে—প্রেমিক ওদের কাছে অপাংক্তেয়, ওরা খোঁজে স্তাবক, ফ্ল্যাটারার ততই মনটা পাগলা মেহেরালির মতো ওর দুর্বার আকর্ষণে পড়ে ছুটে আসে। সব ঝুট হ্যায় জেনেও সেসব ছেড়ে চলে যেতে পারে না। মনকে শাসন করি, চোখকে বেঁধে রাখি, তবু কখন আবিষ্কার করি অন্যমনস্ক নিজেকে—পাশের ঘরের চুড়িবালার জলতরঙ্গে বিভোর। অভ্যস্ত গানের কলির মতো ও ঘর-করনার কাজ করে যায়—যেন এ-ঘরের সঙ্গে ওর আজন্মের পরিচয়। এঘর ওঘর ঘোরাঘুরি করে, এটা ওটা সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে, ফুলদানির জলটা বদলায়, বিছানার চাদরের কুঞ্চনটা মুছে নেয় হাতের তালুতে, যেন কতদিনের অভ্যাস। দাঁত দিয়ে ফিতে কামড়ে ধরে বেণী পাকায় না সে, কাঁটা বিঁধে বিঁধে শাসন করে না খোঁপাকে—অপরাহ্নবেলায় ঝামাঘসা পায়ের পাতায় আঁকতে বসে না আলতার রেখা; সব দিক দিয়েই সে আমার মানসী প্রতিমার বিপরীত মেরুর বাসিন্দা; তবু আশ্চর্য, আমার ভালো লাগে ওকে।

প্রেম এ নয়, হতে পারে না। কেন পারে না তা আলোচনা করেছি আমার প্রবন্ধে। প্রেম মানে একটা বোঝাপড়া। একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। দুটি বাদ্যযন্ত্র যেন একসুরে, একতালে একটা ঐক্য সঙ্গীত গাইতে রাজি হয়। গান শুরু করার আগে তাই পর্দা কষতে হয়, তবলায় মৃদু আঘাত করতে হয় হাতুড়ি দিয়ে। এ বোঝাপড়া না থাকলে, ঐকতান হবে না। যে মুহূর্তে ভেঙে পড়বে এ বোঝাপড়া, সেই মুহূর্তে তাল কাটবে সঙ্গীতের। মানুষের জীবনও তাই। সপ্তপদীর ভিতরেই যাচাই হয়ে যায় এরা একতালে পা ফেলে চলতে পারবে কিনা। মনামীর সঙ্গে আমার কোনো বোঝাপড়া হয়নি, মন জানাজানি হয়নি—তবু ওকে নিবিড় করে কাছে পেতে চাই কেন? একি শুধু জৈবিক আকর্ষণ?

কিন্তু সত্যিই কি প্রেম একটা বোঝাপড়া? একটা কন্ট্রাক্টের সূচি-প্রস্তুত প্রণালী? তোমাকে খেতে দেব, পরতে দেব, তোমাকে শাড়ি-গহনা কিনে দেব, সিনেমা দেখাব—তুমি কী দেবে? না, তোমাকে রেঁধে দেব, ধুতিতে নাম লিখে দেব, তোমার ছেলেমেয়ে মানুষ করে দেব। এই চুক্তিনামার তপশিল প্রস্তুতের মিষ্টি করে দেওয়া নামই কি প্রেম?

সমুদ্রের আকুতি সঙ্কুচিত হয়ে আশ্রয় নেয় শঙ্খের বুকে—শুকনো ডাঙায় দাঁড়িয়ে ঐ শঙ্খধ্বনির মধ্যেই শুনতে পাই সাগরের অন্তর্জ্বালার নির্ঘোষ—তেমনি এই ছোট্ট সংসারের ঘরকরনার মধ্যে ধরা পড়েছে মনামীর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার আর্তি; শের আফগানের গৃহাবরোধে যেমন সীমিত সঙ্কুচিত হয়ে প্রহর গুনছিল বিশ্ববিজয়িনীর সম্ভাবনা।

আমি ভয় পাই। ভয় নিজের জন্য নয়, দাদার জন্যে। আরও ঠিক হয়, যদি বলি, বৌদির জন্যে। আমি লক্ষ্য করি লকগেটের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। ভেবেছিলাম, ঘোলাজলের প্লাবনে ভেসে যেতে দেব না এই সুখী পরিবারটিকে। আমি বুঝেছি, মনামীই ভাঙন ধরাবে বাঁধের গায়ে। তাই মাঝে মাঝে মনে হত এই জলধারাকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়া যায় না? আমার জীবনের শুকনো ক্ষেতে এ সোনা

ফলাতে পারে না? কিন্তু সে চেষ্টা করে দেখবার অবকাশ পেলেম না। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে সে নিজের পথ কেটে বেরিয়ে গেল।

ভেসে গেলেন অধ্যাপক অবনীমোহন—যেন ভাগীরথীর জলকল্লোলে ঐরাবত!

কী লজ্জা! এর চেয়ে যে আমার ধরা দেওয়া ভালো ছিল। আমাকে আঘাত করে, অপমান করে, দলিত মথিত করে তৃপ্ত হত ওর অশান্ত আত্মা। এ কী করল মনামী! ও কি সত্যিই দাদাকে ভালোবাসে? তার ডবল বয়সেই ঐ অধ্যাপকটিকে? এ কখনো সম্ভব? কিন্তু আর কী অর্থ হতে পারে এ ব্যবহারের?

আর আশ্চর্য মানুষ ঐ রাধাবৌদি। সমস্ত নাটকটা তার চোখের উপর অভিনীত হচ্ছে, অথচ সে যেন একজন নির্বাক দর্শক। তারও যে রয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এটা তার খেয়ালই নেই। না, ভুল হল; খেয়াল তার আছে, বোঝে সব! উপায় নেই বলে চুপ করে থাকে।

মনে আছে খোকন হওয়ার আগে দাদা যখন আসন্নসম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে রোজ সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে যেতেন তখন একটা কবিতা অনুবাদ করতে শুরু করি। প্রথম স্তবকটায় যেন দাদার মর্মকথাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।—

Thou wast all that to me, Love
For which my soul did pine—
A green isle in the sea of love
A fountain and a shrine,
All wreathed with fairy fruits & flowers
And all the flowers were mine.

লিখেছিলাম :

আমার নিখিলে তুমি লীন ছিলে, প্রিয়া
আত্মা আমার তোমারেই শুধু চায়,
প্রাণময় দ্বীপ সাগরের নীলে, প্রিয়া
তুলসীমঞ্চ আমারই এ আঙিনায়।
যে ফুলে ও ফলে সেজেছ পরীর বেশে
সে ফুল যে ফোটে আমারই এ বাগিচায়।।

তারপর আর লেখা হয়ে ওঠেনি। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মনামীকে নিয়ে দাদা কোথায় বের হলেন। রোজই আজকাল যান। আমার ঘরের সামনে দিয়েই কাঞ্চিভরম্ শাড়ির আঁচল উড়িয়ে আড়চোখে চেয়ে চলে গেল মনামী। যেন দিগ্বিজয়ে যাচ্ছে! আমি ধীরে ধীরে উঠে যাই বৌদির ঘরে, দুটো হাল্‌কা গল্প করে কিছুটা সময় কাটাতে। গিয়ে দেখি বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বৌদি। ভর সন্ধ্যাবেলায় এমন করে সে শোয় না কখনও। ডাকলেম, কী হয়েছে বৌদি!

আমার ডাকে তাড়াতাড়ি উঠে বসে,—চোখটা মোছে—কিন্তু সাহস করে আলোটা জ্বালে না। সে জানত আবছা অন্ধকার ছাড়া তার রাঙা চোখদুটো মেলে এখন আমার দিকে তাকাতে পারবে না। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারেই দেখলেম, সেই ম্লান বিষণ্ণ দুটি চোখের দৃষ্টি। বাসা ভেঙে যাওয়া ঝড়ের পাখির দৃষ্টি যেন। আমি অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে আসি নিজের ঘরে। ইচ্ছে হয় ছিঁড়ে ফেলি অসমাপ্ত কবিতার পাতাটা। প্যালগ্রেভ খুলে এডগার এলেন পোর কবিতাটা বার করেই চম্‌কে উঠি! কী অদ্ভুত কোয়েন্সিডেন্স! পরের স্তবক দুটি যেন রাধাবৌদিরই অন্তর-নিংড়ানো আর্তি! কিন্তু কেন ভেঙে যায় মানুষের স্বপ্ন? কেন ফুলভারে আনত চারাগাছের ওপর উদ্যত হয় অশনি :

Ah dream too bright to last !
Ah Starry Hope ! that didst arise
But to be overcast !
A voice from out the future cries
'Oh! Oh!—but over the past
(Dim gulf !) my spirit hovering lies
Mute, motionless, aghast !
For, alas, alas ! with me
the light of life is o'er !

"No more—no more—no more—"
(Such language holds the Solemn Sea
To the Sands upon the Shore!)
Shall bloom the thunder-blasted tree
Or the sticken eagle soar.

রাত জেগে অনুবাদ করলেম স্তবক দুটি :

হায়, সে স্বপন অকালে গিয়াছে টুটে
সহিতে পারেনি মধু-মাধুরীর ভার;
আশার তারকা যেমনি আকাশে ফুটে
ভাগ্য গগনে ঘনাল অন্ধকার।
'চল সম্মুখে—দাঁড়াবার ঠাঁই নাহি—'
অনাগত ঐ ফুকারিছে অবিরত
কুয়াশা-মলিন অতীতের পথ চাহি
অন্তর মোর মূক, মূঢ়, অভিহত।।
হায়! জীবনের দীপ নিভে গেছে তাই
'নাই—নাই—নাই' আজি নিখিলের ভাষা
তীরকে ডাকিয়া ঢেউগুলি বলে—'নাই,
এ পারেতে নাই ও পারের ভালোবাসা।'
বজ্র-আহত তরুতে ফোটে না ফুল
বন্দি বিহগে বৃথাই ওড়ার আশা।।

সাত

এ যে একদিন ঘটবেই এ তো জানাই ছিল। বিয়ের পর যখন প্রথম আসি তখন তো সব সময়েই এ জন্যে কাঁটা হয়ে থাকতাম। তা হলে এত কষ্ট পাই কেন? বোধহয় অনেকদিন ঘর করতে করতে ভেবেছিলাম পাকা সোনাই বেঁধেছি আঁচলে। কষে দেখবার প্রয়োজন বোধ করিনি কখনও। ওই যে বলে না 'সোনা বলে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিত্তল হল।'—আমারও হয়েছে সেই বৃত্তান্ত। এতদিন কষ্টি-পাথর পাইনি বলেই পিটুলি গোলা খেয়ে দুধের স্বাদ পেয়েছি। ঝড়ের মতো মনামী এসে ভেঙে ফেললো আমার তাসের ঘর।

সবই তো জানতাম, সবই তো সহ্য করছি;—কিন্তু একটু রেখেঢেকে এগুলো হলে তো এত লজ্জায় পড়তাম না। ঠাকুরপো কী ভাবছে? আর কী নির্লজ্জ মেয়ে ঐ মনু। খাল কেটে নিজেই কুমির এনেছি আমি। মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছি। প্রথমদিনেই যখন উনি ওকে দেখে ঠাট্টা করে বললেন, 'তোমার নাম ধরে তো ডাকতে পারব না' তখনই লক্ষ্য করেছিলাম, ওঁর চোখের সেই বিহ্বল চাহনি। তখন অবশ্য ও-কথাটার মানে বুঝিনি। বুঝেছিলাম পরে, ঠাকুরপোকে ওর নামের মানে জিজ্ঞাসা করে।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় মনুকে নিয়ে বেড়াতে যান। কোথায় ঘোরেন তা ওঁরাই জানেন। কী গল্প চলে তাও জানি না। সেদিন রবিবারে যখন উনি বললেন, 'আজ মাংস আনব। মনু, তুমি মাংস রাঁধতে জানো!' তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল অনেক অনেক দিন আগেকার আর একটা রবিবারের কথা। সেদিনও অধ্যাপক মশায়ের মাংস খেতে শখ হয়েছিল। বলেছিলেন, 'আমার নটবরটি হচ্ছেন কলির দ্রৌপদ্রী। আজ একটু মুখ বদলানো যাবে।'

আজও বোধহয় ওঁর আবার মুখ বদলাবার শখ হয়েছে!

মনু অবশ্য মাংস রাঁধতে রাজি হল না। জানেই না রাঁধতে। শিখবে কোত্থেকে? থাকে তো হোস্টেলে—আর তাছাড়া শিখবার চেষ্টা না থাকলে ও বিদ্যা কি আপনি হয়? এ তো আর বই মুখস্থ করা ফটং ফটং নয়। ও শুধু সাজতেই শিখেছে। যে আগে রাঁধে সে পরে চুলও বাঁধে; কিন্তু যে আগেই চুল বাঁধে সে আর পরে রাঁধে না। মনু তাই এড়িয়ে গিয়ে ঘরদোর গোছাবার কথা বলল। উনি সেটা

খেয়াল করলেন না! খেয়াল হবে কোথা থেকে; মাংস খাওয়াটা তো আসল কথা নয়—আসল কথা দুজনে খুনসুটি করা। কোমরে আঁচল সেঁটে মনু এল ওঁর হাতে হাতে বইগুলো রোদে দিতে। এতদিন আমিই সেগুলি ঝেড়ে-পুঁছে রেখেছি—টানাটানি করে রোদ খাইয়েছি, ন্যাপথালিন দিয়েছি আলমারিতে। আজই না হয় আমার শরীর ভেঙেছে; কিন্তু চিরদিনই কিছু শুয়ে-বসে কাটেনি আমার। কিন্তু কই, হাতে হাতে বইগুলো এগিয়ে দিতে কেউ তো আসেনি! আজও যখন আমি ওঁদের সাহায্য করতে গেলাম উনি বলে উঠলেন—"থাক, থাক, তুমি আবার ঐ শরীরে এ রোদে এস না!"

জানি গো জানি, আমার কাছে-থাকাটা ভালো লাগবে না তোমাদের। বেশ তো, তোমরাই কাজ কর না হাতে হাত মিলিয়ে। আমি পড়ে থাকি আমার ঘরের কোণে। উনি সুবিমলকে ডেকে দিতে বললেন। ঠাকুরপোকে ডাকতে যাই। সে বলে "থাক বৌদি, আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। ওঁরা নিজেরাই পারবেন। তুমি বরং বস, একটা গল্প পড়ে শোনাই।"

কী একটা গল্পের বই পড়ছিল সে। জোরে জোরে পড়তে থাকে। বসে শুনতে হয়। মন লাগে না। কিন্তু। আবার ফিরে এসে চাকরটাকে বাজারে পাঠাই সের-খানেক মাংস আনতে। আমার কাজ আমি করে যাই। দেখি রোদ্দুরের তাপে মনুর ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে কপালে। একটা চুলের গুচ্ছ এসে পড়েছে চোখে। উনি হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে দিয়ে বলেন, "অনুর কোনও রুচিজ্ঞান নেই।" তারপরেই দুজনের মুখে ফুটতে থাকে ইংরেজির খই! ওরা হয়তো জানে আমি কাছে-পিঠেই আছি। তাই সাদা বাঙলায় কথা বলে না ওরা! আমি কি বুঝি না? পা টিপে টিপে ফিরে আসি নিজের ঘরে। হ্যাঁ, নেই, নেই—এরকম রুচি নেই আমার। কী রুচির ছিরি!

মনকে শক্ত করলাম। পাথরে মাথা ঠুকে লাভ নেই। এ যে হবে তা তো জানাই ছিল। বিয়ের পর প্রথম প্রথম মনে হত এ সংসারের আসল গিন্নি বুঝি বিদেশে গেছেন। তাঁর শূন্য আসনে দুদিনের জন্যে এসে বসেছি বুঝিবা। সেই তিনি আজ ফিরে এসেছেন। যার ধন তাকে ফিরিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! যেখানে সত্যিকারের ভালোবাসা নেই, সেখানে জোর করে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে যাওয়া বোকামি। তাতে শুধু বেদনাই নয়—অপমানও আছে। নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিলাম ঘরের মধ্যে। শুধু মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়—ওঁকে ডেকে বলি, "ওগো, তোমাকে যে তৃপ্তি দিতে পারিনি তা তো জানিই—তোমাকে মুক্তি তো দিয়েছি! কিন্তু আমার চোখের সামনেই কেন পাখা ঝাপটে বিক্রম দেখাচ্ছ? উপেক্ষা সইতে পারি, কেন অপমান যোগ দিচ্ছ তার সাথে? তুমি কি চেয়ে দেখ না, নীরজা, বামুনদি পর্যন্ত করুণার দৃষ্টিতে দেখে আমাকে?" ওরা সবাই জেনে ফেলেছে—আমি এ বাড়ির কেউ নই। কী লজ্জা! চোখ তুলে কারও দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারি না। কলেজের ছুটি তো হয়ে গেছে! ঠাকুরপো দেশে ফিরে গেলেও যে বাঁচতাম। তবু একটা লোকের কাছ থেকে অন্তত আড়াল করে রাখতে পারতাম এই দুঃখের ইতিহাস। দুনিয়ার একটা লোক অন্তত জানতো যে রাধারাণীই এ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী।

রঙচঙ মেখে সঙ সাজা আমার দু চোখের বিষ। পারতপক্ষে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়াই না। ভুলে থাকতে চাই—আয়নার ভেতরের ঐ রোগা কালো মেয়েটাকে। আয়নার সামনে গেলেই ওদিক থেকে ঐ মেয়েটাও এসে দাঁড়ায়....আর মনে পড়ে যায়, আমি কালো—আমার রূপ নেই! লক্ষ্য করলাম আমার ড্রেসিং টেবিলটার তাকে ক্রমে ক্রমে জমে উঠেছে হরেক রকমের শিশি কৌটো। মনু ঐ আয়নার সামনে দিনে কতবার যে দাঁড়ায়! কখনও মাথার চুলগুলো গুছিয়ে নেয়, কখনও পাউডার-মাউডার মাখে, কখনও নখে রঙ লাগায়—মিষ্টি লজেঞ্চুসের গন্ধ সে রঙে! শুধু সকাল-সন্ধ্যা স্নানের পরেই নয়—যখন তখন মুখখানাকে মেরামত করছেই। রঙ-বেরঙের যে শিশি-কৌটোগুলো জমেছে টেবিলে তার মধ্যে দুটি আমার সাবেকি আমলের। আলতার শিশিটা আর রুপোর সিঁদুর কৌটো। উনি একবার একটা সেন্টের শিশি কিনে দিয়েছিলেন। সেটাও আছে। সীল খোলা হয়নি বলে উপে যায়নি। সেদিন লক্ষ্য করলাম তার পাশেই রয়েছে একটা নীল রঙের ছোট সেন্টের শিশি—একফালি চাঁদ আঁকা।

মনুকে বলি—"এই সেন্টের শিশিটা তো শেষ হয়নি। আবার একটা সেন্ট কিনলি কেন?"

ও অবাক হয়ে বলে—"আমি আবার সেন্ট কিনলাম কখন? ও এইটে? তুমি ভেবেছ বুঝি এগুলো

আমি কিনেছি? ও হরি! এসব জামাইবাবু কিনে আনেন। আমাকে বলেছেন প্রসাধনবিদ্যা তোমাকে শিখিয়ে দিতে। আচ্ছা, রাধাদি, গরমের দিনেও তুমি পাউডার না মেখে থাক কী করে? আর এই একমাথা চুল কী জট করে রেখেছ এস বেঁধে দিই।"

বললাম, "থাক ভাই, আমাকে বাদ দিয়েই তোমাদের সাজন-গোজন চলুক।"

ও বলে, "তা কী করে হবে। এসবগুলো যে তোমার জন্যেই কিনেছেন উনি।"

আপাদমস্তক জ্বলতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলি, "না, আমার জন্য নয়।"

ও বোধহয় খেয়াল করে না। হাসতে হাসতে বলে, "তবে কি আমার জন্যে? পাগল হয়েছ নাকি? আমার জন্যে কিনলে এই নামের রুজ-লিপ্‌স্টিক কখনও কিনতেন উনি?" বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে।

রসিকতাটা বুঝতে পারিনি। পরে ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সেও বুঝিয়ে দেয়নি। তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল শুধু। মরুক গে। ও কথা আর ভাবব না।

এতদিন সময় কাটতে চাইত না। সারাদিন শুয়েবসে কী করি? উনি চলে যেতেন কলেজে। ঠাকুরপোও। আমি খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে শুতাম। আর শুয়েই তো কাটে সারাদিন। হয়তো রেডিয়েটা খুলি। বই পড়ার বাতিক কোনওদিনই নেই। নইলে হয়তো কাটতো ভালো। রেডিয়োটা একঘেয়ে লাগে। কেবল বক্তৃতা, তার আবার অর্ধেক বোঝাই যায় না। মাথার ওপর ঘুরতে থাকে বিজলি পাখাটা। তার একটানা ভোঁ-ওঁ-ওঁ আওয়াজটা বেশ ঘুমপাড়ানি। ছেলেবেলায় পিসিমা আমাদের ঘুম পাড়িয়ে চরকায় বসতেন। ঠিক তেমনি আওয়াজ। ঐ পাখাটা আমায় ছেলেবেলার ঘুমপাড়ানিয়া গান শোনায়। নীরজা এসে জানলা-দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে যায়। চারদিক নিঝুম নিথর হয়ে আসত। হয়তো রাস্তায় হেঁকে যায় একটা ফেরিওয়ালা। না দেখেই আমি ওদের চিনতে পারি। অনেকে আবার হাঁকে না—বিচিত্র শব্দ করে। ঝন্‌ঝন্ ঝন্‌ঝন্—লোকটা চাবিতালা সারায়। ঝোলা গোঁফ, মাথায় পাগড়ি একটা লোক যায় ঠিক দুপুরবেলায়। এ্যালুমিনিয়ামের একটা থালা বাজিয়ে ঝাঁকা মাথায় একটা পশ্চিমা কুলি যায় পিছন পিছন—আলমনিয়াম বর্ত্তনবালাআ! ওদের সক্কলকে আমি চিনি। কখন কে আসবে মুখস্ত আছে আমার। দূর আকাশে সাঁতার-দেওয়া চিলের তীক্ষ্ণ চীৎকার ভেসে আসত কখনও আচমকা। কখনও জেগে উঠত খোকন। উঃ, কী দুষ্টু যে হয়েছে। যখনই ঘুম আসবে তখনই খেলা শুরু হবে ওর! আর কলবল করে কত কথা! ঐ যে বলে না 'ছেলে ছেলে করবি, এমন ছেলে দেব যে গলায় গেঁথে মরবি।' আমারও হয়েছে সেই দশা। ঠিক সময় বুঝে ঘুম ভাঙবে ওঁর! আবার থাবড়াতে থাকি। টুলটুলে মুখটা টেনে আনি বুকে। তারপর আবার কখন চুকচুক করে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম নেমে আসত আমারও চোখে। গাঢ়, কালো নিথর ঘুম। ঘুম ভাঙতো একেবারে পড়ন্তবেলায়, কলে জল আসার শব্দে। নীরজা এসে খুলে দিত জানলাগুলো। পড়ন্ত রোদ্দুর বাঁকা হয়ে ঢুকতো ঘরে। তখনই উৎকীর্ণ হয়ে উঠতাম। একটু পরেই পরিচিত একটা জুতোর মশমশ শোনা যেত সদরে। উনি ফিরে আসতেন।

....হাসি পায়, যখন মনে হয় এই নিঃসঙ্গ জীবন আমার ভালো লাগেনি; তাঁতির তাঁতবোনার ব্যবসা পছন্দ হয়নি, চাষ করা শখ হল তার; এঁড়ে গোরু কিনে আনল। সময় কাটাবার জন্য মনুকে আনার কথা আমিই নাকি প্রথম তুলেছিলাম। হ্যাঁ, সময় কাটছে বটে আজকাল। বুকের ভেতর কেটে কেটে বসে যাচ্ছে প্রতিটি কঠিন ঘন্টা, প্রতিটি কঠোর দণ্ড!

* * *

সেদিন বিকেলে দরজায় কে কড়া নাড়তে উঠে এসে সদর খুলে দেখি যজ্ঞেশ্বর। ওঁর কলেজের বেহারা। একখণ্ড চিঠি এনেছে, বললে—"উত্তর নিয়ে যেতে বলেছেন।"

চিঠি খুলে দেখি ইংরেজি হরফ!

ওকে অপেক্ষা করতে বলে ঘরে ফিরে এলাম। বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে। আজ দিন-পনের এই একটা ব্যথা শুরু হয়েছে। কাউকে বলিনি—আর বলেই বা কী হবে? বসে পড়ি একটা চেয়ারে। দম বন্ধ করে খানিকক্ষণ বসে থাকার পর ব্যথাটা যেন কমে আসে। আবার সোজা হয়ে দাঁড়াই। এখন কী করি? ঠাকুরপোও কলেজ থেকে ফেরেনি। কাগজটা মুঠোর মধ্যে পাকাতে থাকি। মনু এসে বলে, "কী দিদি?"

কাগজখানা এগিয়ে দিই ওর দিকে। আমার স্বামীর মনের কথা আমি বুঝতে পারিনি—ও অনায়াসে বুঝে নিল। বললে—"জামাইবাবু লিখেছেন আজ সন্ধ্যার শো'তে তিনখানা টিকিট কেটেছেন। আমরা দুজনে যেন পাঁচটার মধ্যে তৈরি হ'য়ে থাকি।"

আমি বলি—"আবার সিনেমার টিকিট।"

মনু হেসে বলে, "হ্যাঁ, আবার সিনেমার টিকিট!"

গতকালকেই এ নিয়ে এত কাণ্ড হ'য়ে গেল। মনু তিনখানা টিকিট কেটে এনেছিল—কিন্তু ওর যাওয়া সম্ভব হল না। কী বুঝি জরুরি মিটিং ছিল। ঠাকুরপোও কিছুতে রাজি হল না। পুরুষমানুষ ছাড়া আমিও যেতে রাজি হইনি! মনু শেষ পর্যন্ত রাগ করে ছিঁড়েই ফেললে টিকিট তিনটে! আজ তাই উনি নিজেই টিকিট কিনেছেন!

ওকে বলি, "একখানা টিকিট কম কাটতে লিখে দাও। আজ বিষ্যুদবার, আমার লক্ষ্মীপুজো আছে!"

মনু আমার হাত দুটি ধরে বলে, "তোমার দেওরকে বল না দিদি—দুটো বাতাসা ফেলে পাঁচালিটা পড়ে রাখবে।"

—"সে হয় না। আর তাছাড়া কালকেই তো বলেছি—ইংরেজি বই আমি বুঝতে পারি না।"

—"আমি গল্পটা না হয় তোমায় বলে দিচ্ছি।"

—"কেন বিরক্ত করছ আমাকে?"

মনু আর পীড়াপীড়ি করে না! একখণ্ড কাগজে কী লিখে ফেরত দেয় বেহারার হাতে।

সন্ধ্যাবেলায় উনি ফিরে বলেন, "টিকিট তিনটে ফেরত দিয়ে রাতের শো'র করে এনেছি। তুমি লক্ষ্মীপুজো সেরে নাও—নটার শো'তেই যাব তিনজনে।"

আমি বললাম, "আমার শরীর ভালো নেই—বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হচ্ছে। ঠাকুরপোকে নিয়ে যাও বরং।"

উনি বোধহয় বিশ্বাস করলেন না। একদৃষ্টে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ! তারপর মনুকে বলেন—"বুকের মধ্যে যখন ব্যথা হ'চ্ছে তখন আর পীড়াপীড়ি করে লাভ নেই। বেশ, তুমি বরং সুবিমলকেই তৈরি হয়ে নিতে বল।"

মনু বলল—"সেটা আপনিই বলুন, আমি বরং তৈরি হয়ে নিই ততক্ষণ।"

উনি ঠাকুরপোর ঘরের দিকে চলে যান। মুহূর্ত পরে ফিরে এসে বলেন—"সুবিমল যাবে না।"

শুনে মনু বেঁকে বসল। কিন্তু কোনো আপত্তিই শুনলেন না উনি। তা শুনবেন কেন? এতো আরো ভালো হ'ল। উনি জোর করে মনুকে পাঠিয়ে দিলেন কাপড়টা পালটে আসতে! রাত্রের শো'র এখনও অনেক দেরি; কিন্তু ওঁরা বোধহয় সান্ধ্যভ্রমণ সেরে সিনেমা দেখবেন—তাই তাড়াতাড়ি! মনু কাপড় ছাড়তে গেল। উনি চুপ করে বসে রইলেন ওঁর খাটে। দুজনে প্রায় দশ মিনিট বসে আছি। একটা কথা নেই। আমার বুকের মধ্যে সেই মোচড় দেওয়া ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে। দম বন্ধ করে সহ্য করছি, আর মনে মনে মাথা খুঁড়ছি—কী লজ্জা! কেন ওঁকে বলতে গেলাম বুকের ব্যথার কথাটা? উনি তো বিশ্বাসই করলেন না! একটু শুতে পারলে হয়তো আরাম হত—কিন্তু ওঁরা রওনা হওয়া পর্যন্ত দাঁতে দাঁত দিয়ে সহ্য করতে হবে—ভেঙে পড়লে চলবে না।

মনু ফিরে এল। একটা আগুন রঙের শাড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে সাপটে ধরেছে ওর সারা দেহ। ঘরে ঢুকেই বলে "আমি রেডি!"

উনি হেসে বল্লেন, "রেডই, তবে পুরোপুরি রেড হলে না কেন? তুমিও যে সঙ্গদোষে গাঁইয়া হয়ে উঠেছ আজকাল। এই আগুন রঙের মাইশোর জর্জেটের সঙ্গে ঐ জ্যাকেটটা মানায় নাকি। যাও যাও, লাল-ব্রোকেডের ব্লাউজটা পরে এসো।"

মনু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, "বাপরে বাপ! আপনি তো সায়েন্সের প্রফেসর। এসব দিকে এত নজর কেন?"

উত্তরে উনি ইংরেজিতে কী বল্লেন! ওরা দুজনেই হেসে ওঠে। মনুর সেই খিলখিল হাসির ধমক যেন আমার হৃৎপিণ্ডটাকে ধরে নিঙড়োতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ বুজে মনে মনে কাতরাতে থাকি। ওরা চলে যায়। আর লজ্জা নেই। উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ি বিছানায়। বালিশটা টেনে নিই বুকের তলায়।

কাঁদতে কষ্ট হচ্ছে, বুকের ব্যথাটা বাড়ছে—কিন্তু এতক্ষণ ধরে রাখা চোখের জলকে এখন মুক্তি না দিলেই বাঁচবই বা কী করে? বেড-সুইচটা নিভিয়ে দিই। অন্ধকার ঘরে প্রাণভরে এখন কাঁদব আমি। এতক্ষণ ওদের সামনে যে ভেঙে পড়িনি এটুকুই সান্ত্বনা।

কতক্ষণ কাঁদছিলাম জানি না। হঠাৎ মাথায় একটা নরম হাতের স্পর্শ লাগায় চমকে উঠি।

—"কে?"

—"আমি!"

—"কী হয়েছে ঠাকুরপো?"—আমি উঠে বসি।

ঠাকুরপো কখনও এমন সাড়া না দিয়ে আমার ঘরে আসে না! তাছাড়া অন্ধকার ঘর, আমি শুয়ে আছি। হঠাৎ এভাবে ও এসেছে কেন?

ও বসে পড়ে আমার পায়ের কাছে। বলে, "ভাবছি এবার ছুটিতে আর বাড়ি যাব না। বাবাকে তাই লিখে দিয়েছি। ছুটিটা এখানেই থাকছি, বুঝলে?"

আমি অন্ধকারেই ঘাড় নেড়ে জানাই বুঝেছি।

—"আর একটা কথা বৌদি। কিছু মনে কর না, আমি যখন ছুটিতে এখানেই থাকছি তখন কথা বলার লোকের তো আর তোমার অভাব হবে না। তোমার বোনকে এবার ফিরে যেতে বল।"

মনে আছে, মনুকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, "ঠাকুরপোকে তাড়িয়ে তোর কী লাভ?" আজ কিন্তু ওকে সেই কথাটা বলতে পারলাম না।

ঠাকুরপো আল্‌তো করে ডানহাতটা আমার পায়ের পাতায় রাখে। বলে—"তুমি ভুল করে আমাদের যুগে এসে পড়েছ বৌদি। কয়েক হাজার বছর আগেকার মানুষ তুমি, সেই সত্যযুগের। তুমি কি কিছু বুঝতে পার না?"

কী জবাব দেব? আমি তো সবই বুঝি, সবই জানি; কিন্তু যে বন্যাকে বাঁধতে পারব না তার সামনে বালির বাঁধ দিয়ে কী হবে?

সুবিমল বলে, "এখন তুমি বুঝবে না, কিন্তু একদিন দেখবে আজকের এই ভুল তোমার সংসারটা তেতো করে দেবে।"

এত দুঃখেও হাসি আসে। ঠাকুরপো আমাকে শেখাবে সংসারের তিক্ততা! হেসে বলি, "তুমি তো এত লেখাপড়া শিখেছ ঠাকুরপো। বলতে পার—সবচেয়ে তেতো কী?"

ও বলে "কী?"

—"নিম তেতো, নিশিন্দে তোতো, তেতো মাকাল ফল,—কিন্তু তার চেয়েও কী তেতো জান?"

ঠাকুরপো বলে, "কী আবোল-তাবোল বকছ? কী বলতে চাও বল না?"

"বলবার আমার কিছুই নেই ভাই; কিন্তু কী করতে পারি বল?"

ও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর অনেকটা ভারী গলায় বলতে থাকে—"আমার মাকে কখনো চোখে দেখিনি। আমার বড় বোনও নেই। মেয়েদের স্নেহ-ভালোবাসা কাকে বলে জানতেম না এতদিন। তোমাকে পেয়ে আমার মনের জোর বেড়ে গেছে; তুমি তো জান না, ধ্রুবতারার সন্ধান পেয়েছি আমি তোমার মধ্যে। কোনো অন্যায়, কোনো লোভ, পাপ যখন আমায় প্রলোভন দেখায় আমি তখন হেসে বলি—তোরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবি না। বৌদির আশীর্বাদ আছে আমার রক্ষাকবচ! আমার সেই বৌদির শুভাশীর্বাদের বেড়া ডিঙিয়ে তোরা আমাকে স্পর্শ করতে পারবি না।"

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলি—"হঠাৎ একথা কেন ঠাকুরপো?"

ও বলে, "তোমাকে এভাবে তিলে তিলে মরতে আমি দেব না বৌদি! আমি যে দেখতে পেয়েছি তোমার সর্বনাশের ছায়া। ওই সর্বনাশীকে না তাড়ালে তোমাকে হারাতে হবে।"

পাগল ছেলে! ওরে, কতটুকু ক্ষমতা আছে আমাদের? কলকাঠি যিনি নাড়ছেন তাঁর ইচ্ছায় কি বাধা দিতে পারবি? তোর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দিয়ে তুই কি তাঁর বিধান পর্যন্ত পালটে দিতে চাস্?

—"তুমি ওকে তাড়াও বৌদি।"

আর এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই। ও সবই বুঝেছে। তাছাড়া আমারও একজন সহায় দরকার। একজনের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে না পারলে আমিও বুঝি বুক ফেটে মরে যাব। জানি, এ রোগের

ওষুধ নেই। কিন্তু সান্ত্বনা তো আছে। এই একজন আছে—এর কাছে অন্তত মনটা হালকা না করলে বাঁচি কী করে? বলি—"সবই তো বুঝতে পার ঠাকুরপো, বল কী করতে পারি আমি?"

—"না। সবটা আমি বুঝতে পারিনি। তাইতো আমি উপায় খুঁজে পাইনি। আসল গলদটা কোথায় তা আজও আমি জানি না। তোমাদের দুজনকে আজ তিন-চার বছর ধরে দেখছি। অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছি বটে—তবে আরও অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে। আমার কাছে সব কথা খুলে বলতে পারবে? কোন সঙ্কোচ না করে?"

একটু অপেক্ষা করে বললাম—"বলব। উনি আমাকে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন; কিন্তু পরে ওঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। আমার সঙ্গে ওঁর মনের মিল হতে পারে না। আমার পূজা-অর্চনা বার-ব্রতে ওঁর বিশ্বাস নেই, আবার উনি যেরকম ভাবে আমাকে চান আমিও সেরকম হতে পারি না। সেরকম রঙ-চঙ মেখে ওঁর হাত ধরে পথে বের হতে পারি না। তাই আমাকে নিয়ে উনি তৃপ্তি পান না।"

ঠাকুরপো অসহিষ্ণুর মতো বলে, "এসব তো আমি জানিই; কিন্তু আরও কারণ আছে কিছু—তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। হয়তো সঙ্কোচ করে বলতে পারছ না. পারলে ভালো করতে। আমাকে কেন ছোট ভাইয়ের মতো নিতে পারছ না বৌদি? কেন সত্যি কথাটা, আসল কথাটা, এড়িয়ে যাচ্ছ?"

—"আসল কথা আর তো কিছু নেই ভাই।"

—"আছে। আর সেই কথাটা জানি না বলেই সব কথার অর্থ বুঝতে পারি না। এতদিন কেন খোকন আসেনি তোমাদের সংসারে? আজই বা এল কেন? খোকন আসার আগে আর পরে দাদার কোনো পরিবর্তন তুমি লক্ষ করেছ কিনা?"

আমি চুপ করে থাকি। তোমরাই বল ভাই—এর কি কোনো জবাব আছে? আর থাকলেও তা কি ওকে বলা যায়? ঠাকুরপো যদি সত্যিই আমার ভাই হত তা হলেও কি বলা যেত? বোন হলেও কি বলা সম্ভব?

ঠাকুরপো হঠাৎ আমার পা দুটি চেপে ধরে বলে, "তুমি আমার বৌদি নও—তুমি আমার না-দেখা মা। মনে কর এ ঘরে আমি নেই! নিজের মনেই কথা বলছ তুমি। সব কথা শুনব বলেই আলোটা জ্বালিনি। তুমি আমায় সব কথা বল। আমি নিশ্চিত জানি, কিছু একটা গণ্ডগোল আছেই তোমাদের জীবনে। আজ দাদা ঐ মেয়েটিকে নিয়ে মেতেছেন এর নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। দাদা তোমাকে প্রাণের চাইতেও ভালোবাসতেন—একথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। আজ নিশ্চয়ই তিনি তোমার কাছে এমন কোনো আঘাত পেয়েছেন যাতে তাঁর মন অন্যত্র আশ্রয় খুঁজছে। তিনি যেন ইচ্ছে করেই আঘাত দিচ্ছেন তোমাকে! একথা কি সত্যি নয়?"

আমি নির্জীবের মতো বলি—"কী জানি?"

"তুমি কি দাদাকে কোনো আঘাত দিয়েছ? তাঁকে কি দূরে ঠেলে দিয়েছ খোকন আসার পর?"

সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে বলি—"ঠিক উল্টো। খোকন কোলে আসার পর থেকে উনিই আমায় এড়িয়ে চলেন।"

—"তিনি কি সন্তান চাননি?"

বললাম, "না, কোনোদিনই তিনি চাননি যে আমি মা হই।"

ঠাকুরপো একটু চুপ করে থেকে বলে, "আশ্চর্য! আমার মনে হয়েছিল তুমি মা হতে চলেছ জেনে তিনি খুশিই হয়েছিলেন।"

—"তা সত্যি, উনি খুব খুশি হয়েছিলেন সেকথা শুনে।"

ঠাকুরপো প্রায় ধমক দিয়ে ওঠে, "কী আবোল-তাবোল বকছ! এই বলছ তিনি কোনোদিন সন্তান চাননি, আবার বলছ খোকনের আগমন-সংবাদে তিনি খুশি হয়েছিলেন—কোনটা সত্যি?"

আমি বাধা দিয়ে বলি—"কী বলব ভাই। দুটো কথার একটাও মিথ্যে নয়। ওঁকে কোনোদিনই আমি বুঝতে পারিনি। পারবও না কোনোদিন।"

ও বিরক্ত হয়ে বলে, "কিন্তু আজকের ওঁকে তো বুঝতে পারছ? যত শীঘ্র পার তোমার বোনটিকে বিদায় করার ব্যবস্থা কর।"

ওকে বোঝাই, সেটা এখন অসম্ভব। মনুকে সারা ছুটি এখানে এসে থাকবার জন্যে ডেকে এনেছি। এখন কি বলা যায়? তাছাড়া ওকথায় উনি যদি রাজি না হন! না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

—"তুমি যদি না বলতে পার, তবে আমিই বলব দাদাকে। তাতে উনি যা ইচ্ছে ভাবুন।"

—"ছি ভাই, সেটা বিশ্রী দেখাবে। উনি কী ভাববেন?"

—"তা জানি না, তবে বর্তমানে যা চলছে সেটাও এমন কিছু সুশ্রী নয়। কিন্তু এভাবে ওকে সর্বনাশ করতে দেব না আমি।"

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলি, "সবই কপাল আমার, কী মনে করে ওকে আনলাম, আর কী হয়ে গেল। ওকে কেন এনেছিলাম জান? ঐ মেয়েটা একদিন আমার হাতে মানুষ হয়েছিল। তখন ওর বাবা বিলেতে। ওরা থাকত আমাদের পাশের বাড়ি। আমার বাবা ছিলেন ওর মায়ের গুরুদেব। ভাবি এক, আর হয় আর এক। তোমরা দুজনে মুখ ফিরিয়ে চাইলে না। চাইলেন আর একজন!"

ঠাকুরপো ধীরে ধীরে বলে, "তুমি আজ মন খুলে অনেক কথা বলেছ আমায়। আমিও সব কথা স্বীকার করব তোমার কাছে। কলেজে-পড়া এইসব অতিআধুনিক মেয়েদের কাউকে যে ভালোবাসব তা স্বপ্নেও ভাবিনি কোনওদিন। তবু তা সম্ভব হল—হয়তো তোমারই ঐকান্তিক ইচ্ছায়। আমি অবাক হয়ে ভাবতেম কী করে এ সম্ভব হল। কিন্তু এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি বৌদি—যাকে সেদিন স্টেশনে এক ঝলক দেখেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম—আজ তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করি।"

আমি প্রশ্ন করি, "তোমার সঙ্গে ওর স্টেশনে দেখা হয়েছিল?"

প্রশ্নটা বোধহয় ও শুনতে পায় না অথবা খেয়াল করে না। আপনমনেই বলে যায়। কত কী আবোত-তাবোল। ও নাকি কী একটা প্রবন্ধ লিখেছিল। এখন বুঝেছে সে যা জানত তা ভুল। স্টেশনে মনুকে দেখেই ওর ধারণাটা পালটেছে কিন্তু এখন ওর মন ভেঙে গেছে। যাকে এত ভালোবাসত আজ তাকে শুধু ঘৃণাই করে—আর কিছু না। বল্‌তে বল্‌তে ওর গলা ভার হয়ে আসে। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার কথা কিছু বলতে যাই! ঠিক সেই মুহূর্তেই জ্বলে ওঠে বিজলি বাতিটা। চমকে উঠি আমরা দুজনেই। ঠাকুরপো প্রায় লাফ দিয়ে নেমে পড়ে আমার খাট থেকে।

আলোর সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন আমার স্বামী। আর তার পেছনে আগুন রঙের শাড়ি পরা মনামী। তার খোঁপাতে একটা লাল গোলাপ! অথচ সিনেমা যাওয়ার সময় এটা ওর মাথায় ছিল না। কোথা থেকে এল ফুলটা? কে পরিয়ে দিল ওর খোঁপায়? কখন? না কি কেউই পরায়নি? এই তিন-চার ঘন্টার মধ্যে এমন কিছু ঘটে গেল নাকি, যাতে আপনিই ফুটে উঠেছে ঐ লাল গোলাপটা ওর কালো চুলের মাঝখানে?

আট

ওরা যেন ভূত দেখল! হঠাৎ আলোয় চমকে ওঠে আচমকা। সুবিমল লাফ দিয়ে নেমে পড়ে খাট থেকে! রাত বারোটা! নাটকীয় দৃশ্য বটে! নারকীয়ও বলা চলে। বুঝলুম আমার দাঁড়িয়ে থাকাটা দৃষ্টিকটু। অশোভন। তবু কে যেন পা দুটো শক্ত করে ধরে রাখে মাটির সঙ্গে।

জামাইবাবুর ভ্রূতে জেগেছে একটা কুঞ্চন। স্বাভাবিক। দৃশ্যটা স্পষ্টতই অপ্রত্যাশিত—তাঁর তরফেও। এ-সময়ে সুবিমল অন্ধকার ঘরে এভাবে উপস্থিত থাকতে পারে এটা তাঁর ধারণার বাইরে। আমারও।

সুবিমল কোনও কথা বলে না। আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে চলে যায়। আবহাওয়াটা হালকা করার জন্যে বলি—তুমি তো গেলে না রাধাদি; কী গ্র্যান্ড বই! যদি দেখতে তবে বুঝতে।

জামাইবাবু গম্ভীর স্বরে বলেন—তুমি শুতে যাও মনু, রাত অনেক হয়েছে।

ফিরে এলুম নিজের ঘরে। একতলার খোলা ছাদে ক্যাম্প খাট ফেলা। সুবিমল শুয়ে পড়েছে। ছি ছি ছি। এটা যেন কল্পনাই করা যায় না। এতদিন কী সব ভুল বুঝেছি! এই জন্যেই কি দিদি-জামাইবাবুর মিল হয়নি? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? জামাইবাবু এতদিন এটা বুঝতে পারেননি? আর পেরে থাকলে ঐ লোকটাকে সহ্য করেছেন কেন? ঘাড় ধরে পথে বার করে দিচ্ছেন না কেন?

কী লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা! ঘরে ঢুকে খিল দিলুম দোরে। আয়নার সামনে দাঁড়াই। পোশাকটা বদলাব। লক্ষ্য হল আয়নার ভেতরে লালে-লাল মেয়েটিকে। টান মেরে খুলে ফেলি সব। লাল শাড়ি, ব্লাউজ, লাল গোলাপ! আলোটা নিভিয়ে দিই। কাচা কাপড়টা জড়িয়ে লুটিয়ে পড়ি বিছানায়। আশ্চর্য! চোখ ছাপিয়ে জল আসে কেন? কাঁদছি নাকি! কী কেলেঙ্কারী! গলার মধ্যে থেকে একটা বোবা কান্না যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। একি কাণ্ড! আমার কাঁদার কী কারণ থাকতে পারে? কেন এ চোখের জল? পরাজয়ের লজ্জা, ব্যর্থতার বেদনা!

কী ভাবছি পাগলের মতো? ইচ্ছে হ'ল উঠে বসে নিজের গালেই চড় মারি। ঠাস ঠাস করে। কীসের পরাজয়? কীসের ব্যর্থতা? ওকে জব্দ করতে গিয়েছিলুম, পারলুম না। ঠকে গেছি নিঃসন্দেহে। আর কিছু না। তার জন্যে তো কাঁদার প্রয়োজন নেই। আমি তো সত্যিই ওকে ভালোবাসতুম না!

ভালোবাসা! মনামী চ্যাটার্জী ভালোবাসবে ঐ গেঁয়ো ভূতকে! সিলি! সে কথা নয়, কিন্তু.....

আমি সুন্দরী। জানি সে কথা! না জেনে উপায় নেই। অনেকের কাছে অনেকবার শুনেছি কথাটা। যারা মুখে বলে না তারা জানিয়ে যায় চোখের ভাষায়! জানতুম, রূপমুগ্ধ পুরুষের দুনিয়া প্রতীক্ষা করছে আমার ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। প্রশ্রয়ের সঙ্কেত। স্টেশনে ওর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ। ও দেখল এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। আমি দেখলুম ওর চোখে সেই প্রত্যাশিত দৃষ্টি। বুঝলুম, ভক্তদলের একটি সংখ্যা বৃদ্ধি হল ফের। সে কী গায়ে-পড়া আলাপ! "বৌদির যে বোন আছেন এটা অনেকদিন থেকেই জানি।" "হাজার লোকের মধ্যেও আপনাকে চিনে নেওয়া যায়।" ফ্ল্যাটারার! এক রিক্সায় বসিনি বলে নাকি ওঁর মানহানি হয়েছে! বেশ, দেখা যাবে মানীর মান কতদিন থাকে। দুদিনেই ভাব করতে আসবে ছুঁকছুঁক করে।

আশ্চর্য! লোকটা যেন ভ্রূক্ষেপই করল না আমাকে। কোনওদিন যেচে একটা কথা বলতে এল না! প্রথমটা আমিও ওকে এড়িয়ে চলতুম। কিন্তু উপেক্ষায় ফল হল না। ভীষণ রাগ হল। ভাবলুম শিক্ষা দিতে হবে। মনামী চ্যাটার্জীকে এভাবে উপেক্ষা করা যায় না। এ অপমান সে সইবে না! তাহলে বৃথাই এ রূপ। এ সৌন্দর্যের পুঁজি। ঠিক করলুম—ওর সঙ্গে যেচে ভাব করব! আলাপ করব গায়ে পড়ে। ওকে বুঝতে দেব যেন ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি, আকণ্ঠ। যখন সেটা স্থির বিশ্বাস হবে তখন ও এগিয়ে আসবে। কোনও এক আবছা সন্ধ্যায় ও আসবে মিনমিনে গলায় মিঠে মিঠে বুলি শোনাতে। কলকণ্ঠে হেসে উঠব তখন। বলব—আপনি বুঝি মনে ভেবেছেন আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। হাউ ফানি! এই প্রতিশোধ নেব বলেই ওর সঙ্গে আলাপ করতে উন্মুখ হয়েছিলুম! পিন দিয়ে ফুটো করতে মজা লাগে বলেই না বেলুনগুলো ফোলাই। শান্তনু রায়, প্রফেসর কে. জি. বি.-র চুপসে যাওয়া মুখগুলো মনে পড়ে। কেমন যেন চোয়ালটা ঝুলে পড়ে। বোকা বোকা চাহনি! রিডিক্লাস!

কিছুতেই ছেলেটা ফাঁদে পা দিল না। অত্যন্ত সতর্ক সে। হয়তো আন্দাজ করেছিল আমার মতলব। তাই আমি যেখানে এক পা এগিয়েছি ও সেখানে পিছিয়ে গেছে সাত পা। আর কী হতে পারে তাছাড়া? আমাকে ওর ভালো লাগে না, এটা বিশ্বাস হয় না। সে অসম্ভব।

রোখ চেপে গেল। একফোঁটা একটা ছেলের কাছে এভাবে হার মানতে হবে? জাল পাতলুম নানাভাবে। আশ্চর্য নিরাসক্ত ভাব দেখায় ও। কিন্তু আমি মানব কেন? আমি যে দেখেছি ওর চোখের তারায় সেই মুগ্ধ দৃষ্টি। ধরা ওকে দিতেই হবে। নতুন পথ ধরলুম। তর্ক বাধাতুম জামাইবাবুর সঙ্গে —ওর উপস্থিতিতে, বাঁকা ইঙ্গিতে আঘাত করতুম ওকে। ও নিশ্চুপ। শুনে যেত শুধু। যেন পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তি। ওর জামায় বোতাম লাগিয়ে দিলুম—ছিঁড়ে ফেলল পটপট করে। ঘরটা সাজাতে গোছাতে দিলে না। বেশ, আমিও দেখব, এ তেজ কতদিন থাকে। ওকে আড়ালে ধরতে হবে। কিন্তু নির্জন-সাক্ষাৎ ও হতে দেবে না কিছুতেই। সরে গেছে বারেবারে। সেদিন জামাইবাবু সকাল সকাল খেয়ে নিলেন। দিদি ঘুমিয়ে পড়েছে। বামুনদি রান্নাবান্না সেরে নিতেই ছুটি দিয়ে দিলুম তাঁকে। রান্নাঘরে ওর ভাত বেড়ে নীরজাকে দিয়ে ডাকতে পাঠালুম। ও দ্বার পর্যন্ত এসে দেখলে নির্জন ঘরে আমি ভাত আগলে বসে আছি। ও ফিরে গেল। নীরজা এসে বলে—দাদাবাবু ওঁর ভাতটা ঘরেই পাঠিয়ে দিতে বললেন, দাও!

ও আমাকে কোন সুযোগ দেবে না। কোনও রকমেই না। কাল জামাইবাবুর একটা জরুরি কাজ ছিল সন্ধেবেলায়। আমি যেন ভুলে গেলুম সেকথা। তিনখানা সিনেমার টিকিট কিনে আনলুম।

জামাইবাবু যেতে পারবেন না শুনে একটু চমকে উঠতে হল। দিদিকে বললুম—তবে তোমার দেওরকে নিয়ে চল। টিকিটটা নষ্ট করে কী লাভ? দিদি ওকে বললে। অনেক করে। রাজি হল না। ধনুক-ভাঙা পণ যেন। শেষে দিদিও বেঁকে বসল। আমি রাগ করি। সিনেমা যাবার সাজপোশাক হয়ে গিয়েছিল। মায় প্রসাধনের শেষপর্যায়ে কাজলের তিলটিও আঁকা সারা চিবুকে। হন্‌হন্‌ করে চলে গেলুম ওর ঘরে। ও কী লিখছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায়। টেবিল ল্যাম্পটা ঘুরিয়ে দেয়। উজ্জ্বল আলো এসে পড়ে আমার মুখে। হাত দিয়ে চোখটা আড়াল করি। বলি—আলোটা সরান। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

ও হাসলে, বলে—কোথায় সরাই বলুন—আলোও যে ঐ কথাই বলছে!

চমকে উঠি, বলি, —কী বললেন?

মুহূর্তে ও সামলে নেয় নিজেকে! হঠাৎ বলে ফেলেছে কথাটা। গম্ভীর হয়ে বলে—কী বলতে এসেছিলেন?

আমিও গম্ভীর স্বরে জবাব দিই—তিনখানা সিনেমার টিকিট কেটেছিলুম। ভেবেছিলুম জামাইবাবু যেতে পারবেন। কিন্তু তিনি জরুরি কাজে আটকা পড়েছেন। আপনি না গেলে দিদিও যাবে না।

—বেশ আপনি টিকিট তিনখানা দিন, আমি বদলে কালকের করে আনি।

—কেন, আপনারও কোন জরুরি কাজ আছে না কি?

—বিন্দুমাত্র না।

—তবে যেতে পারবেন না কেন?

—আমি সিনেমা দেখি না!

—ও! কারণটা জানতে পারি না?

—পারেন। একবার একটি অনাত্মীয়া মহিলার পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখেছিলাম। তারপর বেরিয়ে এসে তাঁর পাশাপাশি বসে ট্রামে করে বাড়ি ফিরতে পারিনি! সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছি—হয় সিমেনা 'হল্‌'-এ পৃথক মহিলা আসনের ব্যবস্থা হোক—না হয় ট্রামে-বাসে লেডিজ সিট উঠে যাক। এ দুইয়ের একটাও যতদিন না হচ্ছে ততদিন সিনেমা দেখব না।

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে। রাগ করে ছিঁড়ে ফেললুম টিকিট তিনখানা! কান্না পেয়েছিল। কিন্তু কাঁদিনি। কেন কান্না পেয়েছিল তা বুঝিনি। আজ বুঝছি।

আযৌবন শুধু আঘাতই করেছি। আঘাত পাওয়াটা যে কেমন তা কোনোদিন অনুভব করিনি। আমার একসন্ধ্যা সান্নিধ্যের জন্যে কতজনকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে দেখেছি। আর ও লোকটা একদিনও চোখ তুলে তাকাল না। অপমান। কাল রাত্রে মনে হয়েছিল সেই অপমানের জ্বালাতেই চোখে জল আসছে বুঝিবা! আজ বুঝেছি ভুলটা।

কী লজ্জা! কী অপরিসীম লজ্জা। ঐ অপদার্থ সামান্য লোকটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি! ওকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে অভিনয় শুরু করেছিলাম। কখন ভেতরে ভেতরে অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছি তা জানতেও পারিনি। পেলুম একটি আঘাতে। ওকে দিদির শিয়রে অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে দেখে। মনের অগোচরে পাপ নেই। নিজের কাছ থেকে আর কী লুকোব? নিজের মনে তো জানি নিঃশেষে হেরে গেছি আমি।

কিন্তু ওর কী দেখে ভুললুম? রূপ? শিক্ষা? বিত্ত! ওর চেয়ে আমাদের ফোর্থ ইয়ারের শান্তনু সোম অনেক বেশি হ্যান্ডসম। ইংরাজির অধ্যাপক কে. জি. বি. অনেক বেশি পণ্ডিত। রায়বাহাদুরের ছেলে অনেক বড় সম্পত্তির মালিক। এদের তো অনায়াসে ফিরিয়ে দিয়েছি। কখনও কঠোর হয়ে, কখনও হেসে ব্যঙ্গ করে। এ ছাড়া কত অসংখ্য ছেলের চোখে দেখেছি আমার আহ্বানের অপেক্ষা করা দুঃসাহসের কম্পন। গ্রাহ্যও করিনি। মনে আছে কে. জি. বি. যেদিন গদগদ কণ্ঠে প্রথম প্রেম নিবেদন করলেন, সেদিন বলেছিলুম—আমাকে এবার ট্রান্সফার নিতে হবে স্যার।

—কেন?

—কারণ আই. এ.-টা না পাশ করতেই আপনি যে পরের ডিগ্রিটা পাইয়ে দিতে চাইছেন। এরকম লাফিয়ে চলা কি ভালো?—

—হেলেন, নূরজাঁহা অথবা ক্লিওপেট্রাও কিছু বাঁধা ধরা পথে চলেননি; তুমিও না হয় একটু উল্টো-পাল্টা চললে!

হেসে বলেছিলুম—উল্টোপাল্টা পথে ছুটতে তো আমিও চাই মাস্টারমশাই; কিন্তু কোথায় আমার প্যারিস, জাহাঙ্গীর অথবা অ্যান্টনি? সন্ধান যে পাই না। চোখ চাইলেই হয় কলমধারী কেরানি অথবা ইংরাজির ইস্কুল-মাস্টার!

আজ মনে পড়ছে অনেকের কথাই। অনেক দিনের অনেক পাপ জমা হয়ে আছে। অভিশাপ। অনেকের অভিশাপ সঞ্চিত হয়েছিল আমার জীবনে। তাই যে মনামীর কাছে হার মেনেছিল আই. সি. এস.-তনয়া ডলি দত্ত, ট্রান্সফার নিয়েছিল ডরোথি ডিক্রুজা—সেই দিগ্বিজয়ী মনামী চ্যাটার্জী মরল গোপ্পদে! আমাকে উপেক্ষা করে ও গিয়ে হাত পেতেছে রাধাদির কাছে।

সব দিক দিয়েই হেরে গেলুম। সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে আমার। শেষ দিকে ওর মনে ঈর্ষা সঞ্চার করতে চেয়েছিলুম। ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে, ওর চোখের সামনে দিয়ে বেড়াতে যেতুম জামাইবাবুর হাত ধরে। এটা দৃষ্টিকটু জানি। ভেবেছিলুম দিদিকে ও শ্রদ্ধা করে। ভক্তি করে। অন্তত তাকে রক্ষা করতেও ও ছিনিয়ে নেবে আমাকে, জামাইবাবুর কাছ থেকে। তাই জ্বালা ধরিয়ে দিতে চেয়েছি ওর মনে। হায় রে! তখন কি জানতুম যে ও দিদিকে ভক্তি করে না—ভালোবাসে। জামাইবাবুকে আড়ালে নিয়ে যাওয়ার ওর লোকসান হয়নি। লাভ হয়েছে! সুযোগ বেড়েছে!

রাত অনেক। সমস্ত চরাচর থমথম করছে। বাড়িটা ঝিমোচ্ছে অন্ধকারে। হঠাৎ মনে হল পাশের ঘরে কথাবার্তা চলছে। চাপা কণ্ঠে। উৎকর্ণ হয়ে শুনলুম খানিকক্ষণ। হ্যাঁ, দিদি-জামাইবাবুর কথা কাটাকাটি হচ্ছে। উঠলুম। দরজাটা খুলি। এসে দাঁড়ালুম বারান্দায়। ঢং ঢং করে দুটে বাজল। দিদির চাপা কান্নার আওয়াজ। হঠাৎ দ্বার খুলে বেরিয়ে এলেন জামাইবাবু। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ি একটা থামের আড়ালে। জামাইবাবু সোজা চলে গেলেন বাইরের ঘরে। নৈঃশব্দ্য! লাইব্রেরি ঘরের বাতিটা জ্বলল না। বোধ হয় ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েছেন। দিদির ঘরেও আলোটা জ্বলল না। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। বিশ্বচরাচর স্তব্ধ। নিদ্রাচ্ছন্ন। কী জানি কী ভেবে পা বাড়াই লাইব্রেরি ঘরের দিকে। হয়তো দুটো সান্ত্বনার কথা বলতুম জামাইবাবুকে! হয়তো তাঁকে ফিরিয়ে আনতুম দিদির ঘরে! ঠিক কী ভেবেছিলুম জানি না। হয়তো কিছুই ভাবিনি। একপা অগ্রসর হতেই কাঁধের উপর একটা স্পর্শ পেলুম। অতর্কিত শীতল স্পর্শ!

সুবিমল!

আমি একেবারে অবশ। শেষ রাতের ঘোলাটে চাঁদের ম্লান আলোয় ওকে আবছায়া দেখা যায়। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। গাছ-কোমর করে কোঁচার খুঁটটা মাজায় জড়ানো। সুগঠিত স্বাস্থ্যবান দেহ। বাম স্কন্ধের উপর থেকে ওর সেই দরাজ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক চিলতে পৈতে। কোথায় যেন একটা রাতজাগা পাখি ডেকে উঠল; হঠাৎ এ কী হল! যে লোক এড়িয়ে গেছে আমাকে দিনে-রাতে, উপেক্ষা করেছে, অবজ্ঞা করেছে, মাঝরাতে সে এভাবে ধরা দিল! সমস্ত শরীর আমার থরথর করে কেঁপে ওঠে। মনে হল, একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন থেকে এইমাত্র উঠলুম। এক-আধদিনের নয়। এ আমার আযৌবনের দুঃস্বপ্ন। আমার সমস্ত অভিমান দূর হয়ে গেল। সব গর্ব সব অভিমান নিঃশেষ। সে-ই হার মেনে ধরা দিল; কিন্তু আমার আর কলকণ্ঠে হেসে ওঠা হল না। দুচোখ ছাপিয়ে ঠেলে উঠতে চাইছে বোবা কান্নাটা। ওর বুকে মাথাটা আশ্রয় পাবার আগেই ও বলে—আপনার শোবার ঘরটা এদিকে।

চমকে উঠে বলি—মানে?

—মানে, আপনি যে-পথে চলেছেন ওটা ভুল পথ। ওদিকে লাইব্রেরি। ওখানে দাদা একা আছেন। এখন মধ্যরাত্রি। আপনার শয়নকক্ষ এদিকে।

শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বলি—ও! তাই নাকি? আর এ-ঘরে যখন আপনার বৌদি একা শুয়ে কাঁদছেন—তখন আপনার শয়নকক্ষ বোধ করি এটিই।

শাট্ আপ! গর্জে ওঠে সুবিমল। স্থান কাল পাত্র ভুলে। জ্বলে ওঠে বারান্দার লাইটটা।

—কে ঠাকুরপো, মনু? কী করছিস তোরা ওখানে এত রাত্রে?

জবাব দিই না। দ্রুতপদে চলে আসি ঘরে।

যথেষ্ট হয়েছে। কাল সকালেই ফিরে যাব। এখানে আর নয়। এখন বাকি রাতটুকু ঘুম হলে হয়।

নয়

বাকি রাতটুকুও চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। বিনিদ্র নয়নে সোনালি চুমকি বসানো বিশ্বজোড়া কালো চাঁদোয়ার নীচে অনড় হয়ে পড়ে রইলেম। মনে হচ্ছিল এই যে আকাশ-জোড়া অন্ধকার এও তো জীবনেরই এক প্রকাশ! দিনের প্রখর আলোয় যখন প্রাণচঞ্চল জগৎ জেগে উঠবে তখন মনে হবে এই অনন্ত অন্ধকারের আলো-আড়াল-করা ইশারাটা বুঝি অহেতুক পাগলের প্রলাপ। কিন্তু এই তারা-ভরা আকাশের তলায় মনে হচ্ছে কেবল আলো, কেবল আনন্দ, কেবল উচ্ছ্বাস নিয়েই জীবন নয়। সে আরও ব্যাপক, তার অর্থ আরও গভীর। সে এই রাত্রির মতো গূঢ়, অন্ধকারের মতই নিঃসীম। কোথায় কোনো এক সুবিমলের জীবনের ব্যর্থ প্রেমের উৎস শুকিয়ে গেল, কোন পূজার জন্য চয়িত ফুল ব্যভিচারীর লালসায় ইন্ধন জোগানো, কোথায় কোন পাখির যত্নে-গড়া বাসা ভেঙে গেল ঝড়ের ক্ষ্যাপামিতে—তাতে এই জগৎ-জোড়া সৃষ্টিতত্ত্বের কোনও ক্ষয়-ক্ষতি হয় না। মনামীকে ভালোবেসেছিলেম; সে আমাকে ভালোবাসতে পারলে না। না হয় নাই পারলে; তাই বলে কি জগৎ-সংসার কালো হয়ে উঠবে? ঐ যে প্রেয়সীর চোখের কালো তারার মতো ঐ তারাটা অনিমেষ আমার দিকে চেয়ে আছে—ওর দীপ্তি তো একবিন্দুও কমেনি এতে।

মনুকে আমি দোষী করিনে। আমার মতো কতো ছেলে হয়তো প্রেমভিক্ষা করেছে ওর কাছে। সৌন্দর্যের সিংহাসনে ও রাজেন্দ্রাণী। অসংখ্য ভ্রমর গুঞ্জরণ করে ফেরে ওর যৌবনের মৌবনে। কিন্তু দাদার প্রতি এ ওর কী ব্যবহার! ঈর্ষার কথা নয়;—আমি শুধু ভাবছি—কেন এভাবে ও ভেঙে দিচ্ছে একটা গড়া সংসার। কাল সকালেই দাদাকে বলব মেয়েটাকে বিদায় দিতে। হয়তো উনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইবেন। কারণ জানতে চাইবেন। কী বলব? কিন্তু হয়তো তিনি কোনো কথাই জানতে চাইবেন না। নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে অধ্যাপক অবনীমোহনও যথেষ্ট সচেতন।

নিষ্প্রভাত রাত্রি নেই। ধীরে ধীরে পুব আকাশটা রাত্রির ঘন কালো যবনিকা অতিক্রম করে সামনে এসে দাঁড়ায়, জ্বলে ওঠে প্রভাতসূর্যের পাদপ্রদীপ। শুরু হয়ে যায় বিশ্বজোড়া দৈনন্দিন অভিনয়। নানা সুরে একদল ঘুম ভাঙা পাখির ঐকতানের আবহসঙ্গীত। পূর্ব আকাশের রঙ্গমঞ্চে যেই জ্বলে উঠল হাজার বাতির স্পটলাইট, অমনি প্রেক্ষাগৃহের চন্দ্রাতপে হাজার বাতি নিভে গেল একে একে। বিদায় নিল তারা। ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইছে শেষরাত্রের। আমি উঠে পড়ি। খোলা ছাদে পায়চারি করতে থাকি। সারারাত একফোঁটা ঘুম হয়নি। মাথাটা ভার ভার লাগছে। হঠাৎ লক্ষ্য হল মনামীর ঘরে বাতি জ্বলছে। ভোর রাতে কী করছে ও? অনেকক্ষণ জ্বলছে আলোটা। বাইরে তখন বেশ আলো ফুটেছে। ঘরের ভেতর বোধহয় যাই-যাই করেও ঘুমকাতুরে অন্ধকার আঁকড়ে রয়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই ওর ঘরের দিকে।

ও কী গোছগাছ করছিল। আমাকে এভাবে উঠে আসতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রশ্নভরা চোখ তুলে তাকায়। ওরও বোধহয় ঘুম হয়নি সারারাত্রি। চোখের কোলটা কালো হয়ে আছে। ওর মশারিটা তোলা। খাটের ওপর সুটকেস। কয়েকটা শাড়ি পাট করে তুলছিল তাতে। দুজনেই নীরব। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বলি, আপনার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে উঠে এলেম। কয়েকটা কথা বলার ছিল আমার। আসতে পারি?

—আসুন—টুলটা ঠেলে দেয় আমার দিকে।

আমি বসি না। ইতস্তত করি।

ও একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে ওকে। নরম শরীর। একরাত্রির জাগরণ-ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। চোখদুটো লাল। কেঁদেছে? কাঁদবার তো কোনো কারণ নেই। না কি রাত্রি জাগরণে? ভারী মায়া হ'ল। কাল রাত্রে কী করে এই মেয়েটির সম্বন্ধে বৌদিকে বলেছিলাম—ওকে শুধু ঘৃণা করি! কই আমার সুগোপন প্রেমের গায়ে তো একবিন্দু মালিন্য লাগেনি। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মনটা পাখির হালকা পালকের মতো শুধু ভেসে ভেসে বেড়াতে থাকে।

ধীরে ধীরে বলি : কাল রাত্রের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। আমাকে মাপ করবেন।

—কোন্ ব্যবহারে?

—আশা করি বুঝতেই পারছেন।

—না পারিনি। কাল রাত্রে আপনার অনেকগুলি আচরণই লজ্জা পাওয়ার হেতু হতে পারে। ঠিক কোনটা 'মীন' করছেন বুঝতে পারছি না।

বুঝলেম সমস্ত বুঝেও বাঁকা ইঙ্গিতটা করতে ছাড়ছে না। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় যে মনটা ভেসে বেড়াচ্ছিল, এতক্ষণে সেটা স্থির হল। একটু সামলে নিয়ে বলি, সে যাই হোক, এরপর ছুটির বাকি দিন কটা আপনি অন্যত্র কাটাতে গেলেই ভালো হত না কি?

ও দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। এটা বোধ হয় ওর একটা মুদ্রাদোষ। কিন্তু কী সুন্দরী লাগে যখন অভিমানে, রাগে অথবা অপমানে ও অমনি করে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়ায়! ও বলল, আর একটু পরিষ্কার করে বললে খুশি হতুম।

বললেম, পরিষ্কার অনায়াসেই করা যায়। কিন্তু কী জানেন, সেটা আপনার পক্ষে লজ্জার, আর আমার পক্ষে সঙ্কোচের। আপনি বুদ্ধিমতী, অনায়াসেই বুঝতে পারেন একটি বিবাহিত নরনারীর সংসার এভাবে ভেঙে দেওয়াটা পাপ।

ও হেসে বলে, তাই নাকি! আমি না হয় বুদ্ধিমতী, কিন্তু আপনাকেও কিছু আকাট মূর্খ বলে তো মনে হয়নি আমার। কথাটা কি আপনারও বোঝা উচিত নয়?

—মানে? কী বলছেন আপনি?

—মানেটা আরও পরিষ্কার করে বলতে পারি। তবে কী জানেন, কথাটা আপনার পক্ষে নির্লজ্জতার, দিদির পক্ষে কলঙ্কের আর আমার পক্ষে ন্যক্কারজনক। তাই এ সকালবেলায় ও আলোচনাটা থাক।

আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। বলি, মিথ্যা দিয়ে এভাবে সত্যের কণ্ঠরোধ করা যায় না, মনামী। ভেবেছ, মিথ্যা দোষারোপ করে খানিকটা কর্দম নিক্ষেপ করলেই আমি সঙ্কোচে সরে দাঁড়াব? আমাকে তুমি ভুল চিনেছ। আমি সে জাতের ছেলে নই। তুমি কী ইঙ্গিত করে নিজের অপরাধ গোপন করতে চাইছ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তুমি বলেই এতটা ভাবতে পেরেছ—আর কেউ হলে একথাটা ভাবতেও পারত না।

মনামী আহত নাগিনীর মত মাথা খাড়া করে দাঁড়ায়। বলে, সুবিমলবাবু, ঠিক ঐ কথাগুলিই আমি বলতে চাই। মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকা যায় না। আমি স্বীকার করতে ভয় পাই না। হ্যাঁ স্বীকার করছি মুক্তকণ্ঠে—অবনীমোহনবাবুকে আমি ভালোবাসি। তিনি পুরুষমানুষ, আমি কুমারী কন্যা—আমরা যদি পরস্পরকে ভালোবাসি সেটা না অন্যায়, না পাপ। তিনি যদি আমাকে বিবাহ করতে চান,—আমি রাজি আছি। এই আমার কৈফিয়ত। এবার আপনি জবাবদিহি করুন দেখি! আপনি এমনি জোর গলায় স্বীকার করতে পারেন আপনার আচরণ? বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি, যার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নির্জন মধ্যরাত্রের অন্ধকারে একই শয্যায়—

—সুবিমল!

চমকে পিছন ফিরে তাকাই। মনামী নির্বাক। দাদা এসে দাঁড়িয়েছেন দ্বারপ্রান্তে।

—তোমাকে ডাকছেন একবার তোমার বৌদি।

মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসি। দাদা কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছিলেন? কতখানি শুনেছেন আমাদের কথোপকথন? বৌদির ঘরে এসে বৌদিকে দেখে শিউরে উঠলেম। একরাত্রে এ কী পরিবর্তন হয়েছে বৌদির! বসে পড়ি ওর পায়ের কাছে। বৌদির চোখে লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। চুলগুলো লুটিয়ে পড়েছে বুকে-পিঠে, কোলের ওপর। চোখদুটো জবাফুলের মত লাল। আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বলে, আমার একটা কথা রাখবি ভাই?

বললেম, তুমি বললে কোন্ কথাটা কবে রাখিনি বল?

—তুই বাড়ি যা। আর....আর বাড়িতে বলিস, এখানে থাকলে তোর পড়াশুনার অসুবিধা হয়। ছুটির পর তাই হস্টেলে এসে উঠতে হচ্ছে তোকে।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলি, বৌদি, দাদাও কি তবে ভুল বুঝলেন?

বৌদি আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে। ফুলে ফুলে কী কান্না তার।

ধীরে ধীরে চলে এলেম ঘরে। দাদার ওপর যেটুকু শ্রদ্ধা অবশিষ্ট ছিল তাও মুছে গেল নিঃশেষে। 'উইনসম ম্যারো' না হলে যাঁর সান্ধ্যভ্রমণ ভালো লাগে না, বাজার উজাড় করে যিনি 'ঈভ্‌নিং ইন

প্যারি' সেন্ট আর 'কিস্‌মি' লিপস্টিক কিনে আনছেন, তাঁর যোগ্য ব্যবহার বটে। হ্যাঁ, ঠিক কথা, তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

যেতেই যদি হয় তবে এখনই যাব। নিঃশব্দে, যেমন করে ঐ ভোরের তারাটা মিলিয়ে গেল চুপিসাড়ে। এ সংসারে আমার কীসের বন্ধন? আমি কে? মনামীরই একটি পূর্বতন সংস্করণ—অতিথিমাত্র। কোনো জোর নেই আমার। অথচ কী অদৃষ্টের পরিহাস, বোধহয় পাঁচ মিনিটও হয়নি—এই আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেম মনামীর দ্বারে, এ বাড়ির শুভাশুভ মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে। জোরের সঙ্গে দাবি জানিয়েছিলাম—ওকে চলে যেতে হবে। তখন কি স্বপ্নেও জানতেম—থাকবে ও-ই, যেতে হবে আমাকে?

জানি, বাসিমুখে এভাবে চলে গেলে বৌদি দুঃখ পাবে, হয়তো কাঁদবে! কিন্তু এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকা অসম্ভব! মনামীর সঙ্গে চোখাচোখি হবার আগেই, তার দাঁত-দিয়ে-ঠোঁট-কামড়ানো বাঁকা হাসি আর বিদ্রূপভরা বক্র কটাক্ষের উদয়ের আগেই অস্তমিত হতে চাই। বিড়ম্বনা বাড়িয়ে লাভ কী? কয়েকটা বই জামা-কাপড় সুটকেসে ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। পথচলতি রিকশা ডাকি একটা। বাকি জিনিস থাক, পরে এসে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কী অনায়াস এই বিদায়ের পালাটা। কেউ জানে না—এই যাওয়াই আমার শেষ যাওয়া। রিকশায় উঠবার আগে একবার পেছন ফিরে দেখলেম বাড়িটার দিকে। উঠোনের ওপ্রান্তে বামুনদি হাতপাখা দিয়ে প্রাণপণে হাওয়া করছে উনানে। নীরজা বারান্দা মুছছে জল-ন্যাকড়া দিয়ে। বারান্দার ঘুলঘুলিতে দুটো ব্যস্তবাগীশ চড়ুই এই সাতসকালেই খড়কুটো নিয়ে ওড়াউড়ি শুরু করেছে। ওরা বাসা বাঁধছে। হয়ত একটু পরেই ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে নীরজা আসবে আমার ঘরে। আমাকে না দেখে ভাববে, এক্ষুনি আসবে দাদাবাবু। প্লেট দিয়ে কাপটা ঢাকা দেবে; জুড়িয়ে না যায়। বেলা না-বাড়া পর্যন্ত ওরা জানতেও পারবে না, আমি চলে গেছি। চিরদিনের জন্যেই চলে গেছি। কিন্তু চায়ের কাপটা কতক্ষণ গরম থাকবে? তিন বছরের জমানো উত্তাপ যদি এক মুহূর্তেই শীতল হয়ে যায় তাহলে চায়ের অন্তিম গতিটা অনুমান করা কি শক্ত?

দশ

বিষৌধির এক এই বিষম বিপদ। এইজন্য বিচক্ষণ কবিরাজ সহজে এইসব মারাত্মক ঔষধ প্রয়োগ করিতে চাহেন না। তিল-পরিমাণ মাত্রাধিক্য হইলে হিতে বিপরীত হয়। এ যেন কালনাগিনী লইয়া খেলা দেখানো। এক মুহূর্ত অসতর্ক হইলেই করাল দংশন করিবে। মানুষের অন্তরবাসী রিপুগুলিও বিষ। অনুরাধার অন্তরের অন্তিম রিপুটিকে ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করিতে গিয়াছিলাম। হয়তো মাত্রাধিক্য হইয়াছিল। রোগিণী সে তীব্র মাৎসর্য বিষ-দংশন সহ্য করিতে পারিল না। বিষক্রিয়া দেখা দিল।

ভাবিয়াছিলাম, অনুরোধে-উপরোধে যাহা সম্ভব হয় নাই ঈর্ষান্বিত হইয়া অনু তাহাতে অনুমতি দিবে। সে বুঝুক যে, তাহার পূজা-ঘরের চতুঃসীমার মধ্যে আমি জীবনকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব না। তাহাকেও আমি আমার ল্যাবরেটরির ভিতর টানিয়া আনিব না। আমাদের কর্মজগৎ পৃথক হউক ক্ষতি নাই, নর্ম-জগৎ যেন এক হয়। ভীরু পারাবতটির মতো যে আমার বক্ষে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাকে শৃঙ্খল পরাইয়া আমার সংসারের বীতংসে আবদ্ধ করায় আমার তৃপ্তি নাই—মুক্ত নীলাকাশে তাহাকে উড়াইয়া দিব আমি। প্রভাতী পূর্ব-আকাশের রৌদ্রঝলমল দিগন্তে সে মিলাইয়া যাউক। আবার দিনান্তে ফিরিয়া আসুক আমার বক্ষে। এই আমি চাহিয়াছিলাম। সে যখন কিছুতেই রাজি হইল না, তখন মনামী আসিয়া দেখা দিল আমাদের সংসারে। আমি মনুকে সাজাইলাম, তাহাকে আমার নিত্যযাত্রী-সহচরী করিলাম, আলাপে-গল্পে তাহাকে লইয়া মাতিয়া রহিলাম। তিল তিল করিয়া অনুর অন্তরে মাৎসর্য-বিষের ইঞ্জেকশন দিতেছিলাম। ভলুমেট্রিক টেস্টের সময় যেমন একচক্ষু ব্যুরেটের দিকে সতর্ক রাখিয়া অন্য চক্ষু দিয়া লক্ষ্য করি রাসায়নিক দ্রবণের বিক্রিয়া, তেমনি মনামীর সহিত ঘনিষ্ঠতার অভিনয় করিতে করিতে লক্ষ্য করিতেছিলাম অনুকে! স্পষ্ট অনুভব করিলাম বিষক্রিয়া শুরু হইয়াছে। মনামীকে সে ঈর্ষা করিতেছে; যে কোন মুহূর্তে সে ভাঙিয়া পড়িতে পারে। যে কোন উত্তেজক মুহূর্তে প্রবল ধাক্কায় মনামীকে সরাইয়া সে আমার পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইবে।

কিন্তু কোনো অসতর্ক ক্ষণে বিষের মাত্রা নিরাপদ সীমারেখা অতিক্রম করিয়া গেল। ভলুমেট্রিক টেস্টে যেমন হয়। অনু মরিয়া হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইলাম, কিন্তু ততক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ সুবিমলকে ঐভাবে অনুর শয্যা হইতে লাফাইয়া নামিতে দেখিয়া প্রথমটা চমকিয়া উঠিলাম। এর অর্থ কী? দৃশ্যটির একটি মাত্রই অর্থ হয়। সহজ সরল অর্থ। মনামী নিঃসংশয়ে সেই অর্থই করিয়াছে। আমি কিন্তু অত সহজে ভুলি নাই। জানি, এক অলক্ষ্যচারিণী আজীবন আমার জীবন-পথে ফাঁদ পাতিয়া চিরকাল আমার প্রতিকূলতা করিয়াছে।

তাই অত সহজে ভুলি নাই। বৈজ্ঞানিকের মতো বিশ্লেষণী মন লইয়া বিচার করিলাম। প্রথম অর্থ সরল। অন্য নারীর প্রতি আসক্ত স্বামীর উপর প্রতিশোধ লইতে উদ্যত বঞ্চিত নারীর পক্ষে এ আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু নারীটি এ ক্ষেত্রে অনুরাধা। তাহাকে যে আমি মর্মে মর্মে জানি। ও যে লক্ষহীরার যুগের মানুষ। যুগে যুগে স্বামীর ব্যভিচারকে ওরা অদৃষ্টের অভিশাপ বলিয়া গ্রহণ করে। প্রতিশোধের চিন্তাও ওদের মনে আসে না।

দ্বিতীয়ত, সুবিমল ও অনুর প্রকৃত সম্পর্কটা আমার অজানা নহে। দুটি প্রায় সমবয়সী নরনারীর সম্পর্কটা আর দিদি-ভাইয়ের পর্যায়ে নাই—প্রায় জননী-সন্তানের সীমারেখা স্পর্শ করিতে চলিয়াছে। জানি, এ দুনিয়ায় বিশেষ বয়সের নর-নারীর ভালোবাসা ক্ষণে-ক্ষণে রূপ বদলায়। কিন্তু তাহারও প্রকারভেদ আছে। সুবিমল এবং তাহার বৌদির মধ্যে সেরূপ কোনো সম্পর্ক যদি গড়িয়া উঠিবার উপক্রম করিত—তবে আমি তাহা লক্ষ করিতাম।

তৃতীয়ত, আমি যেরূপ অনুর অন্তরে ঈর্ষা সঞ্চারে প্রয়াসী—অনুও যদি সেই উদ্দেশ্য লইয়া আমাদের প্রত্যাবর্তনের পথে একটা ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়া থাকে? কিন্তু অনুরাধার পক্ষে এতটা চাতুরি অবিশ্বাস্য!

তাহা হইলে?

আর একটি জিনিস লক্ষ করিলাম। আমার রূঢ় কণ্ঠস্বরে মনামী যখন শুইতে চলিয়া গেল তখন লক্ষ করিয়া দেখিলাম অনুর মুখে ধরা-পড়ার কোন সঙ্কোচ নাই। আশ্চর্য। কেন নাই? সুবিমল অপরাধীর মতো মাথা নিচু করিয়া উঠিয়া গেল, মনু দৃশ্যটার গুরুত্ব বুঝিয়াছিল বলিয়াই অস্বাভাবিক লঘু কণ্ঠে সিনেমার গল্পের অবতারণা করিল, আমার ভ্রূকুঞ্চনটাও স্পষ্ট—শুধু অনুরাধার উপরে এই অস্বাভাবিক দৃশ্যপটের কোনো প্রতিক্রিয়া হইল না।

মনু শুইতে গেল। আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনুর মুখোমুখি বসিলাম। অনু বলিল—তোমাকে কয়েকটা কথা বলব, শোনার সময় হবে?

বললাম—হবে, আমারও কয়েকটা কথা বলার আছে যে।

অনুই তাহার বক্তব্য প্রথম পেশ করিল। সে আমাকে মুক্তি দিতে চায়। সে বুঝিয়াছে যে আমি তাহাকে লইয়া তৃপ্ত নহি। আমি যাহা চাই তাহা সে আমাকে দিতে পারে না। অহেতুক সে আমার সুখের কাঁটা হইয়া থাকিবে না। সে স্থির করিয়াছে সুবিমলকে লইয়া কালই তাহার পুরোহিত পিতার নিকট চলিয়া যাইবে।

এ কথায় নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি তাহার মনে কোনো দ্বিধা-সংকোচ নাই; তবু ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা টানিয়া বলিলাম—তাহলে একেবারে কালই বাপের বাড়ি যাবার নাম করে তুমি সুবিমলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে চাইছ, আর সবুর সইছে না।

আমার বাঁকা ইঙ্গিতটা ব্যর্থই হইল। ও বলিল, হ্যাঁ কালই।

আরও স্পষ্ট ভাষায় না বলিলে ও বুঝিবে না। তাই বলি—তোমাদের দুজনের যে এখানে অসুবিধা হচ্ছে তা জানি, কিন্তু বাপের বাড়ি যাবার নাম করে এভাবে প্রমোদভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার ফলাফলটা ভেবে দেখেছ?

অনু অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকে! এতবড় স্থূল আঘাতে আহত না হওয়াই অসম্ভব। বাণবিদ্ধ মুমূর্ষু হরিণীর মতো বলে—এ কথার মানে?

—মানেটাও বুঝিয়ে বলতে হবে? মধ্যরাত্রে নির্জন ঘরে এখনই যে দৃশ্যটা দেখলাম—তার তো অন্য মানে হয় না অনু!

অনু শিহরিয়া উঠিল। তারপর আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। মেঘকৃষ্ণ আলুলায়িত কুন্তলদামে আবৃত হইল আমার চরণযুগল। বারবার পায়ের উপর মাথার আঘাত করিয়া বলিল—তুমি কী করে ভাবলে এ কথা? ছি-ছি-ছি। আত্মহত্যা করলেও এ দুঃখ আমার ঘুচবে না। ওগো, তুমি কেমন করে একথা বিশ্বাস করলে? বেশ, আমি কিছু চাই না। তুমি মনামীকে নিয়েই সুখে থাকো। আমি একলাই পড়ে থাকব ঘরের কোণে। কালই ঠাকুরপোকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আর সে ফিরে আসবে না।

বুঝিলাম, মাত্রা বেশি হইয়া গিয়াছে। বাহুমূল ধরিয়া ওকে উঠাইলাম। তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকে টানিয়া আনি। চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি উঁচু করিতেই দেখি তাহার সমস্ত মুখে একবিন্দু রক্ত নাই। সিক্ত চক্ষুর পল্লব দুটি নিমীলিত। একফালি তন্দ্রালু চাঁদের আলো আসিয়া পড়িল তাহার সে মুখে। কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর ম্লান আলোক! কে বলে অনুরাধার রূপ নাই! রূপ কি কেবল লালসার ইন্ধন? অস্তরবির শেষ আশীর্বাদ লইয়া বর্ষণোন্মুখ সায়াহ্নের মেঘ যেমন জলের ভারে পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়িবার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুণে—তেমনিভাবে ফুলিতে থাকে আমার বুকের কাছে অনুরাধার অশ্রুভারনম্র আনত মুখখানি। একটু আকর্ষণ করিলেই যেন ভাঙিয়া পড়িবে। তাহার আনত আঁখির পল্লবে হৈমন্তী প্রভাত-শিশিরবিন্দুর মতো সূক্ষ্ম জলকণা।

ধীরে ধীরে একটি সত্য যেন সেই মুহূর্তে আমার নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিল! মনে হইল যে পথে ছুটিতেছিলাম সেটা ভ্রান্ত পথ। এ অসম্ভব প্রয়াস আর করিব না। পূর্ণকুম্ভ তো রহিয়াছে আমার গৃহকোণেই—তবে আর কেন মিথ্যা মৃগতৃষ্ণিকার মোহে অন্ধের মতো ছুটাছুটি করিতেছি। অনুরাধা স্ত্রীলোক, সে দুর্বল—তাহাকে আমার পথে টানিয়া আনিবার এ সঙ্কল্প কেন ত্যাগ করি না? আমি কেন তাহার পথে চলিতে শিখি না? অনুর অপূর্ণ অংশটাই বা কেন আমার নিকট বড় হইয়া থাকিবে—যাহা পাইয়াছি তাহা লইয়া কেন ধন্য হই না? অপর নারীর প্রতি আমাকে আসক্ত জানিয়াও এই যে আমার প্রতি একনিষ্ঠ রহিয়াছে এই কি তাহার প্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে? নিয়ন-আলোর ঔজ্জ্বল্যটা অধিক, কিন্তু আরতির প্রদীপের শান্ত দীপ্তি সে পাইবে কেমন করিয়া?

অস্ফুটে বলিলাম—তুমি আমাকে ক্ষমা কর অনু! আজ থেকে অবসান হোক আমাদের দুঃস্বপ্নের। দেখ, আর তোমাকে কোনো কষ্ট দেব না। তোমাকে নিয়েই তৃপ্তি পাব আমি।

—কিন্তু মনু?

—মনু? হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠি। সব কথাই ওকে খুলিয়া বলিতে আর কোনো লজ্জা, কোনো সঙ্কোচ অনুভব করি না। ওকে বুঝাইয়া বলিলাম, মনুকে আমি ছোট বোনের মতোই দেখি। তাহার সহিত আমার সম্পর্কটা অনু-সুবিমলের সম্বন্ধের মতোই পবিত্র। স্ত্রীর মনে ঈর্ষা সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যেই যে মনুকে লইয়া খেলা করিতেছিলাম—সে কথাও স্বীকার করি।

ওর চোখদুটিতে বিশ্বাসোন্মুখ প্রাণের প্রতিচ্ছায়া—বলে—সত্যি বলছ?

—এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি!

এই তো অবনীমোহন। উন্নতি হইতেছে দেখিতেছি! তুমি তোমার ধর্মপত্নীর ভাষাতে কথা বলিতেও শুরু করিয়াছ ইতিমধ্যে! এত দ্রুত পরিবর্তন! মনে মনে হাসিলাম। অনু বিশ্বাস করিল। তবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কিন্তু ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

হাসিয়া বলি—না, বাসে না। ও তোমার ভুল ধারণা।

অনু দৃঢ়স্বরে বলে—না ভুল নয়। আমি স্থির জানি। মেয়েদের চোখ এ বিষয়ে ভুল করে না।

সমস্ত শরীরে একটা শিহরন বহিয়া যায়। সত্য না কি? একচক্ষু হরিণের মতো শুধু অনুর উপরেই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছি; বিপদ যে অন্য পথেও আসিতে পারে একথা ভাবি নাই। কিন্তু তাহা কখনও সম্ভব? কখনই নহে। মনামী এ যুগের মেয়ে, পুরোপুরি আধুনিক। বহু পুরুষের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে। তাহার মন পাথরের মতো কঠিন। আমার দু-একটা আঁচড়ে সেই লৌহকঠিন মনে কোনো আঘাত লাগার সম্ভাবনা নাই।

তবু সাবধানের মার নাই, বলিলাম—কাল তা হলে মনুকে কলকাতা পাঠাই?

—সেই ভালো। ঠাকুরপোকেও বাড়ি যেতে বলি এবার।

আমি হাসি—না। তোমার ঠাকুরপোর বাড়ি যাবার আর দরকার নেই।

—তা হোক। আমরা দুজনে না-হয় ছুটিটা একাই কাটাই।

—দুজনে একা একা? তা বেশ, কালই তাহলে মনুকে কলকাতায় রেখে আসব।

—তোমার যাবার আবার কী দরকার? ও তো একাই যেতে পারে।

—তা হয়তো পারে, কিন্তু সেটা খারাপ দেখাবে। তাছাড়া আমারও কলকাতায় কয়েকটা কাজ আছে।

অনু আমাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরে—ওগো না, আমি আর কিছুতেই ওর সঙ্গে তোমাকে যেতে দেব না।

ও আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ওর দোষ নাই। কিন্তু সে কথায় কান দেওয়া চলে না। মনুকে আমিই রাখিয়া আসিব; তাহাকেও কয়েকটা কথা বলা দরকার। কৌশলে তাহার মনটা বুঝিয়া লইতে হইবে! সম্ভবত সে মনে কোনো দাগ পড়ে নাই; যদি পড়িয়া থাকে দুটি মিষ্টি কথার প্রলেপে সে দাগটি এখনই মুছিয়া ফেলা দরকার। আজ হইতে আমাদের দাম্পত্যজীবন নূতন পথে চলিবে; অনুর কোনো অপূর্ণতা কোনো অভাবকেই আর আমি স্বীকার করিব না। যাহা পাইয়াছি, তাহাই শান্ত মনে গ্রহণ করিব। যাহা পাই নাই তাহার কথা মন হইতে চিরবিসর্জন দিব!

ওর মাথায় হাত বুলাইয়া বলি—সব ঠিক হয়ে যাবে। এবার ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীটি।

—কিন্তু ঘুম যে আমার আসছে না!

অনু আমাকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরে।

শিহরিয়া উঠি। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে সেই আদিম সমস্যার কথাটা।

নূতন পথে চলিবার উপক্রম করিতেই দেখি সে পথের সম্মুখে রহিয়াছে অনড় পর্বত!

* * *

শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমি উঠিয়া পড়ি। অনু বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে থাকে। কাঁদুক। আমি ঘর হইতে বাহিরে আসিলাম! রাত্রি দুইটা বাজে! উপায় নাই—বাকি রাতটুকু আমাকে বাহিরের ঘরের ইজিচেয়ারে শুইয়া কাটাইতে হইবে! আজীবন ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। ভাগ্যকে আমি বিশ্বাস করি না। আজও তাহার নিকট নতি মানিব না। আমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। কালই যাইব। আমাকে সুখী হইতে দিবে না বলিয়া যেন এক অলক্ষ্যচারিণী প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছে। তার নির্দেশেই যেন অনু রাজি হয় না—ও সমস্যার সমাধানে। না হয় নাই হইল। ও পক্ষের এ ব্রহ্মাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত অস্ত্র আছে বৈজ্ঞানিকের তূণীরে। আমি তাহার সন্ধান রাখি। অন্তিমে জয় লাভ করিবই।

আজ অবশ্য তোমার নিকট নতি স্বীকার করিতেছি! হ্যাঁ, আমার জীবনে আরও একটি মিলনরজনী তুমি ব্যর্থ করিয়া দিলে বটে! কিন্তু এই আমার যুদ্ধাবসান নহে। হে অলক্ষ্যচারিণী! রাত্রি প্রভাতে তোমার এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিব—দেখি এ হার-জিতের খেলায় কে হারে, কে জেতে। নিয়তি, না বিজ্ঞান!

যাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাগুলি বলিলাম—সে কোনও প্রত্যুত্তর করে না। রাত্রিশেষের পাণ্ডুর চন্দ্রহাসে সে মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

এগারো

ফিরে এলুম। দিদিকে কিছু বলা হয়নি। ভালেই করেছি। তখন আমার মনটা ছিল চঞ্চল। স্পর্শকাতর। হয়তো সব কথা গুছিয়ে বলতে পারতুম না।

পারলেও সে-কথা হয়তো বুঝত না দিদি। তারও মনের সে অবস্থা ছিল না। পৌঁছেই একখানা চিঠি দিতে হবে দিদিকে। সব কথা স্বীকার করব অকপটে। ভেবেছিলুম চির-অপরাজিতা মনামী চ্যাটার্জীর এ ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাসটা গোপন করে রাখব। তা সম্ভব নয়। অন্তত একটি লোকের কাছে সব কথা স্বীকার করতে হবে। সে রাধাদি। কেন যে জামাইবাবুকে নিয়ে বেড়াতে যেতুম, গায়ে পড়ে

গল্প করতুম, তা বলতে হবে। বলতে নয়, লিখতে। হয়তো ওদের দুজনের মধ্যে আমাদের নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সেটা মিটিয়ে দিতে হবে। জামাইবাবুকে কিছু বলা সম্ভব নয়। প্রথমটা ভয় হয়েছিল সুবিমলকে বলা আমার শেষের কথাগুলো তিনি শুনেছেন বুঝি বা। কিন্তু না। তিনি শোনেননি কিছু। ট্রেনে ফেরার পথে কথাটা তুললুম।

—আজ সকালে আপনি আমার কয়েকটা কথা হয়তো শুনতে পেয়েছেন—

—কী কথা? কখন?

—যখন আপনি সুবিমলকে ডাকতে এলেন তখন।

—আমি তো শুনিনি কিছু! কী এমন কথা?

সামলে নিই নিজেকে। যদি নাই শুনে থাকেন তবে আর সে কথা তুলে লাভ কী? সত্যকে স্বীকার করার স্পর্ধা দেখাতে একটা চরমতম মিথ্যাকে যে প্রচার করেছি এটা তাহলে ওঁর অজ্ঞাত। বাঁচা গেল।

জামাইবাবু চলন্ত জানলার বাইরে চেয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ বলেন—কিন্তু হস্টেলে গিয়ে এ রকম হঠাৎ ফিরে আসার কী কারণ দেখাবে?

বললুম—হস্টেলে ফিরবই না আমি। শেয়ালদা থেকে সোজা হাওড়া গিয়ে পুরীর টিকিট কাটব।

—সে কী?

হেসে বলি—এবার ছুটিতে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে পুরীতেই যাবার কথা। ওরা দল বেঁধে গিয়েছে। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছিল। ঠিকানা তো জানাই আছে, ভাবছি হঠাৎ গিয়ে ওদের অবাক করে দেব।

জামাইবাবু বলেন—কিন্তু এভাবে স্টেশনে তোমাকে ছেড়ে যাওয়াটা—

প্রশ করি—আপনি কলকাতায় কোথায় উঠবেন?

—আমার এক বন্ধুর বাড়িতে।

—তাহলে চলুন কলকাতায় পৌঁছে কোথাও খেয়ে নিই। তারপর আমাকে একেবারে পুরী এক্সপ্রেসে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নেবেন।

জামাইবাবু তাতে রাজি হয়েছিলেন। আবার বলেন—আজ সকালবেলা তুমি চলে আসতে চাইলে কেন? রাত জেগে স্যুটকেস গুছিয়েই বা রেখেছিলে কেন?

আমি একটু কৌতুক করে বলি—যদি বলি আপনাদের দুজনকে একটা অপ্রিয় কথা মুখ ফুটে বলার বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিতে?

জামাইবাবুর মুখটা লাল হয়ে ওঠে। কী যেন বলতে যান। বাধা দিই। বলি—ঠাট্টাও বোঝেন না? এত বেরসিক কেন?

উনি ম্লান হাসেন। আবার চুপচাপ। দুজনেই বুঝি, বেশি কথাবার্তা না চালানোই ভালো। যা ঢাকা আছে তা থাক না প্রচ্ছন্ন। কাজ কি তাকে নাড়াচাড়া করে?

আমি জানতুম, কলকাতার সেই হস্টেলের পরিচিত পরিবেশটা এখন আমার ভালো লাগবে না। তার চেয়ে করবীদের ওখানে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ফুর্তিতে, হৈচৈতে কটা দিন ক্ষইয়ে দিতে চাই।

মনে আছে, সমীর বোস যেদিন মৃণালকে প্রত্যাখ্যান করে, সেদিন সারারাত সে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। সিলি! মৃণাল আমার রুমমেট। অতসী অত ভালো ছাত্রী, যে বছর অমূল্যবাবুর বিয়ে হল, হতভাগী সে বছর ফেল করল কেঁদে কেঁদে। আমি কাঁদবও না, ফেলও করব না। খাব, দাব, নাচব, বেড়াব। এই দশটা দিন জীবনের ইতিহাস থেকে মুছে দেব। একমাত্র সান্ত্বনা একথা কেউ জানে না। না, সুবিমলও নয়; তার কাছেও আমার লজ্জা নেই। ও যদি ঘুণাক্ষরেও জেনে ফেলত? তাহলে? তাহলে বোধহয় আত্মহত্যা করতে হত আমাকে। কী লজ্জা! বাঁচা গেল। কেউ কোনদিন জানবে না মনামীও একজনকে ভালোবেসেছিল। আর সে তাকে ভালোবাসেনি! এই কথাটা ক্ষইয়ে দেব পুরীতে। সমুদ্রসৈকতে ছুটোছুটি করে, দৌড়ে, সমুদ্রস্নান করে। কেউ ধরতেও পারবে না। মনামী চ্যাটার্জী যা ছিল তাই থাকবে চিরকাল।

কিন্তু! স্বীকার করতেই হবে একজনের কাছে। রাধাদি! তাকে লিখে দেব—একথা যেন কাউকে না জানায়। কাউকে না। না। জামাইবাবুকেও না।

যা ভেবেছিলাম তা কিন্তু হল না। আশ্চর্য! পুরীর সমুদ্রতীর বিস্বাদ লাগল। মনে হল, কী-এক নিরুদ্ধ অন্তর্জ্বালায় ঐ অশান্ত সমুদ্রটা দিনরাত্রি গুমরাচ্ছে। কী-একটা কথা বুঝি পাক খাচ্ছে ঐ বেদন-নীল বুকের সুগভীরে। সেকথা মুখ ফুটে বলার নয়। তাই ফুলে ফুলে উঠছে ওর অন্তরাত্মা। আছড়ে-আছড়ে বোবা কান্নায় আর্তনাদ করে উঠছে—সে কথা যে বলা যায় না!

ওরা দল বেঁধে সাগর-স্নান করে এল—আমি নিশ্চুপ বসে রইলুম পাড়ে। ওরা বালির ঘর বানায়, আর ভাঙে। ওখেলা আবার নতুন করে খেলব কেন? ওরা ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, কোনারক ঘুরে এল। অসুস্থতার অজুহাতে সঙ্গ এড়ালুম।

করবী বলে—তোর কী হয়েছে বল্‌তো মনু?

—কী আবার হবে?

—প্রেমে-ট্রেমে পড়িসনি তো?

—বিশ্বাস হয়?

—হয় না। তুই বলেই হয় না। কিন্তু লক্ষণগুলো তো ভালো ঠেকছে না।

সেদিনই স্থির করলুম পালাতে হবে পুরী থেকে। ওদের কাছ থেকে। নিজের এই মতিচ্ছন্ন মনের কাছ থেকে। এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাবে মনটা; এখানে আমি বেমানান। কলকাতার নির্জন সিঙ্গল-সিটেড কোণটা আকর্ষণ করতে থাকে। সেখানে ছুটিতে কেউ নেই, কিছু নেই। তবু কাঁদবার অবকাশ আছে। কী লজ্জা! আমি মনামী চ্যাটার্জি কিনা কোন গাঁইয়ার চিন্তায় এমন গুমরে গুমরে মরছি।

কিন্তু কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না। সব সময়েই মনে পড়ে ওর কথা। কী দেখে ভুললুম? কী ছিল ওর? কিছু না। না, ছিল। ওর ছিল সতেজ প্রত্যাখ্যান। সদম্ভ বীতরাগ। এটা অনাস্বাদিতপূর্ব। অনেকের অনেক কূজন শুনেছি। তারা ছিল সুলভ। তাই তারা মনে দাগ কাটেনি। এ দুর্মূল্য নয়—দুর্লভ। পাত্রবাজারের কষ্টিপাথরে কষলে ওর দাম অল্প। কানাকড়ি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কই বল, আর লক্ষ্মীর প্যাঁটরাই বল—খুঁজলে কানাকড়িটির সন্ধান পাবে না। সৌন্দর্যের চাবিকাঠি পেয়েছিলুম জন্মলগ্নে। সে চাবিতে অনেক আয়রন চেস্ট খুলে দেখেছি—জড়োয়া গহনা মণিমাণিক্য, মোটা পাশবুক দেখেছি। কিন্তু কানাকড়ির সন্ধান তো কোথাও পাইনি। রুপোকে যেমন ব্যঙ্গ করে কানাকড়ির ওই কানা চোখটা, লোকটা তেমনি ব্যঙ্গ করে গেল আমার রূপকে। অসহ্য! কোনওদিন ভুলেও আমার মুখের দিকে তাকায়নি। দেখেনি আমার দিকে চেয়ে।

না। ভুল বললাম। ও বলেছিল—হাজার লোকের মধ্যেও আপনাকে চিনে নেওয়া যায়। বলেছিল—আলো বলছে আলোরই চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু তুমি কি আলোর চেয়েও উজ্জ্বল? তোমার চোখে তো ধাঁধা লাগল না? সেখানেই ওর দাম। ও যদি চোখ তুলে আমার দিকে না তাকাত তাহলে অশ্রদ্ধাই হত আমার। বলতুম—জড়। সে সব লক্ষ্য করেছে। সব দেখেছে তার কবির চোখে। কিন্তু ধরা দেয়নি। হারেনি।

ও হয়তো বুঝতে পেরেছিল আঘাত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই ওকে কাছে টানছিলুম। ধনুকছিলার প্রেম যেমন তিরের প্রতি। ওকে ফাঁদে ফেলে অপমান করব বলেই প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিলুম। প্রেমে পড়ার অভিনয় করতে হয়েছিল। ও নিশ্চয় সেটা বুঝতে পেরেছিল। এতই যদি বুঝলে তবে বাকিটুকু বুঝলে না? দস্যু রত্নাকরের মরা-মরা জপমন্ত্রটুকুই শুধু শুনতে পেলে? কখন অগোচরে মন্ত্রের বদল হল তা কি আমিই টের পেয়েছি? যখন জানতে পারলুম, তখন সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এমনিই হয়। মোবারকের মৃত্যুদণ্ডের আদেশনামা জারি হবার আগে টের পায় না জেবউন্নিসা যে শাহজাদীরাও ভালোবাসে।

সেই রাত্রেই রাধাদিকে চিঠি লিখলুম। রাত অনেক হয়েছে। বাইরে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। অশান্ত সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন গোঙানির আওয়াজটা ভেসে আসছে। আর আসছে একটানা একটা জোলো হাওয়া। অশ্রুজলের মতো ভিজে লোনা হাওয়া। করবী ঘুমোচ্ছে পাশের খাটে। কী নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছে ও। দীর্ঘ পত্র লিখে চলি পাতার পর পাতা।

লিখলুম, তোমাদের ওখানে গিয়ে বিপর্যয়ই বাধিয়ে এলুম। ইচ্ছে করে নয়। ঘটনাচক্রে! তুমি হয়তো ক্ষমা করতে পারবে না আমাকে কোনোদিন। এ অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। জানি! তবু আমি বিশ্বাস করব, আশা করব, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। সর্বান্তঃকরণে। কারণ আমার বিরুদ্ধে তোমার যা অভিযোগ তার এক কণাও সত্য নয়। প্রমাণের প্রয়োজন হয় তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে। সত্য তার চেয়েও বড়। সে আপন মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত। তাই প্রমাণ দাখিল করতে না পারলেও সত্যটা মেনে নিও। আমার অনেক আচরণ তোমার চোখে দৃষ্টিকটু লেগেছে। তোমার অভিধানে সে আচরণের সংজ্ঞা—অপরাধ। আমার অভিধানেও ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করে না। তবে জেনে-শুনে এ অপরাধ কেন করলুম? এ প্রশ্নটার জবাবদিহি করতেই বসেছি।

বিশ্বাস কর রাধাদি, আজ যে কথা লিখছি তার একবর্ণ মিথ্যা নয়। শুনতে অবাক লাগবে, তবু এর প্রতিটি বর্ণ সূর্যোদয়ের মতো সত্য। তোমার চেয়ে বেশি হতভাগী আমি। আমার এত রূপ যদি ভগবান না দিতেন, তোমার মতো লেখাপড়া না শিখতে পেলেও আমি খুশি থাকতুম—যদি তোমার মতো ভালোবাসা পেতুম। আমার নির্লজ্জতা মাপ কর। আমি সত্য কথা লিখব বলে বসেছি। সত্য স্বতই নগ্ন। যত মন্দ হই, যত নির্লজ্জতাই প্রকাশ পাক, যেন মিথ্যাবাদী বোলো না আমায়।

তোমাকে আমি হিংসে করি। রাগ করলে? আমার উপায় নেই। কেন করি জান? তোমার সৌভাগ্যকে। কানাকড়ির বিনিময়ে তুমি মানিক সওদা করেছ! ভগবান তোমায় দিয়েছিলেন কানাকড়ি—দুনিয়ার হাটে এসে নিয়তির খেয়ালে তাই দিয়ে তুমি কিনে ফেললে সাতরাজার ধন মানিক। আর আমি? আমি মানিক হাতে হাটে এলুম। তার বদলে কানাকড়িটাও কিনতে পারলুম না!

জানি না সব কথা বুঝছ কি না। দোহাই তোমার, ভুল বুঝ না। তোমার কর্তাটিকে সাত রাজার ধন মানিক বললুম, তার মানে এ নয় যে, সেই মানিক পাওয়ার বিন্দুমাত্র লোভ আছে আমার। ও মানিক তোমার। তোমার আঁচলেই বাঁধা থাক। আমি চেয়েছিলুম কানাকড়ি। তাও পেলুম না।

পাকা হাটুরে আমি। কেনা-বেচার অভিজ্ঞতাও আছে। রাগ কর না শুনে যে, অনেক হিরে-জহরৎ ডান হাতে কিনে বাঁ হাতে বেচেছি। এ-হাটের ধন ও-হাটে! অনেক পাথর কুড়িয়েছি পথ চলতি সড়কে। সত্যি-মিথ্যে, আসল-মেকি যাচাই করিনি। খোলামকুচির মত ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছি। এও মানি, আসল মণিমুক্তোও নিগ্রহ সয়েছে আমার হাতে। কিন্তু আমি তো হিরে জরহত চাইনি। আমি যে খুঁজছিলাম পরশ-পাথর। যার নিজের কোন দাম নেই। যা অমূল্য। যার বাজার-দর সাত-পয়জার! অথচ যার পরশে লৌহ-কঠিন অন্তরের কলুষ যায় ধুয়ে। সোনা হয়ে ওঠে।

কিশোর বয়সে নিজের প্রেমে পড়েছিলুম। তখন যৌবন ভালো করে আসেনি দেহে-মনে। আয়নায় নিজেকে দেখতুম। হাসলে কেমন লাগে, ঘাড় বেঁকালে কেমন লাগে। পাশে চাইলে কেমন দেখতে হয়। বয়স বাড়ল। বুঝলুম—আয়নার মধ্যেকার ঐ মেয়েটার প্রেমে পড়া কিছু নয়। ওজন্যে আমার জন্ম নয়। সেই শুরু হল পরশ-পাথরের সন্ধান। ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে খুঁজে ফিরে এসে দেখি লৌহ-কঠিন মনটায় কাঁচা সোনার রঙ ধরেছে। আশ্বিনের সোনালি রোদটুকুর মতো আমার বর্ষণক্লান্ত মনের আঙিনায় কী যেন ঝিকঝিক করে উঠল! চমকে উঠলুম। কখন ছুঁড়ে ফেলেছি পরশ-পাথর? ক্ষ্যাপার দুর্ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু। কোন লজ্জায় ফিরে যাব—"ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশপাথর?" আমি যে টের পেয়েছি কোন পথের বাঁকে, কোন সড়কের ধারে তাকে ফেলে এলুম। কোন মুখ নিয়ে ফিরে গিয়ে দাঁড়াব তার কাছে?

আচ্ছা, ভক্ত যেমন ভগবানকে খোঁজেন—ভগবানও তো তেমনি ভক্তকে চান? তবে ভগবান কেন নিজেই এসে দাঁড়ান না ভক্তের দ্বারে? বলতে পার? পরশপাথর দুর্লভ, কিন্তু পাকা জহুরিই কি সুলভ? পরশপাথরও কি অহল্যার মতো উন্মুখ প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে না—কে তাকে চিনে নেবে বলে?

আমার অনেক কথার মানে বুঝবে না তুমি। না বোঝ ক্ষতি নেই। একটা সহজ কথা সোজা করে বল্‌ছি। অনেক পুরুষকে অনেকবার আমন্ত্রণ করেছি জীবনে। সেসব ছিল ছলনার আয়োজন। একজনকে আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে আমন্ত্রণ করতে চাই আমার জীবনের ভোগে। তোমার মারফত খবর পাঠানো যেত। পারলুম না। লজ্জায়। অভিমানে! তবে আর একজনকে এই সঙ্গে নিমন্ত্রণ করছি।

কথাটা জানিও তাঁকে। জামাইবাবুকে। আগামী ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তাঁর নিমন্ত্রণ রইল আমার হস্টেলে। জানি, অনেক দেরি আছে। তবুও ঠিক মনে রেখে অপেক্ষা করব সেদিন তাঁর জন্যে।

জানি না ক্ষমা করতে পারলে কিনা! প্রণাম নিও দুটি পায়ে....

* * *

রাত্রেই খামটা বন্ধ করে রেখেছিলুম। পরদিন সকালে প্রথম কাজ হল ওটা ডাকে দেওয়া। মুখ-হাত ধোওয়া হল না। বেরিয়ে পড়লুম! অছিলা তৈরিই ছিল—সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখব। চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে নিশ্চিত। মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল। পাছে দিনের আলোয় দ্বিতীয়বার পড়লে ছিঁড়ে ফেলি—তাই রাতেই খামটা বন্ধ করেছিলুম। ডাকবাক্সে না ফেলা পর্যন্ত যেন নিজেকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

কী যেন লিখেছিলুম? সব কথা মনে পড়ছে না। এটুকু মনে আছে ভাষাটা হয়েছিল দুর্বোধ্য। আবোল-তাবোল। হয়তো রাধাদি পড়ে মানেই বুঝবে না। চিঠিখানা যেন আর কাউকে না দেখায় সে কথাও লিখেছি? ঠিক মনে পড়ছে না। লিখেছি নিশ্চয়ই। তা না লিখে কখনও চিঠি শেষ করতে পারি?

জানতুম জবাব আসবে না। ও চিঠির মানেই বুঝবে না রাধাদি। জবাব দেবে কি? তবু মনে আছে চিঠির মাথায় পুরীর ঠিকানা লিখে দিয়েছিলুম। পরদিনই কলকাতা ফিরে যাবার কথা। কিন্তু হয়ে উঠল না। পরদিনও না। তারপরের দিনও কী-একটা বাধা উপস্থিত। পরে বুঝলুম, চিঠিটার জবাব পাবার দুরাশা আঁকড়ে পড়ে আছে পাগলা মনটা! নানান অজুহাতে যাওয়াটা তাই পিছিয়ে দিচ্ছি। আপনমনেই একা একা ঘুরে বেড়াই। সকালবেলা হানা দিই ডাকঘরে।

মনটা এ কী ক্ষ্যাপামি শুরু করল? সমুদ্রের ধারে নির্জনে বসে কী-সব উল্টোপাল্টা ভেবে চলি। হয়তো রাধাদি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখবে না। হয়তো চিঠিটার মানেই বুঝবে না। চিঠিখানা যখন পৌঁছাবে তখন, ধরা যাক, জামাইবাবু বাড়ি নেই। রাধাদি তৃতীয়বার চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে বলে উঠল—কী পাগল!

সুবিমল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। মুখ না ঘুরিয়েই বলে—কে পাগল, আমি না দাদা?

—তোমরা দুজনে তো বটেই, কিন্তু আমি বলছিলাম মনুর কথা। দেখ না, কী-সব হিজিবিজি লিখেছে। মানে বোঝা যায় না একবিন্দু।

যেন নিজের কোনো কৌতূহল নেই! শুধু বৌদির অনুরোধেই হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নেয়। পড়ে যায় সবটা। যে চিঠির অর্থ রাধাদির কাছে গ্রীক, ওর কাছে তা প্রাঞ্জল। রাধাদির কাছে যে কথাগুলো ছিল মূক, ওর কর্ণকুহরে তাই মুখর হয়ে ওঠে। কী যেন লিখেছিলুম আমি? সব কথা মনে নেই। তবু বেশ বুঝতে পারি, ও বুঝবে। হয়তো জবাব আসবে চিঠির। রাধাদির কাছ থেকে নয়। তবু আসবে উত্তর।

তাই কি ঐ ভাষায় লিখেছি? সত্যিই কি রাধাদিকে লিখেছি আমি চিঠিখানা? তাই কি রাতের লেখা চিঠিখানা খাম বন্ধ রেখেছিলুম, পাছে দিনের আলোয় সঙ্কোচ হয়। ছি ছি!

আরও দিনদশেক অপেক্ষা করলুম। কিন্তু বৃথাই। বুঝলুম জবাব আসবে না। পরাজয় পূর্ণ হল। মৃত্যু তো হয়েই ছিল। শ্রাদ্ধশান্তির পালাও চুকল। হয়তো না পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছে রাধাদি। অথবা পড়েছে! বুঝতে পারেনি। ফেলে দিয়েছে। কিম্বা হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে। হয়তো পড়েছে সুবিমলও। ঠোঁটের কোণটা বেঁকে গেছে। হয়তো বিদ্রূপ করে বলেছে—বেশ তো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঙলা লেখেন ভদ্রমহিলা। অতি আধুনিক পত্রিকাগুলোয় লেখেন না কেন? কাব্যজ্ঞান টনটনে। উপমান আর উপমেয়গুলো লক্ষ্য করেছ বৌদি? উনি পাকা জহুরি, আর ওঁর মনের মানুষ হচ্ছেন কানাকড়ি। উনি রূপের মানিক হাতে হাটে এলেন কানাকড়ি খরিদ করতে—আর কানাকড়ি ওঁর উঁচু নাকে ঝামা ঘসে দিল!....

হো হো করে হেসে ওঠে সুবিমল!

রাধাদি বলে—আসল ব্যাপারটা কী? কে ওর মনের মানুষ? কে নাকে ঝামা ঘসে দিল ওর?

ও হেসে বলে—বাদ দাও না! যত সব ফ্লার্ট!

*　　*　　*

কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে; এ আঘাত আমার প্রাপ্য। অনেক হতভাগ্যের মনে আঘাত দিয়েছি। আঘাত পেতে কেমন লাগে জানতুম না। জানলুম। এ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। এ অপমানের বোঝা বইতে সঙ্গীহীন নির্জন ঘরের আবছা আড়ালের দরকার। তল্পিতল্পা বাঁধি। পরদিনই কলকাতা। তখনও ছুটির অনেকটা বাকি।

হস্টেলে ফিরেই পেলুম একখানা ভারী খাম! প্রতীক্ষায় পড়ে আছে। হস্তাক্ষর অপরিচিত। খামটা খুললুম। বেরিয়ে পড়ে একটা দীর্ঘ পত্র। দীর্ঘতর। সুবিমল লিখেছে আমাকে। বুকের মধ্যে গুড়গুড় ক'রে উঠল। কাঁপতে থাকে হাতটা। মনে হল ঘরে বুঝি যথেষ্ট আলো নেই। সরে এলুম জানলার কাছে। চিঠিখানা মেলে ধরি। অক্ষরগুলো যেন নাচতে থাকে। কয়েকটা মিনিট কাটে। মনটা সংযত করি। তারপর পড়তে শুরু করি। কোনো সম্বোধন নেই সে পত্রে। জানি, ও কী লিখেছে! ঠিক জানি না। আন্দাজ করতে পারি। আমার মনের কথা ও নিশ্চয় বুঝেছে। না হলে এ দীর্ঘ পত্র লিখত না। এই তো প্রথম লাইনেই লিখেছে—'বৌদিকে লেখা আপনার চিঠিখানা এসে পৌঁচেছে।' এখনও 'আপনি'? এক লাইন পড়েই মুড়ে রাখি চিঠিটা। কেন একটা ছোট্ট সম্বোধন দিয়ে শুরু করল না চিঠিটা। ও তো জেনেছে আমার মনের কথা। আমাকে লেখা এই ওর প্রথম চিঠি। এর মুখবন্ধে কি একটা ছোট্ট সম্বোধন করতে পারত না সে? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে আমার। চিঠিখানা আবার মেলে ধরি। এক নিশ্বাসে পড়ে যাই—

বৌদিকে লেখা আপনার চিঠিখানা এসে পৌঁচেছে! আপনার পরিশ্রমটা বৃথা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সেটা তাঁর হাতে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আপনার চিঠি এখানে এসে পৌঁছাবার আগেই এ সংসারের সমস্ত বালাই নিয়ে আমার বৌদি চলে গেছেন চিরশান্তির রাজ্যে—যে দেশে স্বামীর উপেক্ষা সইতে হয় না, যেখানে রূপের তুলাদণ্ডে মনুষ্যত্বের বিচার হয় না, যেখানে অতিথি গৃহস্থের মুখের গ্রাস কেড়ে খায় না।

জানেন নিশ্চয়ই, আমার বৌদির আধুনিক শিক্ষালাভ ঘটেনি। তিনি আলোকপ্রাপ্তা নন, তিনি ছিলেন গতযুগের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙলার পল্লিবধূ। শেষ সময়ে তিনি এক অদ্ভুত বায়না ধরে বসলেন,—স্বামীর পদধূলি চাই। সেটা নাকি তাঁর অনন্ত যাত্রাপথের নিতান্ত প্রয়োজনীয় পাথেয়। আলোকপ্রাপ্তা কেউ শুনলে নিশ্চয়ই বলতেন—রিডিক্লাস! তাঁর স্বামী এদিকে তখন বিশেষ জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলেন অন্যত্র। কী কাজ, কোথায় কাজ, বিস্তারিত লেখা নিষ্প্রয়োজন।

স্বামী না থাকলেও দেবর ছিল। সাধ্যমতো সে চেষ্টা করেছিল তার সব-দিক-দিয়ে-ফুরিয়ে-যাওয়া বৌদিকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু জীবনীশক্তি ভিতর থেকে ফুরিয়ে গিয়েছিল তাঁর। বাঁচবার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বাঁচবার ইচ্ছা; সেটাই ছিল না তাঁর। ছিল মৃত্যুকে মাত্র কয়েক ঘন্টা ঠেকিয়ে রাখার বাসনা, যাতে ঐ পায়ের ধুলোটা এসে পৌঁছায়। ডাক্তার এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন পণ্ডশ্রম করছি আমরা। যাতে তাড়াতাড়ি ওঁর ভবযন্ত্রণার হাঙ্গামাটা চুকে যায়, তাই কলকাতা যেতে হল আমাকে—আমার পূজ্যপাদ দাদার পা থেকে এক খামচা ধুলো নিয়ে আসতে। আপনার হস্টেলের ঠিকানা সংগ্রহ করা গেল। জানতেম, মেয়েদের হস্টেলে তিনি নেই—তবু আপনার কাছে সন্ধান পাব আশা করা অন্যায় নয়। আপনার হস্টেলে এসে শুনি—ছুটি হবার পর সেই যে আপনি বেরিয়েছেন, আর ফিরে আসেননি। আপনাকে পৌঁছে দেবার নাম করে অধ্যাপক অবনীমোহন, যিনি আমার বৌদিকে বিবাহ করার অধিকারে আমার দাদা হয়েছেন—তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন এবং ফিরে আসেন নয়দিন পরে। খবরটা হয়তো বাহুল্য আপনার কাছে—তবু লিখতে হচ্ছে ভদ্রতাবোধে। আমার পক্ষে ধরে নেওয়া শোভন, এ সংবাদটা আপনার অজানা।

কলকাতায় আপনাদের দুজনকে সম্ভব-অসম্ভব বহু স্থানে ব্যর্থ সন্ধান করে যখন ফিরে এলেম তখন বৌদির শেষাবস্থা। আরও ঘন্টা ত্রিশেক বেঁচে ছিলেন। ইতিমধ্যে আপনার অথবা দাদার কোনো খবর এল না। হয়তো আপনারা দুজনেই কোনো কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তাই সংবাদ দিয়ে উঠতে পারেননি।

আপনার কতটা জানা আছে জানি না। ঘটনার পারম্পর্য না লিখলে ব্যাপারটা বোঝানো যাবে না। অধ্যাপকমশাই যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর শ্যালিকাকে কলকাতায় রেখে

আসতে যাচ্ছেন। পরেরদিনই তাঁর ফেরার কথা। তিনি যে আসলে শ্যালিকাকে নিয়ে পুরী যাচ্ছেন প্রমোদভ্রমণে, এটা অজানা ছিল তাঁর স্ত্রীর। পরদিন স্বামী ফিরে না আসাতে তিনি ব্যস্ত হলেন। অশিক্ষিতা সন্দেহবাতিক মেয়েমানুষের যেমন হয়;—কেঁদে ভাসালেন। বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে যান তার পরদিন। আমি শহরে ছিলাম, ছাত্রাবাসে। খবর পয়ে হাজির হই। ডাক্তার এসে ধমক দিলেন আমাকে। ওঁর হার্ট যে এত দুর্বল, মাসাধিক কাল বুকে একটা বেদনা বোধ করছেন, এটা নাকি আমার জানা উচিত ছিল। নিশ্চয় ছিল—আমি জানব না তো কে জানবে? তাঁর স্বামী, তাঁর বোন? যাই হোক—চিকিৎসাপত্র যেটুকু সম্ভব, করার ত্রুটি হয়নি। উপরন্তু কাজ হল দৈনন্দিন ডাকঘরে হাজিরা দেওয়া! আপনাদের দুজনের কারও একখণ্ড চিঠির প্রত্যাশায় আরও কটা দিন বেঁচে ছিলেন।

যাবার আগে বৌদি আমাকে দুটো কাজের ভার দিয়ে গেছেন। বৌদির কোনো আদেশ কখনও অমান্য করিনি। তাঁর শেষ অনুরোধ আমাকে বাধ্য করেছে আপনাকে এই চিঠি লিখতে; নইলে, বিশ্বাস করুন মনামী দেবী, আপনাকে চিঠি লিখবার মত রুচি আমার কোনোকালেই হ'ত না!

শেষ সময়ে বৌদির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। মুখটা নিচু করে বলি, কিছু বলবে?

চোখের ইঙ্গিতে জানালে—হ্যাঁ। বামুনদি আর নীরজাকে হাত নেড়ে চলে যেতে বললে। ওঁর শেষ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেম আমরা তিনটি প্রাণী, দুজন বেতনভুক পরিচারিকা, নীরজা আর বামুনদি, আর অন্নভুক আমি। ওঁর বাবাও সময়মতো এসে পৌঁছতে পারেননি।

বৌদি অস্ফুটে বলেছিল : মনুকে বল ঠাকুরপো, তার ওপর আমার একটুও রাগ নেই। ও ওঁকে ভালোবাসে—তার ওপর কি আমি রাগ করতে পারি? তাকে বোলো, আমার যা কিছু প্রিয় জিনিস, সব তাকে দিয়ে গেলাম—ওঁকেও, খোকনকেও।

চীৎকার করে বলতে যাই : এ আদেশ কর না বৌদি। অন্তত খোকনকে দিয়ে যাও আমাকে। বলতে পারলেম না। কিছুতেই সেই মৃত্যুপথযাত্রিণীকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি যে, এ-যুগের আধুনিকারা সব সইতে পারে—সতীনের সন্তানকে নয়। কিছুতেই বলতে পারলেম না—বৌদি, তোমার শাড়ি, গহনা, আলমারি, ড্রেসিং-টেবিল, তোমার সব শখের জিনিস, তোমার অধ্যাপক স্বামীকে দিয়ে যাও তাকে; শুধু খোকনকে দাও আমাকে। ওকে আমি মানুষ করি।

ওঁর বোধহয় কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, বললেম, আর কথা বল না বৌদি, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

হাসল। বলে, কষ্ট কিসের? এ তো দিব্যি যাচ্ছি। ওঁকে বোলো, আমাকে নিয়ে উনি সুখী হননি। উনি যেমনটি চান, আমি তা হতে পারিনি। মনু ওঁর চাহিদা মেটাতে পারবে, জানি তো। ওঁকে বোলো মনুকে বিয়ে করতে। এ আমার শেষ অনুরোধ।

মনামী দেবী, এই শেষ অনুরোধটা আজও পালন করা হয়নি। এই কাজটির ভার গ্রহণ করে আমাকে যদি মুক্তি দেন নিশ্চিন্ত হই। বর্তমানে অবনীমোহন অসুস্থ, এখনই কথাটা তাঁকে জানানো সম্ভব নয়। অথচ অপেক্ষা করার মতো সময় আমার নেই; এ বাড়িতে এক মুহূর্তও তিষ্ঠতে ইচ্ছে করে না। কাজটা আমার কাছে খুব কঠিন, অপ্রিয় কর্তব্য;—হয়তো অনেক সহজ আপনার তরফে। শুধু সহজেই নয়, আরও কিছু। দয়া করে এ উপকারটুকু করবেন আমার?

দাদা যেদিন ফিরে এলেন, সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। আমিই দরজা খুলে দিই! আমাকে দেখে চমকে ওঠেন উনি, বলেন : কী হয়েছে সুবিমল, তোমার বাবা....

আমি মহাগুরুনিপাতের অশৌচ পালন করেছিলেম। বৌদির মধ্যেই আমার না-দেখা মায়ের সন্ধান পেয়েছি আমি, মুখাগ্নিও করেছি সেই অধিকারে। বলি, বাবা ভালো আছেন।

—তবে, তাহলে এ কী চেহারা তোমার?

নীরজা এসে দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণে। ডুকরে কেঁদে উঠল সে। খবরটা শুনে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন উনি। জ্ঞান হতে দেরি হল। রক্তচাপ বরাবরই ছিল, ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে ভয় দেখালো। বাঁ হাত, বাঁ পা নাড়তে পারেন না, কথাও জড়িয়ে যায়। অবশ্য ক্রমশই সুস্থ হয়ে উঠছেন! এ অবস্থায় বৌদির শেষ ইচ্ছেটা তাড়াতাড়ি জানিয়ে কর্তব্য সমাধান করা সম্ভব নয়।

একদিন আপনি গর্ব করে বলেছিলেন—অধ্যাপক অবনীমোহন পুরুষমানুষ, আপনি কুমারী কন্যা, পরস্পরের প্রতি আপনাদের প্রেম সামাজিক অপরাধ নয়। কথাটা সেদিন বিশ্বাস করতে বেধেছিল। সে যাই হোক, একথাও আপনি বলেছিলেন যে, অবনীমোহন যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে সামাজিক

অধিকার নিয়ে আপনি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে রাজি। আজ অবনীমোহনের কণ্ঠনালী রুদ্ধ, তাই তাঁর আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন না আপনি। কলকাতা যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় একটা সপ্তাহ কাটিয়ে এলেন এ প্রশ্নটা তাঁকে করিনি—জিজ্ঞাসা করার রুচি ছিল না। কিন্তু আপনার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে হল—নইলে যে আমার মুক্তি হবে না। বললেন, সে পুরীতে আছে। বর্তমান ঠিকানা জানি না। তারপর এল আপনার চিঠি, কিন্তু যাঁর চিঠি তিনি নেই। তাই সেটা খোলা হয়নি। অবনীমোহন ফিরে এসেছেন, এতদিনে আপনারও পুরী ভ্রমণ শেষ হয়েছে অনুমান করে হস্টেলের ঠিকানাতেই এই চিঠি দিলাম।

চিঠি শেষ করার আগে প্রীতি, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা জাতীয় কিছু জানানোর একটা প্রচলিত রীতি আছে। অথচ কী বিড়ম্বনা দেখুন, ঘৃণামিশ্রিত একটা তীব্র বিতৃষ্ণা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতির কথা লিখলে অনৃতভাষণ হবে! আপনি তো কঠোর সত্যকে ভালোবাসেন—অন্তত সেদিন সেইরকম একটা কথা শুনেছিলাম মনে পড়ছে। আশা করি চলিত রীতি লঙ্ঘন করে হঠাৎ এভাবে চিঠি শেষ করায় কোনও অপরাধ নেবেন না। ইতি।

—সুবিমল

* * *

ট্রেন থেকে নেমে দেখি, সুবিমল দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। রওনা হওয়ার আগে একটা টেলিগ্রাম করেছিলাম। আমি নামতেই ও হাত তুলে ভদ্রতা বাঁচানো একটা আলতো নমস্কার করে। কুলি ডাকবার অছিলায় সেটা না দেখতে পাওয়ার ভান করি। ও যে আমাকে রিসিভ করতে স্টেশনে আসবে এটা আশা করিনি।

সেই স্টেশন চত্বর। এখানেই একদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। অশুভ লগ্নে। মাত্র কদিন আগে। আজ আবার সেখানেই দেখা হল। স্থান কাল পাত্র অভিন্ন। অথচ সবই বদলে গেছে। আদ্যন্ত। সেদিন ঐ লোকটা ছিল আলাপ করার জন্য উন্মুখ। চোখে ছিল মুগ্ধ মোহাঞ্জন। মনে অদম্য কৌতূহল। আজ সেই মানুষটি পাথরের মতো নিষ্প্রাণ! ঘৃণামিশ্রিত তীব্র অনীহা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নাকি ওর নেই। আর আমি? আমার পরিবর্তন? সেদিন অবজ্ঞাভরে দেখেছিলুম এক মুগ্ধ ভক্তকে। করুণার ভিখারিকে। আর আজ চোখ তুলে চাইতে পারছি না ওর দিকে! ঐ লোকটাকে আমি ভালোবাসি। আর কোনো ভুল নেই। কোনো সন্দেহ নেই। ঐ পাথরে-গড়া মানুষটার কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। সব কথা ওকে বলব। অকপটে। যদি সে হেসে ওঠে শুনে? যদি কৌতুক করে? ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে? সে হবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আর যদি সে সত্যই ক্ষমা করে আমাকে? বুঝব, সে আমার দুর্লভ সৌভাগ্য। ওকে আমার চাই। একান্ত করে চাই। উজাড়-করে-দেওয়ার সান্নিধ্যে চাই!

প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসি পায়ে পায়ে। কুলির পেছন পেছন। ও-ও। কলকাতার বাইরে এলেই একটা মুক্তির নিশ্বাস পড়ে! মুক্ত প্রকৃতি। আকাশটা কী নীল! মনটা খুশিয়াল হয়ে ওঠে।

—আপনি তাহলে এদের দায়িত্ব নিচ্ছেন তো?

বিরক্ত হই। এ কথাটা কি এখনই না বললে চলছিল না? এমন সুন্দর সকালে কি ঐ কথাটাই মানুষের মনে আসে? জবাব না দিয়ে রিকশা ডাকি। স্যুটকেসটা তুলে দিতে বলি কুলিকে। ওকে বলি—উঠুন।

পরমুহূর্তেই একটা শ্লেষাত্মক কড়া জবাবের জন্য প্রস্তুত হয়েই প্রশ্নটা করেছি আমি। তার জবাবটাও মনে মনে তৈরি করে রেখেছি। ও কিন্তু সেদিক দিয়েও গেল না। গম্ভীর হয়ে শুধু বলে—আমি তো যাব না।

—যাবেন না? মানে?

—মানে আপনি এঁদের দায়িত্ব নিচ্ছেন জানলে ডাউন ট্রেনে ফিরে যাব আমি। সেভাবেই প্রস্তুত হয়ে স্টেশনে এসেছি।

—ও!

আমার চোখদুটো জ্বালা করে ওঠে! প্রচণ্ড একটা কান্নার চাপে বুকটা যেন ফেটে যেতে চায়। দেবে না—ক্ষমাসুন্দর নতুন অধ্যায়ের সূচনাতেই ও ভেঙে দিল আমার তাসের ঘর!

একটুকরো কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, আমার ঠিকানাটা রাখুন। খোকনের দায়িত্ব নিতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত।

সমস্ত পুঞ্জীভূত অভিমান গিয়ে পড়ে ঐ কাগজের টুকরাটার উপর। কুচিকুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় ছেড়ে দেই।

রিকশাওয়ালাকে বলি—চল।

বারো

পুরা একটা বছরও কাটেনি।.....

অথচ এরই মধ্যে বৌদির মুখখানা আর ঠিকমতো মনে পড়ে না। এমনই হয়। একদিন মনে হত—ওদের সংসারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছি অচ্ছেদ্য বন্ধনে। রাধাবৌদির নশ্বর দেহটা যেদিন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সেদিন যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল জীবন। অথচ সেই বৌদির কথা এখন দিনান্তে একবারও মনে পড়ে না। দুরন্ত অভিমানে ওদের ত্যাগ করে চলে এসেছি একদিন। তারপর আর ওদের সংবাদ রাখিনি। মনামী কি দাদার সেবার ভার গ্রহণ করেছিল? সে যে বৌদির শেষ অনুরোধটা রাখেনি, এটা আন্দাজ করা শক্ত নয়। অবনীমোহনের প্রতি তার আচরণ দেখে মনে হত ওরা দুজনেই বুঝি পরস্পরের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। আমি জানি, ওটা সত্য নয়। সত্যিকারের ভালোবাসলে মনামী কখনও বৌদির চোখের সামনেই অমন হ্যাংলাপনা করতে পারত না। প্রেমের সংজ্ঞা সে কথা বলে না। সেটা ওদের চোখের নেশা। সে নেশা হয়তো—হয়তো কেন—নিশ্চয়ই ছুটে গেছে এতদিনে। ও বাড়িতে আর কোনওদিন যাইনি। খবর পেয়েছিলাম দীর্ঘদিনের ছুটি নিতে হয়েছে অধ্যাপকমশাইকে। নীরজার সঙ্গে একদিন পথে দেখা হয়েছিল—তার কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেল—নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে দাদা নাকি পশ্চিমে গেছেন। যাওয়ার সময়েও সেই মেয়েটি সঙ্গে ছিল। অর্থাৎ তখনও ওদের চোখের নেশার ঘোর কাটেনি ঠিকমতো!

তা যেন হল, কিন্তু আমার তো চোখের নেশা নয়। আমি কেন এ মূর্খামি করলেম? কথাটা অনেকদিন ভেবেছি মনে মনে—জবাব পাইনি। এইসব খুরওয়ালা লালমুখো প্রগতিচারিণীদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। ওরা কথায় কথায় চটুল ভঙ্গি করে, ইংরেজি বুকনি ঝেড়ে বিদ্যা জাহির করে, ওরা চায়ের কেটলির মতোই সরবে ফোটে—কদমফুলের মতো নীরবে ফোটে না। অথচ সব জেনে-শুনেই ওকে ভালোবেসেছিলেম!

কিন্তু ভালোবাসা কাকে বলি? যাকে কাছে পেতে চাই, যাকে আদর করতে চাই, যাকে মন উজাড় করে দিতে চাই—তাকেই তো? সে অর্থে কি মনামীকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছি কোনওদিন? ওর সঙ্গে কেমন যেন একটা গোপন প্রতিযোগিতা চলছিল আমার—ওকে শুধু হারিয়ে দিতে ইচ্ছে হত—তর্কে, ব্যবহারে। পীড়ন করতে ইচ্ছে হত। সে পীড়ন শুধু মানসিক নয়—রুজমাখা গালে টেনে চড় মারতেও ইচ্ছে হয়েছে কখনও কখনও। যৌবনভারে দেহটি হিন্দোলিত করে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে যখন দাদার হাত ধরে বেড়াতে যেত আর আড়চোখে তাকাত আমার দিকে—তখন ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে ধরি আমি ওকে, নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে গুঁড়িয়ে দিই ওর হাড়-পাঁজরা। ওকে জব্দ করলেই খুশি হতেম আমি—যেনতেনপ্রকারেণ! নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করেছি—এ আবার কী স্যাডিস্ট ভালোবাসা? তবু এ প্রেম! এই জন্যেই হয়তো প্রেমকে বলা হয়েছে বিচিত্রগতি। অনুকম্পার উৎসমুখ থেকে যদি প্রেমের ভগবতী নেমে এসে থাকে অবনীমোহনের প্রথম যৌবনে, তাহলে আমার জীবনে তা নেমে এল টেনে-চড়-মারার একটি বাসনা থেকে!

চড় অবশ্য মারিনি। মারিনিই বা বলি কেন, মেরেছি; হাতে নয়, কলমের মুখে। চড় মারা আর কাকে বলে?

কিন্তু নিজের কাছে আর কী লুকাব? যে আঘাত করেছি তাকে, তার চতুর্গুণ আঘাত পেয়েছি নিজে। সে কেড়ে নিয়েছে আমার রাত্রের নিদ্রা—দিনের শান্তি। নিরালায় কখনো মনের ক্যানভাসে আঁকতে বসেছি ওর ছবিটা! হঠাৎ সচেতন হয়ে চাবকে শাসন করেছি মনকে।

তবু আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে ওর কথা; তখন মনে হয় কোথায় কী যেন একটা ভুল হয়ে

গেছে। হয়তো যা জানতেম তা ঠিক নয়। ভাবতে ভালো লাগে—সেও আমার কথা ভাবে, সঙ্গীহীন অবকাশে তারও মনে পড়ে আমার কথা। আমার জীবনে সকালের আকাশে সূর্যাস্তের এই যে স্বর্ণাভা, আমার প্রেমের এই যে বর্ণচ্ছটা—এর সংবাদ সে পাবে না কোনওদিন। সে আছে একেবারে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে—একশ আশি ডিগ্রি লঙ্গিচ্যুড তফাতে। তাই এ সংবাদ সে জানে না; কিন্তু কে বলতে পারে হয়তো ওর জীবনের পূর্বগগনে এই একই সূর্যের উদয় হচ্ছে এখন। হয়তো অনুরাগের উদয়ভানু সে আকাশেও আঁকছে ওর অস্তদ্যুতির কনকাভা। কে জানে! আমাদের মাঝখানে এক কালরাত্রির ব্যবধান। বিপুলা এ পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে যদি হঠাৎ এই অস্তরবি চেপে ধরে ঐ বালার্কের হাত, তখন সে কী করবে?

ঘটনাটা ঘটল প্রায় একবছর পরে! একদিন অপ্রয়োজনীয় নোট, বাজে কাগজ, পুরাতন চিঠি সব ছিঁড়ে ফেলছি বসে বসে—ট্রাঙ্কের তলা থেকে হঠাৎ বার হল একটা ভারী খাম। বৌদির নাম লেখা। চিনতে কষ্ট হল না—এ খাম খোলা হয়নি। যাঁর উদ্দেশ্যে চিঠিখানি লেখা তাঁকে দেওয়া যায়নি, যিনি লিখেছেন তাঁকে ফিরিয়ে দেবারও অবকাশ মেলেনি। চিঠিখানা তাই এতদিন পড়ে আছে মুখ বন্ধ করে। ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়তে পারি না। জানি অন্যায়, তবু দুর্বার কৌতূহলকে রোধ করা গেল না। পরের চিঠি পড়তে নেই; কিন্তু এ চিঠি যাঁকে লেখা হয়েছে শুধু তিনিই নন, যে লিখেছে সে-ও আমার কাছে মৃত। একদিন যে মেয়েটিকে ঘিরে নানা স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠত—সে আজ অবলুপ্ত আমার জীবন থেকে। সুতরাং এতে আর অন্যায় কী? এত ভারী খামে কী লিখেছিল মনামী? খুলে ফেলি খামটা।

....বজ্রাহত হয়ে যাই চিঠিখানা আদ্যন্ত পড়ে। এও কি সম্ভব? মনামী অবনীমোহনকে কোনওদিন ভালোবাসেনি এটা বিস্ময়কর নয়, কিন্তু এই চিঠির পরকলায় ওর অন্তরের অনাড়ম্বর শুভ্র আলো রূপায়িত হল প্রেমের যে বিচিত্র বর্ণালিতে তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অভাবিত। আমার তরফ থেকে শুধু অবজ্ঞা আর উপেক্ষা পেয়ে সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অনেক দিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা মনে পড়ে। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সে-সব ঘটনার যেন অন্য একরকম অর্থ পাওয়া যাচ্ছে। ও কখনো আমাকে কাছে টেনেছে, কখনো দূরে ঠেলেছে; উপেক্ষা করেছে, প্রলুব্ধও করেছে। কখনো নির্জন অবকাশ খুঁজেছে, ভাতের থালা আগলে রেখে ডেকে পাঠিয়েছে নীরজাকে দিয়ে, কখনো সর্বসমক্ষেই করেছে বাঁকা ইঙ্গিতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। সবই সত্য, সবই আমার জানা। শুধু তার ভাষ্য ছিল ভুলে-ভরা। যখন দুরন্ত অভিমানে দূরে ঠেলত—মনে ভেবেছি রূপের দম্ভ। আবার যখন সুনিভৃতে কাছে টানত—ভাবতেম আমাকে প্রলুব্ধ করে অপমান করতে চায় বুঝি। আজ সঙ্গীহীন ঘরের এই আবছা-আঁধারে সেইসব স্মৃতির টুকরোগুলো ফিরে আসছে নতুন রূপ নিয়ে, নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে।

মনে আছে, একবার বাগান করার শখ হয়েছিল। পাশের বাড়ির বাগানে রঙবেরঙের মরশুমি ফুলের সম্ভার দেখে বৌদির ইচ্ছে হল কিছু সিজ্জন ফ্লাওয়ার লাগানোর। পরিচর্যার ত্রুটি হয়নি। জল দেওয়া, সার দেওয়া, গোড়া খুঁড়ে দেওয়া। রোজ সকালে ব্যগ্র হয়ে লক্ষ্য করেছি ফুল ধরেছে কিনা। আশপাশের বাগানে ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল, শুধু আমাদেরই চারাগাছেই কোনও কলি ধরল না। বৌদি রাগ করে বললে, তোমাকে ঠকিয়েছে ঠাকুরপো, যত জংলি বাজে গাছের বীজ দিয়েছে তোমাকে। শেষে পাশের বাড়ির মালি যখন ঝরা-ফুলের চারাগুলো উপড়ে ফেলতে থাকে তখন দেখা গেল আমাদের চারাগাছেও এসেছে অসংখ্য কুঁড়ি। তারা কিন্তু ফুটতে পেল না। বসন্ত তখন বিদায় নিয়েছে। চৈতালি ঘূর্নি হাওয়ায় কুঁকড়ে গেল গাছের পাতা। ফুটবার আগেই আমাদের এত সাধের ফুলগুলি ঝল্‌সে গেল।

সেই অপঘাত যেন আবার ঘটল আজ। জীবনে বসন্ত এল, ফুলও ফুটল, শুধু সময়টা সিন্‌ক্রোনাইজ করল না! জংশনে এসে বদলী করে যে ট্রেনটা ধরব—সেটা আগেই এসে ছেড়ে গেছে।

এই চিঠি লিখে কী মন নিয়ে প্রতীক্ষা করেছিল মনামী! ও হয়তো জানতো বৌদির গোপন উদ্দেশ্য। অনেক হাসি-রহস্যের ধারাপাতে ঝরে পড়েছে বৌদির মনের মেঘ। হয়তো ওর আশা ছিল—বৌদির হাত ঘুরে এ চিঠি আমার হাতেই এসে পড়বে। এ চিঠি সে কি সত্যিই বৌদিকে লিখেছিল? ঐ ভাষায়? শুধু সম্বোধনটা আমাকে নয় বলেই কি এ চিঠির মালিকানা থেকে আমি বঞ্চিত?

আর এ চিঠির কী উত্তর সে পেয়েছিল!

*　　*　　*

স্থির করলেম, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। চৈতালি ঘূর্নি হাওয়ায় প্রায় এক বছর আগে যে ফুলটি শুকিয়ে গিয়েছিল—তার বীজ হয়তো এখনও আছে অবিকৃত। নূতন করে যত্ন নিলে হয়তো আবার হবে অঙ্কুরোদ্‌গম। শুরু হল নূতন পথের অভিসার।

অনেক অন্বেষণ করে অবশেষে ওঁদের অনুসন্ধান পাওয়া গেল পশ্চিমের এক অখ্যাত পল্লিপ্রান্তে। বিচিত্র পরিবেশ! বড় লাইনের স্টেশন থেকে গাড়ি বদল করে খেলাঘরের রেলগাড়ি চেপে যেতে হয়। গ্রামের একদিকে শোন নদের বিস্তীর্ণ সোনালি আঁচল, আর পারে অড়হর খেত। সবুজ শস্যের কোল ঘেঁষে একফালি জল-চিক্‌-চিক্‌ নীল পাড়। বিরাট নদীর বাকিটা কাদাখোঁচার পদচিহ্ন-লাঞ্ছিত বালুর বিস্তৃতি। গ্রামের অন্যদিকে দিগন্ত-অনুসারী ধ্যান-স্তিমিত রোহিতাশ্ব পর্বত। এঁকে-বেঁকে ঢেউ তুলে গেছে চুনারের দিকে—কোনো দুর্নিরীক্ষ দিগন্তে। নদী-পাহাড়ের সযত্নলালিত একচিলতে ঝিমন্ত জনপদ। গম, অড়হর, ভুট্টা আর আখের খেতে মাঝে মাঝে মেটে ঘর। দেওয়ালে সাদা খড়িমাটির আলপনা—বাজুবাঁধা বলিষ্ঠ হাতের শিল্পপ্রয়াস। মনে হয় প্রাচীন অনার্য ভারতের সহস্রাব্দীর নিদ্রা এখানে ভাঙেনি। বিজ্ঞানের চেষ্টায় অবশ্য ত্রুটি নেই; প্রকৃতির এই শান্তিনিকেতনে মানুষ কী করে সন্ধান পেয়েছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রয়েছে চুনের সম্ভার। কেটে কেটে তুলছে ছোট ছোট ট্রলিতে। ঠেলে ঠেলে বোঝাই দেয় মালগাড়িতে। মাঝে মাঝে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পাখির দল আকাশে ওড়ে পাখা ঝাপটে। দূরদূরান্তে গড়িয়ে যায় আওয়াজটা—মিলিয়ে যায়। আবার শান্ত প্রকৃতি ঢুলতে থাকে আসন্ন ঘুমের আমেজে।

এখানকার চুনের কোয়ারির ম্যানেজার হচ্ছেন মিস্টার ত্রিবেদী। এককালে ছাত্র ছিলেন দাদার। অকৃতদার যুবক। তাঁরই তিন কামরার বাংলোতে আপাতত এসে বাস করছেন ওঁরা। খবরটা সংগ্রহ করেছি কলেজ থেকে! এখানেই ওঁদের বায়ুর পরিবর্তনের আয়োজন। আমি গিয়ে প্রণাম করতে একেবারে চমকে ওঠেন দাদা। বেশ বদলে গেছেন, আকৃতি এবং প্রকৃতিতে। কানের দুপাশের চুলগুলিতে পাক ধরেছে। রোগা হয়ে গেছেন যেন। হাত দুটি ধরে পাশে বসান। আমি এদিক-ওদিক চাইতে থাকি। মনামীও যে ওঁকে শুশ্রূষা করতে এখানে এসেছে এ খবর জেনেই এসেছি, কিন্তু তাকে দেখছি না কেন? প্রশ্নটা তুলতে সঙ্কোচ হয়! এদিকে দীর্ঘদিনের এত কথা জমা হয়ে আছে যে, দাদা কোথা থেকে শুরু করবেন, তাই যেন স্থির করতে পারেন না। বলেন, কেমন করে সন্ধান পেলে?

বলি, নিজের গরজে।

—তাই নাকি? বিয়ের নেমন্তন্ন করতে আসিসনি তো?

বললেম, ধরেছেন ঠিকই! এবার তো ফিরে যেতে হবে। আপনি গিয়ে না দাঁড়ালে যে কিছুই হবে না।

দাদা হাসেন; হাসিটা স্পষ্টই ম্লান। শেষ যেদিন ওঁদের সংস্রব ত্যাগ করে চলে আসি সেদিন তাঁকে কোনো কথা বলে আসিনি। বৌদির মৃত্যুদৃশ্যটি তখন ছিল মনের কপাটে কুলুপ এঁটে। যাওয়ার আগে তাই অধ্যাপক দাদাকে একটা সামান্য সম্ভাষণও করে যাইনি।

উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, বেশ যাব। কবে বিয়ে?

—তারিখ অবশ্য ঠিক হয়নি এখনও!

—শুধু পাত্রী স্থির হয়েছে, কেমন?

আমি সলজ্জে ঘাড় নেড়ে বলি, হ্যাঁ।

—এ খবরে সবচেয়ে যে খুশি হত সে নেই। আমাকে যেতে হবে বৈকি। যাব। তবে মনুকে রাজি করাতে হবে, সে ভার তোমার।

আমি মনে মনে হেসে বলি, নিশ্চয়ই, তাকেই রাজি না করাতে পারলে যে কিছুই হবে না। মুখে বলি, সে কই?

—শহরে গিয়েছে ফিরবে সন্ধ্যা নাগাদ।

শহরে যাবার একমাত্র রাজপথ খেলাঘরের প্যাসেঞ্জার গাড়ি। এখানে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। হাটে সব কিছুই পাওয়া যায়—চাল, ডাল, কুঁহড়া, বদি, রামতরুই, ভেলি গুড় আর মেঠাই। কিন্তু ডেংচি বাবুদের চাহিদা সব বিচিত্র যে। চাই গায়েমাখা সাবান, টুথপেস্ট, মাথার তেল। শহর থেকে এ-জাতীয়

জিনিস সচরাচর সরবরাহ করেন টি. টি. আই. বাবু। কিন্তু মনুর পছন্দ হয়নি এ ব্যবস্থা। বাজারের সওদার ব্যাপারে পরের ওপর বরাত দিয়ে অপেক্ষা করার মেয়ে সে নয়। অগত্যা মাসে একবার তাকে শহরে যেতেই হয়।

খোকনকে কোলে নিয়ে দাঁড়ায় বাচ্চা চাকরটা। ওকে কোলে নিতে যাই। খোকন আসে না। সে চেনে না আমাকে!

দাদার সঙ্গে গল্পগুজবে সময়ে কেটে যায় ক্রমে। ত্রিবেদী-সাহেব এখনও ফেরেননি অফিস থেকে। এখানকার জীবনযাত্রার কথা ওঠে। পাথর কেটে ওরা কেমন রুজি-রোজগার করছে। চুনের ব্যবসার কথা। আখের চাষ হয় পাহাড়ের সানুদেশে, নদীর কিনারে কিনারে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। সারা শীতকাল সারি সারি ওয়াগন চালান যায় ডালমিয়া নগরের চিনির কলে। দূরের ঐ পাহাড়টা হচ্ছে রোটাস। ওর মাথায় আছে রোহিতাশ্বের দুর্গ। হিন্দু আমলের দুর্গ। অনেক মূর্তি আছে। শেষ পাঠানরাজ সম্রাট শের শাহ্ নাকি ঐ কেল্লাটাকেই সংস্কার করে কাজে লাগান। এপাশের ঐ দলছাড়া পাহাড়টার নাম মুরলী। ওর ধারে-কাছে কোথায় বুঝি সালফারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ভূগর্ভে। নতুন সম্পদের সন্ধানে দিবারাত্র কাজ হচ্ছে। গাঁয়ের আশেপাশে বাঘের ডাক শোনা যায়। ময়ূর দেখা যায় গাছের ডালে। হরিণের পাল এসে শস্য খেয়ে যায়। বুনো শুয়োরের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে ওরা মাচায় বসে ক্যানেস্তারা পেটে সারারাত।

আজেবাজে কথায় সময় কেটে যায়। বুঝতে পারি, মনামীর কথা, বৌদির কথা, আলোচনা করতে চান না বলেই এসব অবান্তর কথার অবতারণা করে চলেছেন তিনি একটানা। সন্ধ্যা এগিয়ে আসে শান্ত পায়ে। দাদা বলেন, সাতটার ট্রেন আসার সময় হল, নন্‌কু স্টেশনে যা।

নন্‌কু খোকনকে থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল। আমি বলি, তার চেয়ে আমিই ঘুরে আসি না কেন স্টেশন থেকে?

দাদা বলেন, না, নন্‌কুই যাক। ওর সঙ্গে হয়তো মাল আছে।

আমি বাধা দিয়ে বলি, মনামী যদি মালটা একা এতদূরে আনতে পারে, তবে বাকি পথটুকু আমরাই আনতে পারব। আমিই যাই।

দাদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী-যেন বলতে যান। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেন, বেশ যাও।

তখনই বেরিয়ে পড়ি। ছোট্ট স্টেশন। শহরের দিক থেকে একজোড়া ন্যারোগেজ লাইন পাহাড়ের দিকে যাবার পথে এই স্টেশনে এসে দুদণ্ড জিরিয়ে নিয়েছে। দেহাতি লোক আসছে একে একে। মাথায় পাগড়ি, কাঁধে কম্বল, হাতে লাঠি। কারও বা গায়ে মেরজাই। বাঁ হাতে ঝোলানো জুতোজোড়া স্টেশনের কাছাকাছি এসে ধুলো ঝেড়ে পায়ে দেয়। এটাই এখানকার রীতি। লোকালয়ের কাছাকাছিই শুধু জুতোজোড়া চরণাশ্রিত হয়। রেললাইনটাও এ নিয়ম মেনে চলে দেখছি। স্টেশন চত্বরের কাছাকাছি এসে সিঙ্গল লাইন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। লোকালয় পার হয়ে আবার দুজনে মিশে গিয়েছে এক হয়ে। দিনের আলো শেষ হয়েছে। আবছা চাঁদের আলোয় দেখি লোকজনের যাতায়াত। স্টেশনের রেলবাবুটি গলাবন্ধ কোটের ওপর কানঢাকা টুপি চড়িয়ে কাউন্টারে এসে বসেছেন : কাঁহা যাইব? তিলথুবাজার? সাড়ে তিন আনে।

দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা রঙা আলোর রেখা। জঙ্গলে আগুন দিয়েছে। আকাশে শুক্লা সপ্তমী কি অষ্টমীর চাঁদ। নৈঃশব্দ্যের চাদর মুড়ি দিয়ে দিগন্ত যেন ঝিমুচ্ছে। আকাশে তারার চুমকি। ঝোপে-ঝাড়ে জ্বলছে অসংখ্য জোনাকি।

ট্রেনটা এসে দাঁড়ায়। চারখানি মাত্র বগি। লোকজন ওঠা-নামা করে। তা নামুক, এখানেও একগাড়ি মেনকা-রম্ভা নামছে না। অনায়াসে চিনে নিতে পারি ওকে—আবছা আলোয়।

ওর পরনে একখানা সাদা শাড়ি, লাল পাড়। গায়ে পুরোহাতা সার্জের হালকা নীল ব্লাউজ। ক্লোক পরেছে তার ওপর। বাঁ হাতে একটা ব্যাগ—বাণিজ্যসম্ভারের প্রাচুর্যে সেটা উপচীয়মান। আমি হাত বাড়িয়ে বলি, ওটা বরং আমার হাতে দাও।

ও অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে। অন্ধকারে ওর মুখখানা ভালো দেখা যাচ্ছে না। তবু বুঝতে পারি, জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

বলি : কী দেখছ মনু অমন করে? ব্যাগটা আমাকে দাও।

এতক্ষণে বলে : তুমি!

ব্যাগটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমি চলতে থাকি। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো আমায় অনুসরণ করে। স্টেশনটা পার হয়ে লাইন ধরে বাংলোর দিকে পা বাড়াই। আবছায়া পথ, নির্জন, চুনাপাথর বিছানো। গ্রামটা রেললাইনের উল্টোদিকে। ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীরা তাই এ পথে কেউ আসেনি। স্টেশনের কলকোলাহলটা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। দুদিকে খাড়া চুনা-পাথরের স্তূপ—মাঝখান দিয়ে ট্রলি চলার সরু পথ। যেন দুনিয়া থেকে পথটা আমাদের দুজনকে আড়াল করে রাখতেই রূপ নিয়েছে। হঠাৎ পেছন থেকে মনু ডাকে : শুনুন!

এটাই প্রত্যাশা করেছিলেম মনে মনে। থেমে পড়ি। ও কয়েক পা এগিয়ে আসে, ব্যবধানটা কমে যায়। একটু দূরত্ব রেখে বলে, আপনি হঠাৎ এখানে এলেন কেন?

বনপথের আবছায়ায় ওকে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না—তবু মনে হল যেন বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে মনামী। আগের সেই উদ্ধত ভাবটা নেই—

ভিতর থেকে একটা বেদনা তাকে দুর্বল করে দিয়েছে। বললেম, তোমাকে নিতে এসেছি 'মন্‌আমি'।

—নিতে এসেছেন! মানে?

বোধহয় এমন একটা পরিবেশের অভাবেই কথাটা বলা হয়নি এতদিন। চার দেওয়ালের রুদ্ধ আবহাওয়ায় বোধহয় স্ফুরিত হবার অবকাশ পায়নি। এই মুক্ত প্রকৃতির আঙিনায়, এই আবছা আলো-আঁধারের প্রতীক্ষাতেই ছিল যেন নিরুদ্ধ কথাটা। ওর বেপথুমান কোমল করমুঠি গ্রহণ করে বলি : এ কথার তো একটাই মানে হয় মনু।

ও যেন পাথর হয়ে গেল!

'তুমি সুন্দর! আমি ভালোবাসি!'—এ দুটি কথা যুগে যুগে বলেছে মুগ্ধ মানব, কালে কালে শুনেছে রোমাঞ্চিত-তনু মানবী। কিন্তু এমন দুর্লভ পরিবেশ আসে কজনের ভাগ্যে? নীরব কটি মুহূর্ত শ্যামলী অন্ধকারের ঘোমটা টেনেছে, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো সলজ্জ চরণে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে। আকাশের লক্ষকোটি জানলায় আড়ি পেতেছে বধূমিতা তারার দল—দেখছে মিটমিটিয়ে এই মিলনদৃশ্য! মনে হল, এখানে এমন একটা কথা বলা দরকার যা এই সঙ্গীতের ঐক্যতানে অনায়াসে মিলে যায়। আমার হাতের মধ্যে পায়রার নরম বুকের মতো ওর হাতটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। আমি অস্ফুটে বলি : জীবনের পরম লগ্ন এমনি হঠাৎই আসে, মনামী। কোন পথের বাঁকে যে তার সাক্ষাৎ মিলবে তা কেউ আগে থেকে জানতে পারে না; কিন্তু যেই সেই পরম শুভক্ষণটি এসে হাজির হয় অমনি তাকে বরণ করে নিতে হয়।

যেন আপাদমস্তক শিউরে ওঠে ও। আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এসব আপনি কী বলছেন! আমি, আমি তো.....

আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলি : বৃথা চেষ্টা। তুমি ধরা পড়ে গেছ মনু। আর তো এড়িয়ে যেতে দেব না তোমাকে। পরশপাথর দুর্লভ, কিন্তু পাকা জহুরিই কি সুলভ? তোমার জীবনের ভোগে তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছ—অভিমান করে ফিরিয়ে দিলেও তো আর আমি ফিরে যাব না। আমি যে জেনে ফেলেছি—তুমি আমার, একান্ত আমারই!

একবার বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ও লুটিয়ে পড়ে আমার বুকে।

একটুকরো ছুট্ মেঘে ঢাকা পড়েছিল চাঁদটা। ঠিক সময় বুঝে সরে দাঁড়ায়। আবছা আলোয় হেসে উঠল চরাচর। আমি ওর মুখটা জোর করে আমার দিকে তুলে ধরে ডাকি : মনু? মন-আমি!

অস্ফুটে ও বলে : উঁ?

সৃষ্টির আদিম সন্ধ্যায় এমনি পরিবেশেই ধরা দিয়েছিল আদিমতমা নারী প্রথম পুরুষের বাহুবন্ধনে। ঝোপে-ঝাড়ে জ্বলছে লক্ষ-কোটি জোনাকি; আকাশে জ্বলছে অগুনতি তারা। এমন দুর্লভ লগ্নেই কণ্ঠলগ্না প্রিয়ার কর্ণমূলে বলা যায় সেই চির-নূতন চির-পুরাতন কথাটি। কিন্তু মন যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে তখন কথার ভারও সহ্য হয় না। কর্ণকুহরের বঙ্কিমপথ ত্যাগ করে তখন মনের গোপন কথার অভিসার হয় অধরোষ্ঠের সোজাপথে!

মনামী শিউরে ওঠে। ছিটকে সরে যায়! তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলে যায় বাঙলোর দিকে। মনে মনে হাসি। ধরা পড়ার লজ্জা। পরিপূর্ণ অন্তরে অনুসরণ করি তাকে।

বাঙলোর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার টেনে বসে আছেন দাদা। গায়ে গরম ওভারকোট। একজন ভদ্রলোকও বসে আছেন সামনের বেতের চেয়ারটা দখল করে। সম্ভবত ইনিই গৃহস্বামী মিস্টার ত্রিবেদী। মাঝখানে গোল টেবিলের ওপর জ্বলছে সবুজ শেড দেওয়া একটা সেজবাতি। আমাকে বোধহয় দেখতে পায়নি ওরা। মনামীকে আসতে দেখেই ত্রিবেদী বলেন, বৌদির আজকে কী কী বাজার হল?

বৌদি!

সেজবাতির আলোয় একঝলক দেখে নিই ত্রিবেদীর বৌদিকে। লালপাড় শাড়ির ঘোমটা মাথায়, সীমন্তে সিঁদুর, হাতে শুভ্র শঙ্খবলয়।

দাদার কয়েকটা কথা ভাসা ভাসা কানে আসে। সম্ভবত ত্রিবেদীর সঙ্গে তখন আমার পরিচয়-পর্ব চলছিল, কারণ ভদ্রলোক হঠাৎ হাত তুলে নমস্কার করলেন আমাকে। প্রতিনমস্কার করেছি কি? মনে নেই; আমি তখন লক্ষ্য করছিলেম মনামী বৌদিকে—দ্রুতপদে সে চলে গেল ভেতরে, প্রায় টলতে টলতেই!

আমার মনে পড়ল সেই কথা কটাই, জীবনে বসন্তও এল, ফুলও ফুটল, শুধু সময়টা সিন্‌ক্রোনাইজ করল না!

তের

সমস্ত জীবন ধরিয়া শুধু ভুলেরই ফসল বুনিয়া গেলাম! আশ্চর্য, আজীবন ভুলকে এড়াইবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে সজাগ রাখিয়া ফিরিতেছি। অনুরাধাকে সুখী করিতে পারি নাই; দুরন্ত অভিমান বুকে লইয়া সে চলিয়া গেল। হয়তো শেষ মুহূর্তেও সে আমাকে ক্ষমা করিয়া যাইতে পারে নাই। সে এই বিশ্বাস লইয়া বিদায় লইল যে, আমি তাহাকে প্রতারণা করিয়াছি—তাহার ধারণা আমি মনুর সহিত প্রমোদভ্রমণে দিন কাটাইতেছিলাম। এতদিন ভাগ্যকে স্বীকার করিতাম না, আজও অবশ্য করি না—কিন্তু কী আশ্চর্য যোগাযোগ!

মনামীকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আমি আমার চিকিৎসক বন্ধুর শরণাপন্ন হইলাম। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া সব ব্যবস্থা করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে বন্ধুর নার্সিংহোমে একটি সিট খালি পাওয়া গেল। পরদিন অনুকে সব কথা লিখিয়া আমি নার্সিংহোমে ভর্তি হইলাম। দিনকয়েক মাত্র ছিলাম সেখানে; অনুর জবাব না পাইয়া আমিই দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দিনসাতেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম আমার অলক্ষ্যে কী সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

মানুষের দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের অভিযান। কার্য-কারণের পাকা ইটের গাঁথনি যে বিজ্ঞানভবনের, দৈব-ভাগ্য-নিয়তি সেখানে অপাংক্তেয়। জোয়ারভাটা হইতে চন্দ্রগ্রহণ সবকিছুই দৈবের আওতায় ছিল একদিন—আজ বিজ্ঞানের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দৈবের রাজ্যসীমা সঙ্কুচিত হইতেছে। যাহা কিছু কার্য-কারণের সূত্রে গ্রথিত করিতে পারি না তাহাকেই আমরা কর্মফল ভাগ্য ইত্যাদি নামে অভিহিত করি। বস্তুত তাহা আমাদের জ্ঞানসীমার অতীত কিছু মাত্র। এ কথা চিরদিন বিশ্বাস করিয়াছি, আজও করি। কিন্তু অলক্ষ্যচারিণী কোনো এক নিষ্ঠুরার যেন কোনো কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। যতই তাহার জাল ছাড়াইয়া বাহিরে আসিতে চাই, ততই নূতন জালে জড়াইয়া পড়ি। অনুরাধা শল্যশাস্ত্রের নিকট হইতে হাত পাতিয়া বর্ম সংগ্রহ করিতে স্বীকৃত হইল না—মাতৃত্বের সম্ভাবনা হইতে নিজেকে চিরবঞ্চিত করিতে রাজি হইল না। তখন আমিই অগ্রসর হইয়া আসিলাম। পিতৃত্বের অধিকার হইতে নিজেকে চিরবঞ্চিত করিলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—নারায়ণী সেনা ধ্বংস করা আমার বৃথাই। কার্য-কারণের অতীত ঐ অদৃশ্য শক্তিটা—তাহাকে ভাগ্যই বল, দৈবই বল আর নিয়তিই বল—আমাকে ভুলাইয়া অন্যত্র সরাইয়া লইয়া গিয়াছিল! এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা বধ করিয়া আসিয়া দেখি সপ্তরথীর আক্রমণে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় একটি প্রাণ অকালে শুকাইয়া গিয়াছে। ডাকের গণ্ডগোলে অনু নাকি আমার চিঠি পায় নাই।

বুঝিলাম চূড়ান্তভাবে হারিয়া গিয়াছি।

তবু আত্মসমর্পণ করি নাই। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। রক্তচাপ ছিলই, অনুর মৃত্যুসংবাদে স্ট্রোক হইল। তিন-চার মাস শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিলাম। একেবারে শেষ হইলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু তাহা হইলে ও-পক্ষের তৃপ্তি হইবে কেন? আমাকে পঙ্গু করিয়া, অর্ধমৃত করিয়া জিয়াইয়া না রাখিলে যেন তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় না। অনুরাধা দুরন্ত অভিমান বুকে লইয়া চলিয়া গেল—সুবিমল সমস্ত সম্পর্ক মুহূর্তে ছিন্ন করিয়া দিল, যাইবার পূর্বে সামান্য বিদায় পর্যন্ত চাহিতে আসিল না। যেদিন মনামী আসিল; সেদিনই সুবিমল চলিয়া যায়। তবু ভাঙিয়া পড়ি নাই; চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলাম। নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। ঘরসংসার আর হইবার নহে—শুধু খোকনকে মানুষ করিয়া তুলিব। উন্নত মস্তকেই বহন করিব এ মহাবঞ্চনাকে—পরাজয় মানিব না।

ঈশ্বরকে কোনোদিন স্মরণ করি নাই। জীবনরহস্যের যে তীর্থপথের অভিযাত্রী আমি, ঈশ্বর সেখানে অসিদ্ধ— প্রমাণাভাবে! যতদূর মনে পড়ে, জীবনে একবার মাত্র ঈশ্বরের মন্দিরে মাথা নত করিয়াছি। সস্ত্রীক প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম আনন্দময়ীতলায়। কিন্তু সে প্রণামের মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। সে শুধু অনুরাধাকে ভুলাইবার জন্য একটা ছলনার আয়োজন।

আজও ঈশ্বরকে ডাকি না।

কিন্তু কী অদ্ভুত ঘটনার বিন্যাস! ঘটনাগুলি কাকতালীয়বৎ ঘটিতেছে, অথচ ঠিক যেন মনে হয়—অতি সুকৌশলী এক নাট্যকার একের পর এক দৃশ্যপটের পরিকল্পনা করিয়া চলিয়াছেন। মনামী আমাকে শুশ্রূষা করিতে আসিল। তাহাকে যেন চেনা যায়না। অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার। অনুরাধার মৃত্যুর সহিত সেও যে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে একথা বুঝিতে তাহার বাকি ছিল না। প্রথমাবস্থায় আমি শিশুর মতো অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সমস্ত দায় মনু নিজে গ্রহণ করিল। অভিজ্ঞ নার্সের মতো আমার পরিচর্যা শুরু করিল। তাহাকে নূতন রূপে দেখিলাম। আশ্চর্য দুনিয়া! এ প্রসাধন-লাঞ্ছিতা অতি আধুনিকতার অন্তরেও বাঙলাদেশের সেবাপরায়ণা একটি নারী যে এতদিন লুকাইয়া ছিল এ সত্য যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম। নিরলস অতন্দ্র সাধনায় সে তিলে তিলে আমাকে সুস্থ করিয়া তুলিল। সে যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। অপর্ণা উমার মতো সে যেন সাধনায় লীন হইয়া আছে। রোগশয্যায় অসহায়ভাবে শুইয়া শুইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতাম। তাহার স্বেদসিক্ত শান্তশ্রী মুখখানি অপূর্ব সুন্দর—কিন্তু আমি যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিতাম। কেন সে এমন প্রাণঢালা সেবার মধ্যে আত্ম-উৎসর্গ করিতেছে? সুবিমলকে একদিন অসতর্ক মুহূর্তে যে কথাগুলি মনামী বলিয়াছিল তাহা মনে পড়িত—অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিত।

অনায়াসে সে আমার গৃহস্থালির কাজকর্ম নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইল। কেহ তাহাকে সে ভার দেয় নাই—যেন আপন অধিকার মতোই সে সবকিছুই করিতেছে। কোথাও কোনো জড়তা নাই—এমনই স্বচ্ছন্দ তাহার পদক্ষেপ। এমন অধিকারবোধ কোথা হইতে পাইল সে?

অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া একদিন বলিলাম—এখন তো অনেক ভালো হয়ে গেছি, এবার তুমি বরং কলকাতায় ফিরে যাও। তোমাদের কলেজ তো অনেকদিন খুলে গেছে।

ও বলে—যাক। আমরা দু-একদিনের মধ্যেই কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি। ডাক্তারবাবু বলেছেন, কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় আপনাকে কিছুদিন নিয়ে গিয়ে রাখতে।

ডাক্তারবাবুর সহিত এ সকল পরামর্শ কখন হইয়াছে জানি না। আমি ব্যাপারটা তুচ্ছ করিতে চাহিলাম। মনু শুনিল না। বস্তুত এসকল বিষয়ে সে আমার সহিত কোনো পরামর্শ করাও প্রয়োজন বোধ করে না। হুকুমের সুরে একদিন ঘোষণা করিল—কাল আমরা রওনা হচ্ছি।

—কোথায়?

—বান্‌জারী।

—বান্‌জারী! সে আবার কোথায়?

শুনিলাম, আমার অসুস্থতার সময় যেসকল ছাত্র, বন্ধু, সহকর্মী ও প্রাক্তন ছাত্রেরা দেখা করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে ত্রিবেদীর সহিত সমস্ত ব্যাপারটি সে পাকা করিয়া ফেলিয়াছে। ত্রিবেদী কয়েক বৎসর পূর্বে আমার ক্লাসে পড়িত, বর্তমানে কোনো একটা লাইম-কেয়ারির ম্যানেজার হইয়াছে শুনিয়াছি।

মনু তারপর আমাকে এই পাণ্ডববর্জিত বান্‌জারী গ্রামে আনিয়া ফেলিল। তাহার প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি পদক্ষেপ আমি লক্ষ্য করিতাম। আশঙ্কা যথেষ্টই ছিল! অনুরাধার কথায় একদিন রাত্রে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলাম, পরদিন সকালে মনুর মুখ হইতেই এক অসতর্ক মুহূর্তে তাহার মনোভাব জানিতে পারি। এও জানি যে, মনু ঘরণী হইবার মেয়ে নহে; তাহার আকর্ষণে যে লুব্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিবে শিখাসন্ধানী পতঙ্গের মতোই তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অধুনা মনুর ভিতরে এই পতঙ্গলোভী শিখাটিকে আর দেখিতে পাই না। আমার সম্মুখে সে আজকাল আর দীর্ঘ সময় প্রসাধনে ব্যয়িত করে না। তনু-দেহখানি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে সাজাইয়া তুলিবার বাসনাটা প্রায় তিরোহিত। আগে কখনও সামনে আঁচল রাখিয়া এমন সাধারণভাবে তাহাকে শাড়ি পরিতেই দেখি নাই।

পুরাতন প্রসঙ্গটাই আবার একদিন পাড়িলাম—এখানে এসে আমি তো অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। আর কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে গিয়ে কাজে যোগ দিতে পারব। এবার তুমি বরং ফিরে যাও, কেমন?

মনু স্টোভে কী একটা জ্বাল দিতেছিল,—বলিল—আপনি আমাকে তাড়াবার জন্য ব্যস্ত কেন বলুন তো এত?

আমি হাসিয়া বলি—একদিন তো যেতেই হবে। এখনও ফিরে গেলে নন্‌-কলেজিয়েট হিসাবে পরীক্ষা দিতে পারবে। কেন তবে মিছিমিছি জীবনের একটা বছর নষ্ট করবে?

ফুটন্ত পাত্রটার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি মনুর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠে; বলে—জীবনের একটা বছর বাঁচাতে গিয়ে বাকি বছরগুলিকে খোয়ানোই কি বুদ্ধিমানের কাজ?

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট; না বুঝিতে পারার কোনো কারণ নেই। তবু না বুঝিবারই ভান করিতে হয়। আমি উপায়ান্তরবিহীন। মনুর সাময়িক খেয়ালের স্রোতে গা ভাসাইতে পারি না। হয়তো এটা তাহার সাময়িক খেয়ালও নহে;—খুব সম্ভব এ তাহার সুচিন্তিত অভিমত। অন্তর তাহার একনিষ্ঠ নিরলস সেবা—তাহার দেহ-মনের ঐকান্তিক পরিবর্তন, খোকনের প্রতি তাহার সুগভীর স্নেহ ঐরূপ একটি সিদ্ধান্তের দিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। কিন্তু সংসারী হওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভবপর নহে। শল্যচিকিৎসকের অস্ত্রে সে সম্ভাবনা চিরনির্মূল করিয়াছি।

তাই বলি—হাসির কথা নয় মনু, তুমি আমার জন্য যা করেছ তার প্রতিদান আমি কোনোদিন দিতে পারব না। কিন্তু তাই বলে এভাবে তো তোমার জীবনটা নষ্ট হতে দিতে পারি না। তুমি ফিরে যাও।

মনু অনেকক্ষণ পরে বলিল—বেশ, কিন্তু খোকনের কী হবে?

—হ্যাঁ, ওর একটা ব্যবস্থা করতে হবে অবশ্য।

—ওকে যদি আমি নিয়ে যেতে চাই, দেবেন?

—তুমি নেবে? সে কী করে সম্ভব?

—আপনার আপত্তি থাকলে তো অসম্ভব বটেই। নইলে নয়।

স্পষ্টতই সে অভিমান করিয়াছে। আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছি। তাহার মনের গোপন কথা না বুঝিবার কোনো কারণ নাই, তাহার আচরণে সে সবকিছুই বলিয়াছে। সুতরাং মনুর বিশ্বাস, তাহার সব কথা বুঝিয়াও আমি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি। কিন্তু আমি তো ক্রীড়নক মাত্র। বলিলাম—মনু, খোকন তোমার হাতেই মানুষ হয়েছে, ওকে ছেড়ে যেতে তোমার খুবই কষ্ট হবে। বুঝি সে কথা। কিন্তু একটু বুঝে দেখ লক্ষ্মীটি, ওকে কি চিরদিন তুমি আঁকড়ে রাখতে পারবে? আজ তুমি একাই স্থির করছ, দুদিন পরে এর জন্য তোমাকে অপরের অনুমতি চাইতে হবে। তোমাদের জীবনে হয়তো এটাই হবে বাধা।

মনু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর অঞ্চলের প্রান্তটা অহেতুক আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে অস্ফুটে বলিল—আর আমি যদি এমনই কাউকে জীবনের সঙ্গী করি যে খোকনকে আমারই মতো ভালোবাসে?

বুঝতে কিছুই বাকি থাকে না; তবু বলি—সে হয় না মনু, সে অসম্ভব।

—অসম্ভব? কেন অসম্ভব?

—কেন অসম্ভব তা বলতে পারব না। কিন্তু যা আশা করছ, তা হবার নয়; আমি তাতে রাজি হতে পারি না—তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো মনু উঠিয়া দাঁড়ায়—কী? কী বুঝেছেন আপনি?

—এ কথার অর্থ তো পরিষ্কার মনু। তাছাড়া খবরটা আমার কাছে নতুন নয়। অনেকদিন আগে তুমি সুবিমলকে জোর গলায় বলেছিলে, 'হ্যাঁ অবনীমোহনবাবুকে আমি ভালোবাসি, তিনি বিয়ে করতে চাইলে আমি রাজি আছি।' তোমার ধারণা, সেদিনের সে কথাটা আমি শুনিনি—কিন্তু সে ধারণাটা তোমার ভুল। তাছাড়া যে ঐকান্তিক সেবায় তুমি আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলে তাতেও প্রতিমুহূর্ত বুঝতে পেরেছি এই নিরলস সেবার উৎস কোথায় হওয়া সম্ভব। তোমার এতবড় ভালো-বাসাকে উপেক্ষা করতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। স্বীকার করি তোমাকেও আমি ভালোবাসি; কিন্তু ক্ষমা কর আমাকে—তোমাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে—এ কী, তুমি কাঁদছ?

মনু আমার কথার প্রত্যুত্তর করে নাই। উদ্‌গত অশ্রু সম্বরণ করিয়া সে ছুটিয়া পালায়। এছাড়া কিই বা সে করিতে পারিত? এভাবে ধরা পড়িয়া তাহার অন্তর লজ্জায়, ক্ষোভে, অনুশোচনায় বুঝি জ্বলিয়া যাইতেছিল। যে নারী গোপনে ভালোবাসে তাহার অনেক জ্বালা। বুকের পাষাণভার তাহাকে সঙ্গোপনে বহিতে হয়। প্রতিটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তাহাকে লুকাইয়া ফেলিতে হয়। যদি কখনও তাহার অন্তরতম কথাটি কেহ প্রকাশ্য আলোকে টানিয়া আনে তখন আর সে নিজেকে সামলাইতে পারে না। তদুপরি সেই মুহূর্তেই যদি তাহার সদ্যস্ফুট প্রেমের কুসুমটি তাহারই প্রেমাস্পদ পদদলিত করে, তখন অঞ্চলে চক্ষু ঝাঁপিয়া অন্তরালে যাওয়া ছাড়া তাহার গত্যন্তর কী?

কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়।

যে কোনো পুরুষ মনামীকে পাইয়া ধন্য হইবে। সে আমাকে ভালোবাসে, সে আমাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, সে আমার খোকনকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসে এবং সর্বোপরি আমিও তাহাকে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছি; তবুও আমি তাহাকে গ্রহণ করিবার অধিকার হারাইয়াছি। এও সেই অদৃশ্যচারিণীর এক কঠিন শস্ত্রপাত।

তিন-চারদিন সে আমার সম্মুখে আসিল না। কী করিয়া তাহার দিন কাটিত জানিতাম না। আমার ঔষধ, আমার পথ্য সকলই সময়মতো পাইতেছি, স্পষ্ট বুঝিতে পারি সে আমার চতুর্দিকেই রহিয়াছে—শুধু সম্মুখে আসে না! অবশেষে সে নিজেই একদিন আসিয়া ধরা দিল।

—কেন এটা অসম্ভব?

—আমি তো বলেছি মনু, কারণটা তোমাকে বলতে পারব না, কিন্তু তোমাকে বিবাহ করার অধিকার আমার নেই।

ও আমার খাটের পাশে বসিয়া পড়ে, বলে—এটাই বোধহয় বাকি ছিল জামাইবাবু। আপনার কাছে আজ স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে না—জীবনে এমন একদিন গেছে যখন আমার চতুর্দিকে দেখতে পেতুম উন্মুখ সতৃষ্ণ চাহনি! আমার কাছে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় পেলে ওরা লুটিয়ে পড়তে প্রস্তুত ছিল আমার দাক্ষিণ্যের দ্বারে। আর আজ আমি নিজে থেকে যার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াচ্ছি সেই ফিরিয়ে নিচ্ছে মুখ! কিন্তু এ দুর্বহ ভার যে আমি আর বয়ে বেড়াতে পারছি না জামাইবাবু!

অত্যন্ত ক্লান্ত লাগিতেছিল তাহাকে। আমি ওর মাথার উপর একটি হাত রাখিয়া বলি—এত হতাশ হয়ে পড়ার তো কিছু নেই মনু! যারা তোমাকে পেলে ধন্য হত তারা আজও তোমার পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। তুমি তাদের মধ্যে ফিরে গেলেই তা দেখতে পাবে।

—কিন্তু তাদের কাউকে তো আমি ভালোবাসিনি। তাদের নিয়ে কৌতুক করেছি, খেলা করেছি, কিন্তু ভালোবাসিনি। জীবনে একবারই মাত্র ভালোবেসেছিলুম, একজনকেই আমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলুম আমার জীবনে; কিন্তু সে আমার মুখের দিকে ফিরেও চাইলে না...

আমি ওর হাতদুটি তুলিয়া লইলাম। কী সান্ত্বনা দিব? তবু বলিলাম—সেও তোমাকে তেমনি ভালোবাসে; কিন্তু সে হতভাগ্য যে আজ নতুন করে জীবন শুরু করতে অক্ষম।

মনামী অনুরাধা নহে; লজ্জায় জড়সড়ো হওয়া মেয়ে সে নহে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তাহার। তারপর বলে—আপনার এ কথার কোনো মানে হয় না।

—কেন মানে হয় না?

—আপনি বাইওলজির প্রফেসর। এত সেন্টিমেন্টাল হওয়া তো আপনার সাজে না।

আমি হাসিয়া বলি—বাইওলজির অধ্যাপক বলেই বিবাহের বাইওলজিকাল কারণটা উপেক্ষা করতে পারি না।

—এ কথার অর্থ?

—অর্থটাই তো অনর্থ!

কিন্তু মনু কিছুতেই আমাকে এড়াইয়া যাইতে দিবে না। শেষ পর্যন্ত তাহাকে বলিলাম—পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাহাতে যে কোনো মুহূর্তে পুনরায় রোগের আক্রমণ হইতে পারে। এ রোগের দ্বিতীয় আক্রমণে বাঁচিবার আশা অল্প। সে ক্ষেত্রে খোকনের কী হইবে তাহা ভাবিবার কথা। মনু যুক্তি দেখায় খোকনের মা নাই, সে ক্ষেত্রে পিতৃহীন হইবার আশঙ্কা থাকিলে তাহাকে নূতন মায়ের আশ্রয়ে রাখিবার ব্যবস্থাই তো যুক্তিযুক্ত। হাসিয়া বলিলাম—কিন্তু নূতন মায়ের সঙ্গে যে নূতন ভাইও আসিতে পারে?

—এটাই কি আপনার একমাত্র আপত্তি?

—যদি বলি তাই?

—উত্তরে যদি সে বিষয়ে আপনাকে আগেই নিশ্চিন্ত করে দিই?

আমি বলি—ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা!

মনু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বড় পরিশ্রান্ত লাগিতেছিল তাহাকে। যেন সে একটা আশ্রয় খুঁজিতেছে। জীবনের ভার যেন সে আর বহিতে পারিতেছে না। ধীরে ধীরে বলিল—আমি জানতুম এই নিয়ে রাধাদির সঙ্গে আপনার মতের মিল হয়নি। রাধাদি আমাকে বলেছিল সে কথা। কেন যে আপনি সন্তান চান না তা অবশ্য বলেনি; কিন্তু তবু এই নিয়েই যে আপনাদের মতান্তর থেকে মনান্তর ঘটেছিল তা জানি। আমি প্রথমেই আপনাকে জানিয়ে রাখছি সন্তান আমি চাই না, চাইব না কোনওদিন।

অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এ আবার কী নূতন জালে জড়াইতেছি। মনুকে সব কথা বলা যায় না। তবু কিছু একটা বলা দরকার, তাই বলি—পুরানো কথা ঘেঁটে লাভ নেই মনু। অনুরাধার সঙ্গেই সেসব ইতিহাস শেষ হ'য়ে গেছে। কিন্তু এখন কেন নতুন করে সংসারের জালে নিজেকে জড়াইতে চাই না তা তো বুঝতেই পার। তুমি যা বলছ তা ক্ষণিক উত্তেজনায় অবিবেচকের মতো বলছ। তুমি জান না, আমি তো জানি—দুটি একান্তবাসী বিবাহিত নরনারীর ঐ অনিবার্য পরিণামকে এড়ানো যায় না। গেলেও সে বড় কঠিন পথ। শখ করে কেন এ পথে আসবে? আমার জীবনই না হয় বিড়ম্বিত, তোমার তো স্বাভাবিক জীবনযাপনে কোনো বাধা নেই।

মনু উদাসকণ্ঠে বলে—আর এভাবে নিজেকে বয়ে বেড়াতে পারি না! রক্তের মধ্যে নোঙর ফেলার ডাক শুনতে পাচ্ছি। নাই বা পেলুম স্বামীর ভালোবাসা, তবু আশ্রয় তো পাব। আমি একটু শান্ত হয়ে জিরুতে চাই শুধু।

—আজ হয়তো ঐটুকুই তোমার কাম্য; কিন্তু দুদিন পরে বুঝতে পারবে শুধু বিশ্রামে মানুষের মন ভরে না! সে ব্যাঘাত চায়, সে পরিশ্রমও চায়! নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম মেয়েদের মন ভরাতে পারে না—সে শিশুর জ্বালাতন কামনা করে, সন্তানের উপদ্রবের জন্য তার মনের অন্তরে থাকে গোপন বাসনা। 'মা' বলে কেউ কোনোদিন তোমাকে ডাকবে না—না, এত বড় বঞ্চনা আমি ঘটতে দেব না তোমার জীবনে।

মনু খোকনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে—সে দুঃখ আমার নেই। খোকনমণি আমার সে দুঃখ ঘুচিয়ে দিয়েছে! আমি তাকে পেয়েই মা হয়েছি।

শিশুকে বুকে চাপিয়া সে কোন দুঃখকে ভুলিতে চায়? স্নেহের অত্যাচারে সদ্য-ঘুমভাঙা খোকন মনুর বুকের মধ্যেই কাঁদিয়া উঠে।

চোদ্দ

পুরুষকে ভোলাবার, তাকে মোহিত করবার শক্তি আমার আছে—এটুকু জেনেই তৃপ্ত ছিলুম এতদিন। আর কিছু চাইনি। পরাজয়কে চিনতুম না। চারপাশে যাদের দেখতুম, তারা ছিল আমার রূপের পূজারী। অভ্যস্ত ছিলুম তাতেই। তারপর হঠাৎ চাকা ঘুরে গেল। বদলে গেল সব! মনে হল ফুরিয়ে গেলুম বুঝি! আমাকে উপলক্ষ্য করেই সর্বনাশ নেমে এল রাধাদির সংসারে। আমিই তার মৃত্যুর কারণ। ভাবলুম, যা গেছে তা আর ফিরবে না। যেটুকু বাকি আছে তাও না হারাই! জামাইবাবুর সেবায় আত্মনিয়োগ করলুম কায়মনোবাক্যে। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পরিচর্যার ফাঁক রাখিনি। প্রাণ ঢেলে সেবা করেছি। মনে মনে ক্ষমা চেয়েছি রাধাদির কাছে।

অত বড় মানুষটা একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছিল। শিশুর মতো। ওঁকে সেবা করতে গিয়েই কথাটা বুঝতে শিখলুম। পুরুষকে ভোলাবার জন্য নয়—তার সেবা করতেই মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি। কাদের ওপর বাণ নিক্ষেপ করে এসেছি এতদিন? ওরা এত অসহায়! বুঝলুম, হারিয়ে জেতা যায় না—হেরে জিততে হয়। এ সত্যটা এতদিন বুঝিনি। এ বোঝার ভুলই ক্রমে হয়েছিল ভুলের বোঝা।

কিন্তু পরশপাথর জীবনে দুবার আসে না! ঠিক সময়ে ঠিক সুরটি যদি না বাজল—তাহলে আর আশা নেই। আজ জেনেছি, ধরতে গেলেই ঠকতে হয়। ধরা দিতে গেলে সহজে ধরা যায়।

মাঝে মাঝে ভীষণ রাগ হত নিজের ওপর। কী এমন হয়েছে যার জন্য গুমরে গুমরে মরছি। প্রেম এ নয়, হতে পারে না। ওকে আমি ভালো করে চিনিই না। ওর প্রেমে এমন পাগলিনী রাই হব কোন দুঃখে? দানে আর গ্রহণে অনুরাগের অঙ্কুরোদ্‌গম। ওর সঙ্গে আমার স্বাভাবিক আলাপচারী হয়নি একদিনও। প্রেমকূজন তো স্বপ্নকথা। যে কটি কথা বলেছি আঙুলে গুণে বলা যায়। সব কটিই উষ্ণ-বাক্য বিনিময়। অনুরাগের উত্তাপ নয়। রাগের। তা হলে? অথচ গলার কাঁটা নেমে যাওয়ার পরেও যেমন খচখচ করে বাধে—তেমনি একটা ব্যথা যেন গিয়েও যেতে চায় না।

কোনওদিন একটা খবর নিল না সে। ভেবেছিলুম একদিন না একদিন নিশ্চয় জামাইবাবুকে চিঠি দেবে। অন্তত খোকনের খবরটাও নেবে! অর্থাৎ খোকনের খবর নেওয়ার অছিলাতেই নতুন করে যোগসূত্র স্থাপন করবে। সে চেষ্টা সে করল না। রাগের মাথায় ওর ঠিকানাটাও ছিঁড়ে ফেলেছি। ফলে শুধু হেরেই গেলুম নয়—হারিয়েও গেলুম।

জামাইবাবু বারে বারে বলেন ফিরে যেতে। কিন্তু ফিরব কোথায়? পড়াশুনা? কী হবে? মা সরস্বতীকে কবেই বা স্মরণ করেছি? শরণ নিয়েছি? কলেজটা তো ছিল একটা অ্যাম্‌ফিথিয়েটার। ধনীর দুলালীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেটা ছিল মল্লভূম। কেড়ে নিতুম সহপাঠিনীদের মুখের গ্রাস। খেতুম না কিন্তু। খেলায় হারজিত আছে। ভোগ নেই। এ যে খেলা! এ খেলার রসদ ছিল যথেষ্ট। ছিল তনুদেহ, স্তবকে স্তবকে। সেটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আর ছিল ব্যাঙ্কের এক খোপে। সেটা আমার বাবার আশীর্বাদ। কিন্তু শুধু দিলেই তো হয় না—নেবারও অধিকার থাকা চাই। তাই আশীর্বাদ আমার কাছে হয়ে উঠল অভিশাপ। যদি এত রূপ আমার না থাকত, এত টাকা না থাকত—তাহলে হয়তো আমার ইতিহাসটা এত করুণ হত না। হয়তো ট্যুইশানি করে ম্যাট্রিক পাশ করতুম। হয়তো কলেজে পড়ার সুযোগ হত না। নোঙর ফেলতুম কোথাও না কোথাও। কেরানি, ইস্কুলমাস্টার অথবা রেল-বাবুর বেড়া দেওয়া সংসারে! রাধাদির মতো হতুম সে সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। নিজস্ব ঘরকন্না। যত ছোটই হোক। মাসান্তে বাঁধা মাইনের একটা খাম পেতুম! ডাইনে-বাঁয়ে লগি ঠেলে, গলুইয়ের জল ছেঁচতে ছেঁচতে ফুটো খেয়া নৌকাটাকে নিয়ে এগিয়ে যেতুম এ মাসের পার থেকে ও মাসের ঘাটে। আগামী মাসের পয়লা তারিখের পারঘাটায়! তবু সে জীবন কাম্য। এমন আগাগোড়াই ফাঁকা নয়। ফাঁকি নয়।

এ স্বপ্ন এতদিন দেখিনি, আজ দেখছি। রাধাদির সংসারে অ্যাকটিং করতে এসে চোখ খুলেছে। কী পাইনি তার হিসাব মেলাচ্ছি! যে জীবনটাকে উপেক্ষা করেছি, ব্যঙ্গ করেছি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছি তুড়ি মেরে—আজ তারই জন্যে বুকের পাঁজরায় হাহাকার জেগেছে।

সরমার কথা মনে পড়েছে আজ। সরমা নন্দী। আমার হস্টেলের প্রতিবেশিনী। ঠিক পাশের বাড়ির। একতলার এককামরার অন্ধকূপের বাসিন্দা। আমার সঙ্গে ওর তফাত একতলা-দোতলার নয়। আসলে আশমান-জমিন্। তবু পরিচয় হল। আলাপও। ওর স্বামী বুঝি কোনও প্রেসের কম্পোজিটার। সরমার বয়স আর কত হবে—এই আমারই বয়সি। হয়তো দুচার বছরের বড়। অথচ দেখলে মনে হত— বুড়ি। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি! তিন চারটে বাচ্চা। রোগা-পটকা—টিংটিঙে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করত মেয়েটা। আমার দোতলা-ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যেত ওদের গৃহস্থালি! সেই গবাক্ষপথেই আলাপ। মেয়েটা ভরপেট খেতে পেত না। তবু হাসিটি লেগেই আছে। তেবাড়ানো গাল! বাচ্চাগুলো অষ্টপ্রহর বাদুড়ঝোলা ঝুলত ওর আঁচল ধরে! অবাক হয়ে ভাবতুম—ও হাসে কেমন করে? ঐ নরককুণ্ডটাতে মানুষ হাসতে পারে? মনে আছে একদিন সন্ধ্যায় ও আমাকে ডেকে পাঠাল। ডেকে পাঠাল নয়, ডেকে নামাল। নেমে এলুম দ্বিতল থেকে। গেলুম ওর অন্ধকূপের ঘরে। কেমন যেন গা ঘিনঘিন করতে থাকে। তেলচিটে মাদুর, ছেঁড়া কাঁথা। পাগলের চোখের তারার মতো ঘোলাটে ইলেকট্রিক বালব। পশমের

কাজ করা একটা শেলাই বাঁকা করে টাঙানো। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কাঁচটা ঝাপসা। রবিবাবুর কী একটা লাইন লেখা। কাঁচটা সাফ না করলে পড়া যাবে না। মনে হল কাঁচটা মুছলে নিশ্চয় দেখা যাবে রবিবাবুর নয়, দাস্তের একটি লাইন বুঝি লেখা আছে, ইংরেজিতে যা—'অ্যাবানডন অল হোপ ঈ হু এন্টার হিয়ার।'

কোথাও কিছু নেই একবাটি পায়েস এনে হাজির। আমি তো অবাক। সরমা বলে—আমার বান্ধবী তো কেউ নেই—তাই আপনাকে কষ্ট দেওয়া। আজকের দিনে তাই আপনাকে ডেকে পাঠালুম।

বললুম—কেন, আজকে কী?

সরমা হাসে। উঠোনের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। সেখানে লুঙ্গি-পরা ওর কম্পোজিটার-স্বামী নারকেলের ছোবড়া ছাড়াতে ব্যস্ত। তার মুখেও মিটিমিটি হাসি। সরমা বলে—আজ থেকে ঠিক আট বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

ওর বড় মেয়েটার জ্বর। কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মাথার কাছে দেওয়ালে একটা ফোটো—ওদের স্বামী-স্ত্রীর। সেই চিরাচরিত একজন-বসা একজন-দাঁড়ানো কম্পোজিসান। ক্যামেরাম্যানের ধমকে-ফোটানো আঁৎকে-ওঠা হাসিটা আট বছরেও ঝাপসা হয়ে যায়নি। লক্ষ হল ফোটোটার ওপর একটা বেলফুলের মালা উদ্বন্ধনে ঝুলছে।

মনে মনে সেদিন হেসেছিলুম। পায়েসটা গলাধঃকরণ করতে প্রাণান্ত। বিস্বাদ! মনে মনেই বলেছিলুম—প্রভু, তুমি ওদের ক্ষমা কর। এরা জানে না এরা কী বলছে, কী করছে!

আজ সেই কথাটাই মনে পড়ছে। ওর সঙ্গে জীবন বিনিময়ে নিশ্চয়ই আজও রাজি নই! কিন্তু অতখানি উপেক্ষা কি আজ করতে পারি তাকে? আজ যদি তার দশম বিবাহবার্ষিকীর নিমন্ত্রণ পাই? কী জানি! বিশ্বাসের জোর কমে গিয়েছে।

এতদিন ভাবতুম—সুবিমল নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। আর এও জানতুম তার ভুলটা ভাঙবে একদিন। সে ক্ষমা করবে আমাকে। আমার অতন্দ্র একনিষ্ঠ সেবা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তাই সেদিন যখন জামাইবাবু বললেন—'তোমার জীবনে যখন নূতন সাথি আসবে তখন খোকনকে নিয়ে কী করবে তুমি?' তখন অনায়াসে বলতে পেরেছিলুম, 'আমি এমন সাথিকে বেছে নেব যে আমারই মতো খোকনকে ভালোবাসে।' আমার স্থির বিশ্বাস ছিল ঐ খোকনের জন্যই সুবিমল আমাকে ডেকে নেবে। সেদিন দেখেছি তার রুদ্ররূপ। বিদ্বেষের আগুনে মদনভস্ম হতে দেখেছি। কিন্তু অপর্ণা উমার তপস্যা কখনও ব্যর্থ হতে পারে? রুদ্রদেবতা কি ভিখারির বেশে এসে দাঁড়াতে পারে না? উমার দ্বারে? অন্নপূর্ণার?

জামাইবাবু ভিতরের কথা জানতেন না। তিনি ভুল বুঝলেন। মারাত্মক ভ্রান্তি। প্রথম শুনে চমকে উঠেছিলুম। সামলাতে পারিনি। তারপর কেমন অবসাদ এল জীবনে। ক্ষতি কী? আলেয়ার পিছনে কেন ছুটে মরি? নোঙর ফেলার ডাক শুনতে পাচ্ছি রক্তের মধ্যে। বুঝতে পারি, সুবিমল আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। একবছর হতে চলল! সে আশা ত্যাগ করেছি। তবে আর সে মরীচিকার পিছনে ছুটি কেন? পরশপাথর জীবনে দুবার আসে না। প্রেমও। সুতরাং নিষ্প্রেম সংসারের কর্ত্রী হওয়াই আমার নিয়তি। তবে এই হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকাটা কী দোষ করল? একেই বাঁচাই না কেন? আমারই প্রগল্‌ভতায় এ সংসারের এ চরম দুর্দশা। তবু রাধাদি আমাকে ক্ষমা করে গিয়েছে। খোকনকে দিয়ে গিয়েছে আমাকে। ও আমাকেই মা বলে জানে। ওকে ছেড়ে যেতে সত্যিই পারব না আমি।

এতদিনের এত খেলার শেষ হল। কুমারী মনামী চ্যাটর্জীর অভিশপ্ত জীবনের হল অবসান। বেঁচে রইল খোকনের মা!

* * *

ডায়েরি লিখছি। গল্প নয়! তাই অসঙ্কোচে সব কথা লিখতে পারি। নইলে মনে হত কোনো দুঃসাহসী কাঁচা লেখকের লেখা এ এক অলীক কাহিনি। না হলে এই ঘটনার মাসছয়েকের ভেতরেই ফিরে আসে সুবিমল?

আর সে কী আগমন? সে যে আবির্ভাব! আমাকে কিছু বলতে দিল না। কিছু বুঝল না, শুনল না। কালবৈশাখী ঝড়ের মতো সে এল। অতর্কিতে অভিভূত করে ফেললে আমাকে। কিছু ভোলবার কিছু

গোপন করার অবকাশ পেলুম না। সে পড়ে এসেছিল শিলালিপি। আমার বুকের পাঁজরায় খোদাই করে লেখা শিলালিপি! অসঙ্কোচে টেনে নিল বুকে। আর তারপর—ছি-ছি। এই আচরণের ইঙ্গিতমাত্রে চড় খেয়েছিল একদিন শান্তনু সেন—মিস্ চ্যাটার্জীর হাতে। অথচ আজ মিসেস রায়ের হাত উঠল না। পালিয়ে এলুম কোনোক্রমে। হায় রে! পালাব কোথায়? পালাব কার কাছ থেকে?

উনি বলেন—সুবিমলের বিয়ে স্থির হয়েছে! ও আমাদের নিতে এসেছে মনু।

বুঝি সব। তবু অবাক হবার ভান করে বলি—তাই নাকি সুবিমলবাবু? কনগ্র্যাচুলেশন্স্। এ খবরটা তো এতক্ষণ বলেননি। কবে বিয়ে? কোথায়? কার সাথে?

সুবিমল হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে তাকায়। উঠে পড়ে! বলে—ঐ যাঃ, পাঁচটা বেজে গেল! বৈজুপ্রসাদ বোধহয় বেরিয়ে গেল এতক্ষণ।

বৈজুপ্রসাদের শিকারের নেশা। সুবিমল ওর পেছন পেছন অকারণে ঘুরে বেড়ায় বনে-জঙ্গলে।

উনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফেরার জন্য। সুবিমলের বিয়ে। মামা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। চল, গুছিয়ে কলকাতা ফেরা যাক। ত্রিবেদী ঠাকুরপোও সায় দেয় এ যুক্তিতে। আমি রাজি হয়ে যাই। আমি অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য কারণে সম্মত হলুম। সুবিমলের বিয়ে যে হবে না শীঘ্র, তা আমি বুঝেছি। আর কেউ না বুঝলেও। কলকাতা যেতে চাই ভিন্ন কারণে। এই পাড়াগাঁয়ে এ অবস্থায় পড়ে থাকা ঠিক নয়। আমি রাধাদি নই। ও ভুল আমি করব না। একেবারে প্রথম অবস্থাতেই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। তৃতীয় মাস চলছে। এই সময়টাই বিপদজনক। খবরটা উনি জানেন না। জানাইনি! জানি, এটা উনি চান না। এ নিয়ে রাধাদির সঙ্গে ওঁর মতের অমিল হয়েছিল। রাধাদি বিজ্ঞানের নির্দেশ মেনে চলেনি। আমি চলেছিলুম। কিন্তু কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল।—সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও। আমি মা হতে চলেছি! এবার ওঁকে বলা দরকার। জানি, শুনে খুশি হবেন উনি। না হবেন কেন? যে কারণে তিনি এটাকে এড়াতে চেয়েছিলেন—সে কারণটা নেই। উনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। আজকাল বাইরেও ঘোরাঘুরি করেন একটু-আধটু।

আমাদের কলকাতা যাওয়ার দিন স্থির হয়। বাঁধাছাঁদা সারা। স্থির করলুম এবার খবরটা ওঁকে বলতে হবে। আর লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়। আর লুকাবই বা কেন? আমি তো বুঝি। বিয়ের আগে বলেছিলুম—সন্তান চাইব না কোনোদিন, কিন্তু যে কারণে বলেছিলুম সে কারণটা যে এখন নেই! দানের আনন্দ কি কেবল গ্রহীতার? দাতার নয়? ওর মনে এ বঞ্চনার জন্য কোনো খেদ নেই? ক্ষোভ নেই?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যাওয়ার সময় ওকে যেন কেমন অন্যমনস্ক মনে হল। বললুম—তোমাকে এমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন?

বললে—ও কিছু নয়। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মনু?

—বল।

—তুমি কি আমাকে বিয়ে করে ঠকে গিয়েছ?

—একথার মানে?

—না, এমনই মনে হল কথাটা।

—না, তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। হঠাৎ এ কথা তোমার মনে হল কেন?

—আচ্ছা, তুমি কি....মানে সুবিমলের কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছে জান?

—না।

—তুমি যখন মাসতিনেক আগে কলকাতা গিয়েছিলে তখন কি তোমার সঙ্গে সুবিমলের দেখা হয়েছিল?

—না তো; কিন্তু এ কথা কেন?

—একটা জিনিস আমি বুঝতে পারিনি। সুবিমল তোমাকে আর আমাকে দায়ী করেছিল তার বৌদির মৃত্যুর জন্যে। যেদিন তুমি আসবে বলে 'তার' করলে, সেদিনই সে চলে যায়। তুমি জানো নিশ্চয়, অনুরাধার মৃত্যুর জন্য সে তোমাকেই দায়ী করেছিল?

—জানি। তাই কী?

উনি নিশ্চুপ। অন্ধকার। আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি। ওঁর মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। একটু চুপ

করে থেকে বললেন—তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই। তুমি অনু নও! সত্যি কথাটা সহ্য করতে পারবে। তোমার প্রতি সুবিমলের একটা দুর্বলতা লক্ষ্য করেছিলাম। একেবারে প্রথম অবস্থায়। তারপর সে অনুরাগ রূপায়িত হয়েছিল তীব্রতম ঘৃণায়। যেদিন তুমি ফিরে এলে, সেদিন দুঃসহ ঘৃণাভরে সে আমাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করেছিল। তোমাকে সত্যি বলছি মনু, হঠাৎ সেদিন এখানে যখন সুবিমল ফিরে এল, তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। ও তোমাকে স্টেশন থেকে আনতে গেল, আর আমি বসে বসে ভাবছিলাম—কেমন করে ওর এ পরিবর্তন হল! কী কারণে? একবার মনে হল, তুমি যখন কলকাতা গিয়েছিলে তখন তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে থাকবে।

আমি শুধু বলি—না, কলকাতায় ওর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। হলে, ফিরে এসে গল্প করতুম তোমাকে।

—চিঠিপত্রের কোনো আদান-প্রদান হয়নি?

হঠাৎ রাগ হয়ে যায় আমার। উঠে বসে বলি—কী বলতে চাইছ তুমি স্পষ্ট করে বলবে?

ও আমার বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করে। বলে—রাগ করছ কেন? সুবিমলের সঙ্গে তোমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়, অন্যায়ও নয়। তার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখিও এমন কিছু অমার্জনীয় অপরাধ নয়। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম—তোমার প্রতি ওর মনোভাবটা হঠাৎ বদলে গেল কেন?

আমি অবিচলিতভাবে বলি—দেখ, একটু আগেই তুমি বলছিলে যে আমি রাধাদি নই। কথাটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে কেন? সুতরাং ঠেস দিয়ে কথা বলে কোনো লাভ নেই।

ও বলে—তুমি আমার কথাটা সহজভাবে নিতে পারনি। আমি কিন্তু সরলভাবেই প্রশ্ন করেছিলাম। আরও পরিষ্কার করে বলছি। আমার মনে হয় সুবিমল তোমাকে ভালোবাসে। সে বোধহয় জানত না যে, তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। তাই নিজের বিয়ে স্থির হওয়ার সম্ভাবনা দেখে একবার শেষ সন্ধান নিতে এসেছিল।

—হতে পারে। সেটা আমার অপরাধ নয়।

—নয়ই তো। এমনকি কলকাতায় থাকার সময় যদি তোমার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকে—অথবা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়ে থাকে—তা হলে সেটাও অপরাধ হত না!

—না, সেটা অপরাধ হত। চিঠি লেখাটা নয়, লিখে তোমার কাছে না বলাটা। বিবাহিত জীবনের একটা কোড আছে, সেটা লঙ্ঘন করা হত।

—তাই নাকি?

হঠাৎ জ্বালা করে ওঠে আপাদমস্তক। মনে হল উনি বিদ্রূপ করলেন। শ্লেষ! আমার অতীত জীবনের প্রতি এ একটা কটাক্ষ। প্রাক্‌বিবাহ জীবনের অনেক গল্প করেছিলুম ওকে। নিজের ওপরেই রাগ হয়। এ কী ভুল করে বসেছি। মারাত্মক ভ্রান্তি! লোকটা যতদিন অসুস্থ অসহায় ছিল ততদিন তো বেশ ভালো লাগতো তাকে। যেই একটু শক্তি ফিরে পেয়েছে অমনি আঘাত করতে চাইছে। এজন্যেই কি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল রাধাদির জীবন? কী জানি!

বললুম—এ নিয়ে আর যে-ই বিদ্রূপ করুক—তুমি কর না। বিবাহিত জীবনের একনিষ্ঠতার বিষয়ে ব্যঙ্গটা তোমার মুখে মানায় না ঠিক।

এ তীক্ষ্ণ আঘাতেও আহত হল না লোকটা। হেসে বললে—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আমি করিনি মনামী। তোমার মনটা কোনো কারণে চঞ্চল আছে—তাই ভুল বুঝছ আমাকে।

চঞ্চল আছে! কোনো কারণে চঞ্চল আছে! অর্থাৎ সুবিমলের উপস্থিতি। এ অপমানের একটা কড়া জবাব দিতে যাই, কিন্তু তার আগেই ও বলে—তুমি বোধহয় অনুরাধার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করে আমাকে আঘাত দিতে চাইছ। আর কেউ না জানলেও—তুমি তো জানো—সে সময় আমি তোমার কাছে ছিলাম না।

—তা জানি। কিন্তু সে সাতটা দিন তুমি কার কাছে ছিলে তাও তো বলনি আমাকে। প্রশ্নটা যে তোমাকে কখনও করিনি তাও নয়। কিন্তু জবাবটা এড়িয়ে যাওয়াই সুবিধাজনক মনে করেছ তুমি। সন্তোষজনক কৈফিয়ত থাকলে নিশ্চয় তুমি আমাদের জানাতে তোমার এক সপ্তাহের অজ্ঞাতবাসের প্রকৃত তথ্য।

একটু চুপচাপ। তারপর ও বলে—আশ্চর্য আমার ভাগ্য! জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপের আগে চিন্তা করেছি, বিচার করেছি, যুক্তি দিয়ে যেটা করণীয় মনে হয়েছে তাই করেছি। অথচ মনে হয়, একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে গিয়েছে বারে বারে। অভিশপ্ত আমার জীবন। সারাজীবন ভুল এড়াতে গিয়ে শুধু ভুলই করে গেলাম। কৈফিয়ত? হ্যাঁ, সেই সাতদিনের অজ্ঞাতবাসের একটা কৈফিয়ত আমার দেবার আছে—তুমি বিশ্বাস কর—কোনো অন্যায় কাজ আমি করিনি। স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়—আর আমি অন্যত্র ফুর্তি করে বেড়াচ্ছি—ঠিক অত বড় পাষণ্ড আমি নই।

আমি জবাব দিই না। একটু পরে আবার বলে—কিছু বললে না যে?

—কী বলব?

—কেন কৈফিয়তটা দিলাম না আমি?

আমি নিশ্চুপ। উনি আবার বলেন—কেন সে কথা তোমাকে বলতে পারছি না জান? যদি প্রথম দিনই বলতাম—দুঃখ ছিল না। কিন্তু এতদিন পর ওকথা বলা আর সম্ভব নয়—কথাটা, মানে আমার পক্ষে সঙ্কোচের—

আমি বলি—তাহলে থাক না।

ও উত্তেজিত হয়ে বলে—না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমি জীবদ্দশায় তোমার কাছে সে কথা আর বলে যেতে পারব না। প্রথমদিন যখন বলিনি, তখন আর বলা যাবে না। কিন্তু মুক্তি দেবার দিন তো এগিয়ে আসছে মনু। বেশ বুঝতে পারছি আমার মেয়াদ আর বেশিদিন নয়। মুক্তি পাওয়ার পরে আমার ডায়রিটা পড়ে দেখ। আমি লিখে গিয়েছি সে অজ্ঞাতবাসের দিনপঞ্জি। দুঃখ এটুকুই যে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করলাম তোমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়ে। আমার এই অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে তোমার জীবনটা জড়িয়ে!

শেষদিকে ওর গলাটা ধরে আসে। চুপ করে পাশ ফিরে শোয়। মনে হয় ও বড় ক্লান্ত। দুঃখ হয়। রাগ পড়ে যায়। জড়িয়ে ধরে বলি—সারাজীবন ভুল করেছ কিনা জানি না, অন্তত একটি কাজ তুমি ভুল করনি। আমাকে বিয়ে করে। বিশ্বাস কর তুমি। আমার জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে তোমাকে পেয়ে—

—সত্যি বলছ তুমি? ওর কণ্ঠস্বর অন্ধকারের ভেতর কাঁপতে থাকে। যেন একটা অবলম্বন খুঁজছে।

—সত্যি! এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যার স্থান নেই। আজ আমার কোনো মোহ নেই, কোনো ক্ষোভ নেই! আলেয়ার পেছনে ছুটেছি সারাজীবন। অসংখ্য স্তাবককে দেখেছি পথের দুপাশে—হয়ত সুবিমলও ছিল আমার রূপের ভক্ত। আর হয়তো কেন—এটা আমি জানিই। কিন্তু জীবনকে আজ আমি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে পেয়েছি। তোমাকে সেবা করে, তোমাকে ভালোবেসে আমি নারীজীবনের এক নতুন অর্থ জেনেছি। আমার তৃষ্ণা মিটে গিয়েছে।

আমাকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে বলে—কিন্তু তবুও যে একটা মস্ত বড় ফাঁকি রয়ে গেল মনু?

—না, আর কোনো ফাঁক নেই—কোনো ফাঁকি নেই।

—তোমাকে মা হতে দিইনি।

আমি অস্ফুটে ওর কানে কানে বলি—দিয়েছ; তা তুমি নিজেও জান না।

একটু চুপ করে থাকে, তারপর বলে—একথা তুমি অনেকবার বলেছ। খোকনকে তুমি নিজের ছেলের মতো গ্রহণ করেছ; কিন্তু আমি তো বুঝি মনু, সেটা কত বড় মিথ্যা। আমি জীববিজ্ঞানী। তোমার নিজের সন্তান হতে দিইনি! কোনও স্ত্রীই ক্ষমা করতে পারে না স্বামীর এত বড় অত্যাচারকে!

আমি হেসে বলি—আমিও হয়তো করতুম না; কিন্তু আমার সে ইচ্ছা যে অপূর্ণ নেই। আমার দেহ-মন যে আজ ভরে উঠেছে তোমার দানে—

ও বাধা দিয়ে বলে—জানি, জানি। সেকথা তুমি অনেকবার জানিয়েছ। কিন্তু ওটা তোমার মনগড়া কথা। খোকনকে নিয়েই নাকি তুমি তৃপ্ত; এটা অহরহ বলে চলেছ তুমি। কিন্তু আমি জানি ওটা তোমার অন্তরের কথা নয়, হতে পারে না।

—তবে কী আমার অন্তরের কথা?

—আর পাঁচটা মেয়ে যা চায়। মা হতে। গর্ভধারিণী মা। অস্বীকার করলেও আমি তা মানব না। আমি যে দেখেছি তোমার চোখের কম্পনে তোমার মনের ছবি। তবু তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারছ?

মনে মনে কৌতুক বোধ করি। ও এখনও জানে না। ওর সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আমি নারী জীবনের সেই চরম তীর্থপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। খবরটা জানাতে যেটুকু ভয় ছিল তাও ঘুচে গেল এ কথায়। আমাকে বঞ্চিত করে সেও দুঃখিত। শুধু ও-ই নয়—আমিও যে দেখেছি ওর চোখের তারায় বেদনার্ত মনের ছবি। হেসে বলি—তবু তোমাকে ক্ষমা করেছি। চিরকাল করব।

ও যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। যেন কী একটা কথা বলতে যায়। উঠে বসে বলে—তবে শোন। তোমাকে তাহলে একটা খবর দেবার আছে। সে কথা শুনেও যদি মনে কর যে, আমাকে ক্ষমা করা যায়—

আর সহ্য হয় না। আমি বাধা দিয়ে বলি—অত ভণিতায় আর দরকার নেই। তার চেয়ে আমিই বরং একটা খবর বলি। তুমি চুপটি করে শোন। তারপর সময়মতো আমাকে জানিও এত নাটকীয়ভাবে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা।

ওর মাথাটা টেনে নিয়ে কানে কানে কথাটা বলি।

বলেই ওর বুকে মুখ লুকোই।

অনেকক্ষণ ওর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

কেমন যেন খারাপ লাগে। হতে পারে এটা ও চায়নি। ওর সাবধানতা সত্ত্বেও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই না হয় ঘটতে চলেছে ঘটনাটা। তবু আমার জীবনে এই তো প্রথম অভিজ্ঞতা! একটা মৌখিক অভিনন্দনও কি আশা করতে পারি না আমি?

—কথা বলছ না যে?

তবু নীরব।

—তুমি কি দুঃখিত হয়েছ?

কথা বলে না। ওর নীরব অবজ্ঞায় মনের ভেতর মুচড়ে ওঠে। ভীষণ কান্না পায়। অভিমান। আশ্চর্য মানুষ। একেবারে পাষাণ। দাঁতে দাঁত চেপে শেষবারের মত প্রশ্ন করি—ঘুমুলে নাকি? এবারেও সাড়া নেই। আমি এপাশ ফিরে শুই। বৃথাই তর্ক করছিলুম এতক্ষণ। ভীষণ স্বার্থপর লোকটা। ফাঁকিই দিতে চেয়েছিল আমাকে! আমি ফাঁকে পড়িনি শুনে মর্মাহত হয়েছে। আর কথাবার্তা বলতে ইচ্ছা করে না। কখন ঘুমিয়ে পড়ি অঘোরে।

ভোর রাত। ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ও টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে কী লিখছে! বাইরে তখন সবে আলো ফুটেছে। আমি উঠলুম। ও যে লক্ষ্য করছে সেটা বুঝতে পারি একবারও মুখ তুলে না তাকানোতে। বারান্দায় বেরিয়ে এলুম। দেখি সুবিমলও উঠেছে। ঐ সাত-সকালেই পায়চারি করছে বাগানে।

কাছে গিয়ে বললুম, বেড়াতে যাবেন?

ও চমকে চোখ তুলে তাকায়। তারপরে বলে, চলুন।

গেট খুলে বেরিয়ে আসি বাইরে। গেটটা বন্ধ করার সময় লক্ষ করি ও টেবিলে বসে আছে। তাকিয়ে আছে আমাদের দিকেই, একদৃষ্টে। আশ্চর্য মানুষ!

পনেরো

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে বসলেম চেয়ারে টেনে নিয়ে। হাতঘড়ির দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখি—আধঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে। বারান্দার ওপাশে একফালি একটা রাস্তা চলে গেছে ফটকটার দিকে। উঁচু পাঁচিল ঘেরা প্রাঙ্গণ। গেটের পাশেই একটা অশ্বত্থগাছ। তার মাথায় পড়ন্ত রৌদ্রের শেষ স্বর্ণাভা। ডালে ডালে পাখির কলকাকলি। অসংখ্য পাখি এসে আশ্রয় নিচ্ছে রাতের জন্য! আশ্চর্য, কলকাতা শহরে সারাদিন এত পাখি কোথায় থাকে? অশ্বত্থগাছের তলাটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। দুটি মেয়ে বসে আছে ওখানে। দু-একবার ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হল। ওরা বোধ-হয় ভাবছে—এ লোকটা এভাবে বসে আছে কেন? আর কতক্ষণ থাকবে?

আর কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করতে হবে তা কি আমিই জানি? মেয়েদের হস্টেল। এখানেই কদিন আগে পৌঁছে দিয়েছি মনামী বৌদিকে! আর আজ তার নাম লিখে স্লিপ পাঠিয়েছি ভেতরে। ঝি এসে বলে গিয়েছে—বসুন, উনি তৈরি হয়ে আসছেন। সেই আশ্বাসবাণীটুকু সম্বল করে আধঘন্টা ধরে বসে আছি। কী করছে সে এতক্ষণ? আজও ফিরে যেতে হবে নাকি প্রতিদিনের মতো?

কলকাতায় এসে ওর পুরানো হস্টেলেই ওকে পৌঁছে দিয়েছিলেম। এছাড়া আর কোথায়ই বা তোলা যেত তাকে? কলকাতায় আমার আস্তানা একটা ছাত্রাবাস—সেখানে ওকে তোলা যায় না। প্রায় বছরখানেক পরে মনামী ফিরে এল ওর পুরানো বোর্ডিং-এ।

মনামী বৌদির বান্ধবীরা নিশ্চয় একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল! ওর বিয়ের কথাই জানত না এরা কেউ। হঠাৎ কেন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল সে, তাও হয়তো ওরা জানে না। একটি বছর পর সেই মেয়েটি যে এভাবে ফিরে আসতে পারে তা বোধহয় ওদের স্বপ্নেরও অগোচর।

ওকে ওখানে নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেম—তুমি এখন কী করবে?

ও একমুহূর্ত বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল; তারপর বললে—তাই তো, আমি এখন কী করব?

বুঝতে পারি তখনও সে প্রকৃতিস্থ হতে পারেনি।

মনামী ভেতরে চলে গেলে কতক্ষণ চুপ করে অপেক্ষা করেছিলেম খেয়াল নেই। হঠাৎ লক্ষ্য করি এক ভদ্রমহিলা হাত তুলে আমাকে নমস্কার করে বলছেন—আমি এ হস্টেলের সুপার। মনামী আপনার কে হয়?

আমি প্রতিনমস্কার করে বলি—উনি আমার বৌদি!

—ও, বসুন।

দুজনেই বসি আমরা। উনি প্রশ্ন করেন—কী হয়েছিল আপনার দাদার?

বললেম—হাই ব্লাডপ্রেসার ছিলই। হঠাৎ স্ট্রোক হয়। ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। পশ্চিমের একটা ছোট গাঁয়ে গিয়েছিলেন হাওয়া বদলাতে। লোকাল ডাক্তার কয়েকটা ইন্‌জেকশান দিলেন—কিন্তু কিছুই হল না।

ভদ্রমহিলা সমবেদনা জানান। মনুষ্যজীবনের নশ্বরতার বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বাণী দান করেন। আমি বলি—যিনি গেছেন, তাঁর কথা আমি আর ভাবছি না। আমি ভাবছি বৌদির কথাই। কী করে যে এ শোক থেকে সামলে উঠবেন, তাই ভাবছি!

—কতদিন হল এ দশা হয়েছে?

—আজ প্রায় দিন পনেরো!

—এ অবস্থায় তাহলে ওকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?

আমি বুঝিয়ে বলি, শ্বশুরবাড়িতে উঠবার মতো স্থান নেই। দাদার অন্যান্য ভাইয়েরা আছেন। তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানেই রয়ে গিয়েছেন। এদিকে আমি থাকি হস্টেলে। সবশেষে আসল কথাটাও জানাই সুপারকে। বলি—তাছাড়া মনামী বৌদি ইজ ক্যারিইং!

উনি বললেন—হাউ প্যাথেটিক!

সেদিন আর কোনো কথা হয়নি ওঁর সঙ্গে। আচ্ছা, আমার কাছে সংবাদটা শুনে উনি অমন চমকে উঠেছিলেন কেন? প্যাথেটিক? কিন্তু কেন? কী কারণে এটা দুঃখবহ মনে হয়েছিল তাঁর? মনামীর বুক জুড়ে যে শিশুটি আসবে, তার গোপন পদধ্বনি একমাত্র সেই শুনতে পেয়েছে! সেই শিশুটিই কি ওর একমাত্র সান্ত্বনা নয়? আমার মা-দিদিমা এ খবর পেলে বলতেন—ঐ খুদকুঁড়োটুকু থেকে হতভাগিনীকে বঞ্চিত কোরো না ঠাকুর। সেকথা সুপার বললেন না; তিনি সংক্ষেপে শুধু বললেন—হাউ প্যাথেটিক! কারণ উনি মনামীর দুনিয়ার মানুষ। ওঁর মনে হয়েছে—বিধবা মনামীর কাছে এই অনাগত শিশুটিই নূতন সাথি আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই ঘটনাটা ওঁর কাছে শুধু দুঃখদায়ক।

দাদার শেষ সময়ে রাধাবৌদির বাবা এসেছিলেন। দাদার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁকে আনতে হয়েছিল! আমার ইচ্ছা ছিল না! আমি এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেম না। শ্রদ্ধা না থাকার কারণও ছিল। রাধাবৌদির শেষ সময়েও তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিলেম; কিন্তু তিনি সময়মতো এসে পৌঁছতে পারেননি। পরে শুনেছি, দেরি হওয়ার কারণ, যে সময়ে টেলিগ্রাম পৌঁছায় তখন তিনি সঙ্কল্প করে বুঝি কার বাড়ি পূজায় বসেছিলেন। পূজা শেষ না করে ট্রেন ধরেননি। ফলে মেয়ের সঙ্গে

দেখা হয়নি তাঁর। কন্যার মরণাপন্ন অসুখের খবর পেয়েও যে পুরোহিত দুটো চাল-কলা-নৈবেদ্যের লোভ সামলাতে পারে না তার ওপর শ্রদ্ধা না থাকাটাই স্বাভাবিক। সে যাই হোক, দাদার অনুরোধে তাঁরে আনানো হল। তিনি যেদিন এলেন তার আগের দিন থেকেই দাদা কথা বলছেন না। আমরা ভেবেছি তাঁর বাকরোধ হয়ে গিয়েছে বুঝি। তা যে হয়নি তা বোঝা গেল বৃদ্ধ এসে পৌঁছানোতে। বৃদ্ধ এসে ওঁর শিয়রে বসলেন। দাদা বললেন—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি অনুরাধাকে অনাদর করিনি কখনো। তার ভালোই করতে গিয়েছিলাম আমি সব সময়ে। কিন্তু সমস্ত জীবন নিষ্ঠুর নিয়তি আমাকে ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। আমার ভুলের মাশুল আমি কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়ে যাব! কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করে যান—না হলে তার কাছে গিয়েও আমি শান্তি পাব না!

বৃদ্ধ বললেন—তোমার কোনো অপরাধ নেই, আমি জানি। সব বাসুদেবের ইচ্ছায় হয়েছে। তাঁকে স্মরণ কর তুমি।

দাদা চুপ করে শুয়ে থাকেন চোখ বুজে।

ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছেন। মনামী বৌদি পাথর হয়ে গিয়েছে এ আঘাতে। আমরা ঘিরে রয়েছি মৃত্যুপথযাত্রীকে। বৃদ্ধ আবার বলেন—তাঁর নাম কর তুমি।

এইবার চোখ খুলে তাকালেন দাদা। অস্ফুটে বললেন—আপনি তো জানেন, ঈশ্বরকে আমি মানি না।

বৃদ্ধ হেসে বললেন—আমি জানি, তুমি তাঁকেই মানো!

মৃত্যুপথযাত্রীর ভ্রূতে জেগে ওঠে একটা কুঞ্চন! বললেন—আপনি কি বলতে চান, এই শেষ সময়েও মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছি আমি?

দাদার হাত দুটি তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলে ওঠেন—না, বাবা না। তুমি মিথ্যা কথা বলছ না; কিন্তু অভিমান করে বলছ।

—অভিমান! কার ওপর অভিমান?

—যাকে খুঁজেছ তুমি সারাজীবন তোমার ল্যাবরেটারিতে।

—আমি ঈশ্বরকে খুঁজিনি—জীবনরহস্যকে খুঁজেছি।

বৃদ্ধ হেসে বলেন—একই কথা। তিনিই যে জীবনের জীবন, আলোর আলো! আমাদের মতো সাতজন্মে তাঁর কাছে যেতে চাও না বলেই না শত্রুভাবে ভজনা করেছ তাঁকে! জীবনের রহস্যকে খুঁজেছ তুমি সারাজীবন—পাওনি! কিন্তু আমি তো জানি, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবনের আদিমতম রহস্যকে খুঁজে পাবে তুমি!

দাদা চমকে উঠে বলেন—পাবো?

আশ্চর্য! শেষ সময়ে তিনি মনামীর দিকে চেয়ে দেখলেন না, খোকনের দিকে চেয়ে দেখলেন না—তারাভরা আকাশের দিকে একবারও চেয়ে দেখলেন না বিদায় নেবার আগে। তখনও অন্তিম আগ্রহে তিনি জানতে চাইছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের অনুদ্‌ঘাটিত রহস্যের হদিস মিলবে কি না।

বৃদ্ধ বললেন—নিশ্চয়ই পাবে—তিনিই যে পরম প্রাপ্তি! তাঁকে ডাক।

প্রাপ্তি বলতে কে কী বুঝলেন কী জানি। চোখ বন্ধ হয়ে গেল বৈজ্ঞানিকের; বললেন—আমি যে ওভাবে ডাকতে শিখিনি।

বৃদ্ধ ওঁর কানে কানে বললেন—বিজ্ঞান তোমাকে যে ভাবে শিখিয়েছে সেইভাবেই ধ্যান কর তাঁকে; অসীম শক্তির উৎসরূপে চিন্তা কর তাঁকে, তাঁর 'বিশ্বরূপ' দেখ মনে মনে। যে অসীম শক্তি গড়েছে এই অনাদ্যন্ত বিশ্বপ্রপঞ্চকে, অণু থেকে নীহারিকা চলছে যাঁর নির্দেশে—সেই শক্তিকে ধ্যান কর।

সন্ধি হয়ে গেল বিশ্বাস আর যুক্তির। সুর করে গীতায় একাদশ অধ্যায় আবৃত্তি শুরু করলেন বৃদ্ধ। মৃত্যুপথযাত্রীর নিমীলিত নয়ন দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জলের দুটি ধারা। কখন মৃত্যু হল তাঁর, তা আমরা জানতে পারিনি!

মনে মনে প্রণাম করেছিলেম সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে। বুঝতে পারি অন্যায় করেছিলেম! কতখানি ধৈর্য থাকলে কন্যার এত বড় দুঃসংবাদ পেয়েও অবিচলিত চিত্তে আরব্ধ পূজা সম্পন্ন করা যায় তা উপলব্ধি করেছিলেম সেদিন!

*　　*　　*

কিন্তু মনামী কি আর আসবে না? ও কি ভুলে গেল আমার কথা? অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল। ট্রাম-রাস্তার ধারেই এই বোর্ডিং। রাস্তার কলকোলাহল ভেসে আসছে। ঘড়ঘড় করে অফিসফেরতা ট্রাম চলেছে আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে। অশ্বত্থগাছতলায় যে মেয়ে দুটি বসেছিল তারা উঠে গেল। যাবার সময় আমার দিকে আড়চোখে কী যেন দেখল। ওরা বোধ হয় জানে আমি মনামীর কাছে এসেছি। মনামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও কি জানে? কিন্তু সম্পর্কটা কতদূর জানে? অমন বিশেষ ভঙ্গিতে ওরা আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছিল? হয়তো কতকগুলো অবান্তর কথা ওরা শুনেছে মনামীর কাছে। মনুর কথাবার্তা সুসংবদ্ধ নয়—কেমন যেন মাথাখারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে দাদা মারা যাবার পর। হয়তো আবোল-তাবোল কিছু বলে থাকবে ওদের!

ঝি এসে বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিয়ে যায়। তাকে বলি—কী হল? তুমি ওঁকে খবর দিয়েছিলে তো?

ঝি বিরক্ত হয়ে বলে—খবর দেব না কেন? উনি চুপ করে বসে আছেন।

—আর একবার গিয়ে বল বরং।

ঝি একটু ইতস্তত করে বলে—ওকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাও বাবু। এখানে থাকলে ও বদ্ধপাগল হয়ে যাবে!

ঝি আবার খবর দিতে যায়!

আজ নিয়ে চারদিন। রোজই এসে বসে থাকি। ভেতরে স্লিপ পাঠাই। অপেক্ষা করার নির্দেশ আসে। বসে থাকি চুপচাপ। তারপর শেষ পর্যন্ত আর দেখা করে না। এক-একবার ভাবি আর আসব না। কিন্তু ওর এই আচরণে রাগ করতে পারি না—ও প্রকৃতিস্থা নয়। সুতরাং ওর এই আচরণে রাগ করে সরে যাওয়ার অর্থ মনকে একটা মনগড়া কৈফিয়ত দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো মাত্র।

বাইরের দিক থেকে বোর্ডিং সুপার এলেন। রাশভারী গম্ভীর চেহারা। কালো পাড় সাদা মিলের শাড়ি। কাঁধের কাছে ব্রোচ দিয়ে আটকানো। ডান কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ, বাঁ হাতে বেঁটে ছাতা। আমাকে দেখে হাত তুলে নমস্কার করেন—ভালোই হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। কয়েকটা কথা ছিল।

আমি শশব্যস্তে বলি—বলুন।

—দেখুন, মনামীকে এখানে রাখা সম্ভব হবে না! আপনি ওকে নিয়ে যান।

আমি ইতস্তত করে বলি—কিন্তু আপনি তো জানেন সব কথা। ওঁকে কোথায় নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন।

একটু বিরক্ত হয়ে ভদ্রমহিলা বলেন—সেটা আপনাদের ঘরোয়া সমস্যা। আমাদের বোর্ডিং-এ যেসব মেয়েরা থাকে তাদের অধিকাংশই ছাত্রী। আপনার বৌদি ফিরে আসার পর আমি লক্ষ করছি একটা বিশ্রী গুজব ছড়াচ্ছে। ও ঠিক প্রকৃতিস্থা নয়—না হলে নিজেই এ গুজবটা রটাত না। আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন কিনা জানি না।

আমাকে স্বীকার করতে হয়—আমি কিছুই জানি না।

—তাহলে ক্রমশ জানবেন!

ঝি ফিরে আসে। তার হাতে মনু একখণ্ড চিঠি পাঠিয়েছে, আর একখানা বাঁধানো খাতা। চিঠিটা খুলে পড়ি। সুপার প্রশ্ন করেন—কী লিখেছে?

—লিখেছেন আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। কাল আসতে বলেছেন।

—সেই ভালো। কাল একেবারে ব্যবস্থা করেই আসবেন। ওকে নিয়ে যাবেন।

আমি সংক্ষেপে বলি—যাব।

উঠে পড়ি। গেটের কাছে দেখি সেই মেয়ে দুটি তখনও বসে আছে বাগানে। আমাকে উঠে আসতে দেখে ওরা যেন কী বলাবলি করল। যেন আমার মধ্যে রহস্যঘন কোনো কিছুর সন্ধান পেয়েছে ওরা।

ট্রামে উঠে মনামীর চিঠিখানা আবার পড়লেম! কই, অসংলগ্ন তো কিছু নেই। ওকে আমি প্রথম যে চিঠিখানি লিখি তাতে কোনো সম্বোধন ছিল না—আজ বছরখানেক পরে ওর কাছ থেকে প্রথম যে

জবাব পেলেম তাতেও কোনো সম্বোধন নেই। ও লিখেছে—"তুমি রোজই আসছ। দেখা করতে পারছি না। অথচ তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। ভীষণ দরকার। কিন্তু কী করে বলব সে কথা? এখানে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। একবারের জন্য আমাকে নির্জনে কোথাও নিয়ে যেতে পার? যেখানে প্রাণভরে কাঁদবার সুযোগ আছে? কেন তুমি আস ফিরে ফিরে? আজও আমাকে ঘৃণা করতে পার না? একদিন তো পেরেছিলে! কোথায় গেল তোমার সেই সুতীব্র ঘৃণা? আর এসো না। আগুনে হাত বাড়িও না। হাত পুড়ে যাবে। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। জীবনে আমার বিতৃষ্ণা। কেন? সে কথা বুঝবে এই খাতাখানা পড়লে। শেষ কখানা পাতা পড়বার পরেও কাল যদি এখানে আসবার রুচি থাকে তবে এসো—সঙ্গে নিয়ে এসো একপুরিয়া বিষ।"

বাড়ি এসে খাতাটি খুলে বসি। দাদার ডায়েরি, দীর্ঘ জীবনের দিনপঞ্জিকা। পড়তে পড়তে রাত ভোর হয়ে আসে। কলেজ জীবন থেকে শুরু হয়েছে। ছাত্রজীবনের শেষ পর্যায়ে জীববিজ্ঞানকে বেছে নিলেন। বাল্যেই বাবা-মাকে হারিয়েছেন। জীবনের উষাযুগ থেকেই ভাগ্যদেবী ওঁর প্রতিকূলতা করে চলেছেন। দিনলিপির প্রতি ছত্রে দাদা সেই নিষ্ঠুর নিয়তিকে চ্যালেঞ্জ করে গিয়েছেন। কখনও তার কাছে নতি স্বীকার করেননি। প্রাইভেট ট্যুইশনির লগি মেরে পার হয়েছেন ছাত্রজীবন। জীবনরহস্যের আদিতত্ত্বের সন্ধানের জন্য গবেষণা করার একটা বৃত্তিও পেয়েছিলেন—কিন্তু অর্থাভাবে সে কাজ ছেড়ে প্রফেসারি নিতে হয়েছে। তবু তথ্য সংগ্রহ করে গিয়েছেন অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে। বাসনা ছিল কলকাতায় বদলি হয়ে ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরির সুবিধা নিয়ে আবার গবেষণা শুরু করবেন। নিয়তি কিন্তু বরাবর পেছন থেকে টেনে রেখেছে তাঁকে। যেন একটা ভারী পাথরের বোঝা পিঠে নিয়ে বিজ্ঞানসমুদ্র সাঁতরে পার হওয়ার সঙ্কল্প ছিল তাঁর। রাধাবৌদির সঙ্গে তাঁর মতান্তরের ইতিহাস পড়ে স্তম্ভিত হতে হয়। বারে বারে মনে মনে বলি—হে স্বর্গগত আত্মা, তুমি আমাকে মার্জনা কর। না বুঝে অনেক অবিচার করেছি তোমার প্রতি।

নরনারীর স্বাভাবিক জীবন সম্ভব ছিল না ওঁদের—বৌদির আঙ্গিক ত্রুটির জন্য। অতি সহজেই এ সমস্যার সমাধান চলত। তা হতে পারেনি বৌদির অন্ধ সংস্কারের বাধায়। ভাগ্যদেবীর এ আঘাতও দাদা বুক পেতে গ্রহণ করেছিলেন—পরাজয় স্বীকার করেননি। যেদিন মনামীকে নিয়ে কলকাতা যান তার আগের রাত্রে তাহলে কেউই ঘুমাননি। পরদিন কলকাতায় গিয়ে বিশেষজ্ঞের শরণ নিলেন। পুরুষকার দিয়ে তিনি দৈবকে জয় করতে চাইলেন। অস্ত্রোপচার করালেন নিজ দেহ। পিতৃত্বের অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত করলেন নিজেকে।

...এই পর্যন্ত পড়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকি! এ কী করে সম্ভব? তাহলে আবার তিনি বিবাহ করেন কোন অধিকারে? আর সবচেয়ে বড় কথা মনামী কেমন করে.....

আবার পাতা উল্টে যাই। একসঙ্গে অনেকগুলি।

"আবার কি ভুল করিলাম? মনামী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সে কোনোদিন সন্তানের প্রত্যাশা করিবে না; কিন্তু প্রতিজ্ঞাই কি সব? নিজের মনটাকেই কি আমরা চিনি? উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষ একটা কথা দেয়—তারপর সারাজীবন সেই প্রতিজ্ঞার জের টানিতে টানিতে তাহার জীবন দুর্বহ হইয়া পড়ে। কে বলিতে পারে মনুর মনও একদিন পরিবর্তিত হইবে না? কেমন করিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলাম, সেও অনুর মতো সন্তানের জন্য একদিন পাগল হইবে না? মৌখিক প্রতিশ্রুতি? তাহার মূল্য কী? মনুর যদি হিস্টিরিয়া হয়, যদি ডাক্তারে বলেন সন্তান না হইলে সে সুস্থ হইবে না? তখন কী করিব? কেন সব কথা তাহার নিকট অকপটে স্বীকার করি নাই? লজ্জা? সঙ্কোচ? কিসের সঙ্কোচ বৈজ্ঞানিক?"

"অবনীমোহন। পাপ স্বীকার কর! তুমি মনামীর রূপে মুগ্ধ মোহাবিষ্ট হইয়াছিলে—যে মুহূর্তে বুঝিতে পারিলে সেও তোমাকে ভালোবাসে তখনই তুমি মনগড়া এক সঙ্কোচ খাড়া করিয়া কপটতার আশ্রয় লইয়াছ। নহিলে তোমার পুরুষত্বহীনতায় সঙ্কোচের তো কোনো স্থান নাই! মনামীর রূপের মোহে তুমি উন্মাদ হইয়াছিলে, তাই সাহস করিয়া সব কথা তাহাকে বলিতে পার নাই। অন্যায় করিয়াছ! এখন তাহার ফলভোগ কর।"

"....কিন্তু এসব কথা কেন চিন্তা করিতেছি? মনুর তো কোনো পরিবর্তন হয় নাই। সে তো সন্তান চাহে নাই। খোকনকে লইয়াই সে তৃপ্ত। হয়তো সে কোনোদিন জানিতেও পারিবে না, পিতৃত্বের

অধিকার হইতে আমি চিরবঞ্চিত। তাহাকে ভুল বুঝাইবার জন্য অপ্রয়োজনেও সাবধানতার অভিনয় করিতেছি।"

নিস্তব্ধ রাত্রি। একফালি আকাশে একমুঠো তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জানলার ধারে। দূরে গির্জার ঘড়িতে রাত্রিশেষের সঙ্কেত। নিশাচর একটা ট্যাক্সি হর্ন বাজাতে বাজাতে চলে গেল দ্রুতবেগে। প্রত্যেকটি পাতা পড়বার মতো ধৈর্য নেই। চলে আসি শেষ পৃষ্ঠায়।

"কাল রাত্রি সত্যিই কালরাত্রি। কালরাত্রে মনু একটি অদ্ভুত সংবাদ দিল। বুঝিলাম চূড়ান্তভাবে হারিয়া গিয়াছি। কিছুদিন হইতেই এ সন্দেহটা জাগিয়াছিল। মনামী আমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হয় নাই। সুবিমল আসিবার পরে কারণটা বুঝিলাম। মনামী তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। তবে এ ভুল সে কেন করিল? আমি উত্থানশক্তিরহিত। ইজিচেয়ারে শুইয়া থাকি। মনামী সুবিমলকে লইয়া এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো দেখাইয়া আনে। চুনের কোয়ারি, সালফারের খনি, মুরলী পাহাড়। কখনও যায় বান্‌জারী পাহাড়ের উপর হরীতকী গাছের ছায়ায় বুড়োবুড়ির পীঠস্থানে, কখনও শোনের ধারে চখাচখীর পাড়ায়। আমি বৈকালিক পড়ন্ত রৌদ্রে রোহিতাশ্ব পর্বতের দিকে চাহিয়া নিশ্চুপ বসিয়া থাকি। মনে মনে বলি—হে অলক্ষ্যচারিণী, তোমাকে প্রণাম করি। কী অপূর্ব নাটকটি রচনা করিয়াছ! একদিন অনুরাধা রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিত, আর আমি মনামীর হাত ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম। অনুরাধার অন্তর্জ্বালা সেদিন আমি উপেক্ষা করিয়াছিলাম—তাই আজ আমাকে আনিয়া ফেলিয়াছ এই রোগশয্যায়। মনামী সেদিনের মতো আজও বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হয়। আমি রোহিতাশ্ব পর্বতের উপর ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটির দিকে চাহিয়া প্রহর গনি। আজ মনে হইতেছে ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটি শ্রবণা নক্ষত্র নহে, বিজ্ঞান আমাকে ভুল শিখাইয়াছে। ঐটি হইতেছে অনুরাধার নির্নিমেষ নয়ন! মিটিমিটি করিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে, বলিতেছে—কেমন জব্দ!

"মনু বলিয়াছে কলিকাতায় তাহার সহিত সুবিমলের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেন সে এ মিথ্যা কথা বলিল? সে তো জানে না, কলিকাতায় গিয়া সে সুবিমলের সান্নিধ্যে আসিয়াছিল এ কথা জানিতে পারিলেই আমি শান্তি পাই! যে অনাগত শিশুটি মনামীর দেহের সুগোপনে তিলতিল করিয়া বাড়িতেছে সে যে সুবিমলেরই দান এ কথা জানিতে পারিলেই আমি আজ নিশ্চিন্ত হই! নহিলে কী বিশ্বাস লইয়া যাইব? ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রটির কাছে গিয়া কী জবাবদিহি করিব? মনুকে, খোকনকে কাহার কাছে দিয়া যাইব?

"উপায় নাই। আমার মিথ্যাচার বুমেরাঙের ন্যায় আমার উপরেই ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ তাই একথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার হারাইয়াছি।"

* * *

....রাত্রি শেষ হয়ে গেল। আর উৎসাহ নেই। ডায়রি বন্ধ করে রাখি। মনামী কেন এ ডায়েরি আমাকে পড়তে দিল? অবনীমোহন না জানলেও মনামী তো জানে কার অজাত সন্তানকে বহন করছে সে। কে সে? না, ও কথা আর ভাবব না।

মনামী আমার কাছে বিষের পুরিয়া চেয়েছে। বিষ সংগ্রহ করা সহজ; কিন্তু অমৃতের সন্তান আমরা—অমৃতের সন্ধান দিতে পারি না কি? পারব না তাকে বলতে—কে তোমার সন্তানের পিতা সেকথা জানতে চাই না। সমাজে তার পরিচয় হোক অবনীমোহনের সন্তান বলে। এসো তুমি আমার জীবনে।

কিন্তু যদি ভুল বুঝে থাকি? যে অজ্ঞাত ব্যক্তিটির সন্ধান আমরা কেউ পাইনি মনামী যদি তার প্রতীক্ষাতেই থাকে?

মনামী আজ অপ্রকৃতিস্থা। খোকনকে তাই নিয়ে গেছেন তার দাদামশাই। বোর্ডিং-এর সুপার বলেছেন—মনামীর নাম নিয়ে স্ক্যান্ডালাস গুজব ছড়াচ্ছে। কী করে ছড়ায়? হয়তো সে-ই কিছু বলছে। হয়তো বলছে—অবনীমোহনের সন্তানকে সে ধারণ করছে না। ও পাগল হয়ে যেতে বসেছে। ওর পক্ষে সবই সম্ভব। হয়তো ওরা আমাকেই সন্দেহ করছে! হয়তো সেই জন্যেই হস্টেলের মেয়ে দুটি

কাল আমার দিকে অমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল। কী লজ্জা! কী করে আবার গিয়ে দাঁড়াব সেখানে? কিন্তু যেতে আমাকে হবেই। মনামীকে একদিন আমি ভালোবেসেছিলেম। আজও বাসি। এই বিপদের মধ্যে অর্ধোন্মাদ মনুকে ফেলে পালাতে পারব না আমি। হস্টেলে ওরা ওকে রাখবে না। হতভাগিনীর আশ্রয় কোথায় এ দুনিয়ায়? যার জন্যে আজ ওর এ অবস্থা সে হয়তো সরে দাঁড়িয়েছে। ত্রিবেদী? না, ও কথা ভাবব না আমি!

বিকেলে আবার এসে দাঁড়ালেম হস্টেলের ভিজিটার্স-রুমে। ঝি আমাকে দেখে বিরক্ত হল। চলে গেল ভেতরে। বসে রইলেম একখানা চেয়ার দখল করে। ছোট্ট ঘর, মাঝখানে একটা গোল টেবিল। দেওয়ালে খানকয়েক ছবি।

কিন্তু ঝি তো আজ কোনো স্লিপ নিয়ে গেল না। খবর দিতেই গেল তো? হঠাৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। দরজার পর্দার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাকে দেখে। ভাবখানা যেন, আমি যে বসে আছি তা জানা ছিল না ওর! লক্ষ্য করে দেখলেম—কালকের সেই মেয়ে দুটিরই একজন।

আমি বলি—মনামী রায়কে কাইন্ডলি একটু খবর দেবেন?

মেয়েটি বলে—কী বলব? কে এসেছেন বলব?

—বলবেন ওঁর দেওর এসেছে।

—দেওর? মনু বুঝি আপনার বৌদি হয়?

দরজার ওপাশে অনেকগুলি কলকণ্ঠের চাপা হাসি। মেয়েটিও হেসে ফেলে। তারপর অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলে—আচ্ছা বসুন, খবর দিচ্ছি।

দ্রুতপদে মেয়েটি পালিয়ে বাঁচে। পর্দার ওপাশে দ্রুতচ্ছন্দ কতকগুলি স্লিপারের খসখসানি। সেই সঙ্গে চাপা হাসি। আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

একটু পরেই আসে মনামী। চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। মনে হচ্ছে মাথা ঘসেছে বুঝি সাবান দিয়ে। রুক্ষ অবিন্যস্ত তৈলতৃষিত চুল উড়ছে হাওয়ায়। পরনে একখানি সাদা চুলপেড়ে ধুতি—বোধহয় দাদার! সর্বাঙ্গে একতিলও স্বর্ণালঙ্কার নেই। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি! হঠাৎ বলে—এই যে, তুমি এসেছ! সুবিমল, তুমি ওদের বুঝিয়ে বল যে, কোনো অন্যায় কোনো পাপ আমরা করিনি। ওরা বিশ্বাস করে না।

স্পষ্ট বুঝতে পারি দরজার ওপাশে রীতিমতো একটা জনতা। সর্বাঙ্গে কালঘাম ছুটতে থাকে। ওর হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলি—কী আবোল-তাবোল বকছেন?

ও চমকে উঠে বলে—অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ! কিন্তু তোমার না আজকে বিষের পুরিয়া আনার কথা? এনেছ?

আবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলি—আবার পাগলামি করছেন?

—পাগলামি। খিলখিল করে হেসে ওঠে বিধবা মেয়েটি।

—পাগল নয় কে? আমি একা পাগল? রাধাদি পাগল ছিল—ফর শী এক্সপেকটেড চাইল্ড ফ্রম অ্যান ইম্পোটেন্ট। উনিও পাগল—ফর, হি থট দ্যাট আয়াম ক্যারিং য়োর চাইল্ড। তুমিও পাগল—ফর ইউ ডিড ল্যভ্ মি! না, না, অস্বীকার কোরো না। আজ যতই ঘৃণা কর না, একদিন তুমিও আমাকে ভালোবাসতে।

আমি ওর হাত ধরে আবার একটা প্রচণ্ড ধমক দিই—তুমি পাগলামি না থামালে আমি চলে যেতে বাধ্য হব!

—ও. কে.! আমি চুপ করলুম।

ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ি একখানা চেয়ারে। চাপা কথাবার্তা ভেসে আসছে পর্দার ওপাশ থেকে। কী করি এখন? কোথায় নিয়ে যাব এই অর্ধোন্মাদকে? মনামী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। আস্তে আস্তে বলে—সুবিমল, ডু ইউ বিলিভ ইন ইম্যাকুলেট কন্‌সেপ্‌শান?

ওর কথা শেষ হবার আগেই ঘরে আসেন একজন ভদ্রমহিলা। পরিচয় দেন ডেপুটি সুপার বলে। আমাকে জানান যে, সুপার ওঁকে বলে গিয়েছেন, আমি যেন মনামীকে নিয়ে যাই।

আমি বলি—নিতেই এসেছি, ওঁর জিনিসপত্র সব পাঠিয়ে দিন।

—আপনাকে একটা বন্ডে সই করে দিতে হবে।

—দেব, নিয়ে আসুন কাগজ।

মনামী আমার দিকে ফিরে বলে—তুমি কি আমাকে নিয়ে এ অবস্থায় ইলোপ করতে চাও?

আমি ডেপুটি সুপারের দিকে ফিরে বলি—আপনি অনুগ্রহ করে একটু তাড়াতাড়ি করলে বাধিত হব। বুঝতেই পারছেন, উনি অপ্রকৃতিস্থা। পর্দার ওপাশে যাঁরা ভিড় করে আছেন ওঁদের এ প্রলাপ শুনতে হয়তো মজা লাগছে—কিন্তু এ বিড়ম্বনা থেকে আমি তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চাই।

অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উনি উঠে যান।

ট্যাক্সি ডেকে পথে বেরিয়ে মনে হল—কোথায় যাই! কোনো একটা হোটেলে উঠতে হবে। বিবেকানন্দ স্ট্রিট দিয়ে ট্যাক্সিটা গিয়ে পড়ল সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে। আমার বুকপকেটের কাছে তৈলতৃষিত রুক্ষ চুলের বোঝা সমেত মাথাটা গুঁজে মনামী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। জানি, এভাবে ওকে নিয়ে হোটেলে ওঠা ঠিক নয়। আমিও সমাজবদ্ধ জীব। বাবা এটাকে ক্ষমা করবেন না—কিন্তু কী করতে পারি আমি? মনামী একান্তভাবে আমাকে আশ্রয় করেছে। পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করছে আমার ওপর। ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কতই না সোজা! এখনি ট্যাক্সিটাকে থামিয়ে গিয়ে বসতে পারি পার্কের ঐ বেঞ্চিতে। যদি তাকে বলি—এখানে বসে থাক, আমি আসছি—তাহলে ও বসেই থাকবে। আমি চরিত্রবান আদর্শ ভালোছেলের মতো ফিরে যেতে পারি। তারপর? তারপর আমার চরিত্রে কেউ আর কোনোদিন কলঙ্কের সন্ধান করবে না। যে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল ওদের হস্টেলে তার হাত থেকে চিরমুক্তি পাওয়া যায়। মনামীর ভবিষ্যৎও সহজেই অনুমেয়। ও হয়তো ঘুমিয়েই পড়বে পার্কের বেঞ্চিতে। তারপর এমন একটি সুন্দরী বিকৃতমস্তিষ্কা যুবতীর একটা সুব্যবস্থা করে দেবেই কলকাতা শহর!

আমার বুকে মাথা রেখে ও বলে—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল লাল আলোর নির্দেশে। বললেম—আপাতত কোনো একটা হোটেলে উঠব আমরা।

—ডায়রিটা পড়েছ নিশ্চয়?

—পড়েছি।

—তারপরেও আমাকে নিয়ে একটা হোটেলে উঠতে চাইছ? শেষে যে তোমাকেই দায়ী করবে সকলে!

মনামীর দৃষ্টিতে ক্লান্তির আবেশ বিহ্বলতা ছিল, কিন্তু পাগলামির ঘোলাটে কুয়াশাচ্ছন্নতা ছিল না। অবাক হয়ে বলি—তুমি কি পাগল হওনি সত্যি? মাঝে মাঝে এমন পরিষ্কার কথা বল কী করে?

ও খিলখিল করে হেসে বলে—তুমি বিশ্বাস করবে সুবিমল, আমি জানি না কার সন্তানকে বহন করছি প্রতিনিয়ত।

আবার পাগলামি শুরু হল দেখে ওকে থামিয়ে দিই, বলি—আচ্ছা, আচ্ছা, সেসব কথা পরে হবে।

—তুমি বিশ্বাস করছ না? কিন্তু এ আমার পাগলামি নয়। অন্য কোনো পুরুষ আসেনি আমার জীবনে।

ধমক দিয়ে উঠি—অ্যাবসার্ড!

আহত নাগিনীর মতো উঠে বসে মনামী বলে—এই রোখ্‌কে!

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার ধারে। আমি চমকে উঠে বলি, কী হল?

—উই মাস্ট পার্ট কম্পানি। তুমি আমাকে অপমান করেছ।

দরজা খুলে নেমে পড়ে মনামী! আমাকেও নামতে হয়। ওর হাতটা ধরতেই দেখি থরথর করে কাঁপছে সে। কাঁদছে! ওকে আকর্ষণ করি; ও গাড়িতে কিছুতেই উঠবে না! কলকাতার জনবহুল রাস্তা। লোক জমে যায় অচিরে। একটি আলুলায়িতকুন্তলা অপূর্ব সুন্দরী বিধবাকে একটি ছেলে জোর করে ট্যাক্সিতে তুলছে। দৃশ্যটা নাটকীয়। এর কদর্থ হতে সময় লাগে না। হয়তো এখনই কিল-চড় বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে আমার ওপর। হঠাৎ একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বলেন—কী হচ্ছে মশাই?

আমি কিছু বলার আগেই মনামী বলে—ইনি আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে চাইছেন—উড্ ইউ হেল্প মি?

—নিশ্চয়ই! আসুন আমার সঙ্গে।

ভিড় ঠেলে ভদ্রলোক একটি ডিস্পেনসারিতে নিয়ে গিয়ে বসান মনামীকে। আমার ওপর কয়েকটি মুষ্টিবদ্ধ হাত উদ্যত হয়েছিল। আমার পালাবার কোনো লক্ষণ না থাকায় তারা আত্মসংবরণ করে। ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে বলে আমিও দোকানে উঠে যাই!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ডাক্তার। তাঁরই ডাক্তাখানা। চেয়ারে বসে লক্ষ করছিলেন এতক্ষণ। পরিস্থিতিটা বিপদজনক হবার সম্ভাবনা দেখে উদ্ধার করেছেন আমাদের। ওকে নিয়ে গিয়ে বসান একটা চেয়ারে, ফ্যানটা খুলে দেন। দরজার কাছে সরে এসে সমবেত জনতাকে চলে যেতে বলেন। ক্রমে ভিড়টা পাতলা হয়ে যায়। মনামী ফ্যানের হাওয়ায় ক্লান্ত চোখ বোজে। মাথাটা হেলে পড়ে। ভদ্রলোক তখন আমার দিকে ফিরে বলেন—এখন বলুন—কী ব্যাপার?

আমি বলি, উনি আমার বৌদি। দিনকুড়ি আগে আমার দাদা মারা গিয়েছেন। সেই থেকে মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়েছে। বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেম।

—তাহলে উনি যেতে চাইছেন না কেন?

—উনি প্রকৃতিস্থা নন।

ডাক্তারবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেন—দেখুন, হয়তো আপনি যা বলছেন, তা সবই সত্য; তবু এক্ষেত্রে ওঁর কথাটা না শুনে আমি আপনাদের যেতে দিতে পারি না। উনি একটু সুস্থ হলে ওঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমি।

বললেম—বেশ তো, অপেক্ষা করছি আমি।

উনি মনামীকে দেখে এসে বলেন—আশ্চর্য, উনি ঐভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ট্যাক্সিটাকে বরং ছেড়ে দিন। শী নিডস্ রেস্ট।

বাধ্য হয়ে মালপত্র নামিয়ে ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিলেম। ডাক্তারবাবু অমায়িক ভদ্রলোক। ক্রমে আলাপ হল তাঁর সঙ্গে। অনেক কথাই জানালেম ওঁকে। উনি শুনে বললেন—আমার মনে হয় ক্রমশ সামলে উঠবেন উনি! সবচেয়ে দরকার দেখা যাতে সন্তানটিকে নিরাপদে পৃথিবীতে আনা যায়। এখন ঐটিই ওঁর একমাত্র অবলম্বন। ঐ তো বয়স! সমস্ত জীবনই পড়ে আছে সামনে। একটা বাচ্চা থাকলে তবু নেড়ে-চেড়ে সময় কেটে যাবে।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—আমার একটি মেয়ে আছে। বিয়ের বছরেই বিধবা হয়েছে। তারও যদি এমন একটা বাচ্চা থাকত!

আমি বললেম—আপনি ওঁকে পরীক্ষা করে দেখবেন? ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট কনফাইনমেন্ট তো, প্রথম থেকে সাবধান হওয়া ভালো।

—নিশ্চয়ই। ঘুম ভাঙুক, ওকে পরীক্ষা করে দেখব।

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে মনামীর ঘুম ভাঙে। ডাক্তারবাবু বলে—ইনি আপনার দেওর?

মনামী মুচকি হেসে বলে—কেউ কেউ তাই বলে বটে, কিন্তু ও নিজে কী বলে?

আমার হাত-পা হিম হয়ে আঁসে।

ডাক্তারবাবু একটু চুপ করে ভাবেন। তারপর বলেন—তোমাকে আমি পরীক্ষা করব, এ ঘরে এস।

—কেন, কী হয়েছে আমার?

—তুমি মা হতে চলেছ।

—দ্যাট আই নো!

—সুতরাং তোমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে তোমার সন্তান সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করে।

—বাট হুজ বেবী ইজ ইট?—প্রশ্ন করে মনামী।

—কেন, তোমার।

মনামী আরও কিছু বলতে যায়; কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বলি—তর্ক কর না, ওঁর কথা শোন। ডাক্তারবাবুর কথা শুনতে হয়।

—অল রাইট।

ওঁর সঙ্গে মনামী চলে যায় ভেতরে—রুগী দেখার ঘরে!

আমি চুপ করে বসে থাকি। কতক্ষণ সময় পার হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। আকাশপাতাল কত কী ভাবছি একা বসে। ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন, পেছন পেছন মনামী।

সে প্রশ্ন করে—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

সে প্রশ্নের মধ্যে কোনো জড়তা নেই—কোনো পাগলামি নেই। সহজ সরল প্রশ্ন।

ডাক্তারবাবু হেসে বলেন—ঠিকই আছে মা, ভয়ের কোনো কারণ নেই।

হাসিটা ম্লান দেখায়। মনামীর হাসিটাও।

আমি মনামীকে বলি—এবার একটা ট্যাক্সি ডাকি?

ও ক্লান্তভাবে বলে—ডাকো।

ট্যাক্সি এলে ওকে উঠিয়ে দিই। আবার মালপত্র তোলা হয়। মনামী জানলায় মাথা রেখে বসে থাকে চুপ করে। আমি ম্যানিব্যাগটা বার করতেই ডাক্তারবাবু আমার হাতটা চেপে ধরেন।

আমি বলি—সে কী? আপনি রীতিমতো পরীক্ষা করেছেন ওকে—

একটু অন্তরালে ডেকে নিয়ে বলেন—মেয়েটার দুঃখ বুকে বেজে আছে সুবিমলবাবু। ভেবেছিলাম আপনার বৌদির কেসটা হাতে নেব—

কেমন যেন করুণ দেখায় প্রৌঢ় ডাক্তারবাবুকে।

বলি—বেশ তো, আপনিই ডেলিভারির ব্যবস্থা করবেন।

—তার প্রয়োজন হবে না।

আমি বলি—কেন?

উনি ম্লান হাসেন, বলেন—জানি প্রচণ্ড আঘাত পাবেন আপনি! আপনার বৌদিকে কথাটা বলিনি। অত্যন্ত শক পাবেন ভয়ে। এ শোকটা আগে সামলাতে দিন—তারপর বলবেন—

আমি অবাক হয়ে বলি—কেন, কী হয়েছে?

—দি স্যাডেস্ট পার্ট অফ্ দ্য স্টোরি ইজ দ্যাট শী ইজ নট ক্যারিয়িং! ভুল ধারণা হয়েছিল ওঁর। ওঁর গর্ভে সন্তান নেই!

ট্যাক্সিতে ফিরে এসে দেখি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে মনু। হয়তো ভাবছে, তার বিড়ম্বিত জীবনের সমস্যার সমাধান তো হলই না, এমনকি ব্যাখ্যাও কিছু খুঁজে পাওয়া গেলনা। বিচক্ষণ ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও সংবাদটা তৎক্ষণাৎ বলে ফেললেম ওকে। চমকে ওঠে ও। অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে একটা মুহূর্ত। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলে বেচারি। এ অশ্রু ওর মুক্তির আনন্দের!

ট্যাক্সি তখন ছুটে চলেছে সামনের দিকে। সামনে চৌরঙ্গীর মোড়। এখনি হয়ত পাঞ্জাবি চালক পেছন ফিরে জানতে চাইবে কোনদিকে মোড় ঘুরবে, ডাইনে, বাঁয়ে—না সামনে?

কী বলব ওকে?

নারায়ণ সান্যাল

মনামী